দানিকেনের বিভ্রান্তি

সমীরণ মজুমদার

মৌসুমী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

দু'একটি কথা

দানিকেন-তত্ত্ব-সমীক্ষায় এই প্রচেষ্টাকে অনেকেই হয়ত 'ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে গাত্রে হ'ল ব্যথা' ব'লে মনে করতে পারেন। কিন্তু বিদগ্ধজন যাকে ছায়া ব'লে চিনতে পেরেছেন অনেকেই তাকে কায়া ব'লে মনে ক'রে রীতিমত সমীহ করে চলেছেন। সেই পাঠকদের কথা মনে করেই এ বই-এর পরিকল্পনা।

দানিকেন তাঁর দীর্ঘ আলোচনায় বহু তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন—যা কখন আংশিক, কখন অর্ধসত্য, কখন বিকৃত। সেই সমস্ত তথ্য সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত না থাকায় সাধারণ পাঠক বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তে পারেন। তাই দানিকেনের তত্ত্ব খণ্ডন করতে গিয়ে সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব ও তথ্যগুলি যথাসম্ভব তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে কোথাও কোথাও আলোচনার ধারা কিঞ্চিৎ ব্যাহত হয়েছে ব'লে মনে হতে পারে। তথাপি আংশিক অর্ধসত্য ও বিকৃত বক্তব্যের সমালোচনায় সঠিক তথ্যকে তুলে ধরেই পাঠককে যথাযথ সাহায্য করা যায় মনে করে সেই ধারাই অনুসরণ করা হয়েছে।

দানিকেনের অনেক মন্তব্যের পিছনে প্রতিফলিত সামাজিক অভিসন্ধির উত্তরে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে যা প্রসঙ্গান্তর হলেও এড়ান যায় নি।

সমগ্র লেখাটিতে এইসব কারণে স্বতন্ত্র রচনার চরিত্রও কিছুটা এসে থাকতে পারে।

দানিকেনের উক্তির প্রায় সমস্তই অজিত দত্ত অনূদিত (১) দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ (২) নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন (৩) বীজ ও মহাবিশ্ব (৪) আমার পৃথিবী (৫) আবির্ভাব এবং (৬) প্রমাণ-বই থেকে নেওয়া হয়েছে। উদ্ধৃতি উল্লেখের সময় গ্রন্থের নামের পরিবর্তে এই ক্রমিক সংখ্যায় বন্ধনীর মধ্যে পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লিখিত বইগুলি থেকে প্রধানতঃ তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে—কোথাও কোথাও একেবারে হুবহু।

বিজ্ঞান আলোচনার নানা বিষয়ে এবং গোটা পাণ্ডু-লিপির উপর মতামত দিয়ে অসামান্য উপকার করেছেন 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপক অভিজিৎ লাহিড়ী। আর অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনার অংশটি দেখে দিয়ে সাহায্য করেছেন 'অন্য অর্থ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপক নবীনানন্দ সেন।

বিলম্ব হলেও শেষপর্যন্ত বইটি প্রকাশ হ'তে পারার পেছনে রয়েছে বন্ধুবর বিপুল সেনগুপ্ত ও সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহ ও প্রচেষ্টা এবং দেবকুমার বসুর সহযোগিতা।

এঁরা সকলেই আমার ধন্যবাদার্হ।

লেখক

প্রথম অধ্যায়

দানিকেনের বিভ্রান্তি

পাঠক মহল বিস্মিত এবং একই সঙ্গে বিভ্রান্ত। 'দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ' বিষয়ক এরিক ফন দানিকেনের আলোচনায় অনেকেই হতচকিত। দানিকেন বলেছেন যে সুদূর অতীতে মহাবিশ্বের কোন উন্নত প্রাণী এই পৃথিবীতে পদার্পণ করেছিল। ইতিপূর্বে অবশ্য এমন অনুমান করেছেন বিভিন্ন দেশের নানা বৈজ্ঞানিক। বিশেষ করে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক মেগেস্ট আগ্‌রেস্ট, তাঁর গ্রন্থ 'অন দি ট্রাক অফ্‌ ডিস্‌কভারি'তে। কিন্তু সে সমস্ত কেবলমাত্র অনুমানই। সেই অনুমানকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করবার মতো তথ্য ও প্রমাণ আজ পর্যন্ত কিছুই সংগৃহীত হয় নি। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়েই দানিকেন দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহান্তরের উন্নততর প্রাণীর মর্তে আগমনের বার্তা ঘোষণা করে চলেছেন। কেবল ঘোষণা করাই নয়, সাথে সাথে তিনি এমন সব প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন যাতে পাঠকমহল বিভ্রান্ত না হয়ে পারে না।

ছয়খানি গ্রন্থের দীর্ঘ আলোচনার ভিতর দানিকেনের প্রতিপাদ্য প্রধান বিষয়গুলি হল :

এক। অতীতে এক সময় অজানা কোন উন্নত প্রাণী এই পৃথিবীতে পদার্পণ করেছিল।

দুই। তাদের দেখেই দেশে দেশে মানুষের মনে দেবতার ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।

তিন। তারাই পৃথিবীর যাবতীয় পুরাকীর্তির জনক

চার। এই পৃথিবীতে মানুষের মতো বুদ্ধি-সম্পন্ন জীব সেই গ্রহান্তরের আগন্তুকেরাই সৃষ্টি করেছিল।

পাঁচ। মানব মনীষায় যা কিছু মহত্তর প্রকাশ তা সবই বহির্জাগতিক সেই নভশ্চরদের পাঠিয়ে দেওয়া অলৌকিক স্পন্দনের প্রতিফলন।

এই সব আলোচনা করতে গিয়ে লেখক প্রচুর তথ্য, ছবি, কাহিনী ও যুক্তি উপস্থিত করেছেন ; বহু মতামত, মন্তব্য, অনুমান ও কল্পনার অবতারণা করেছেন। বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য করবার জন্য বিজ্ঞানকে যথেচ্ছভাবে

ব্যবহার করেছেন। দানিকেন তাঁর অনুমানভিত্তিক এই সমস্ত বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রধানতঃ পুরাকীর্তি এবং প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রাবলী তুলে ধরেছেন। তার মাধ্যমেই তিনি এক কথায় নাকচ করে দিয়েছেন বিজ্ঞানের নানা তত্ত্বকে, সামাজিক ইতিহাসের বিভিন্ন ধারাকে, প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার নানা ইতিহাসকে এবং বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত বিবর্তনমূলক প্রাণীজগতের বিকাশের সত্যতাকে। অথচ তা করতে গিয়ে তিনি কোথাও এই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকে যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে খণ্ডন করতে পারেন নি।

যুগে যুগে প্রচলিত অনেক ধারণা ও চিন্তাধারার মূলেই নানা বৈজ্ঞানিক ও মনীষী আঘাত করেছেন এবং তার দ্বারা মানব চিন্তাকে আরো মুক্ত ও আরো সমৃদ্ধ করেছেন। দানিকেনের প্রচেষ্টা তেমনি কিছু একটা ব'লে দাবী করা হয়েছে। কিন্তু দানিকেন তাঁর সুনির্দিষ্ট তত্ত্বকে তথ্য ও প্রমাণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে আসেন নি। আর তা না করেই দাবী করেছেন তাঁর বক্তব্যের নির্ভুলতাকে। এই ভাবে তিনি একদিকে কল্পনার আতিশয্য ঘটিয়েছেন আর অন্যদিকে অবতারণা করেছেন প্রচুর স্ববিরোধী কথার। সামগ্রিক ফল দাঁড়িয়েছে চমক ও বিভ্রান্তি।

দানিকেন অনেক নতুন কথা বলেছেন। নতুন কথা বলতে গেলে কী হাল হয় তারও উল্লেখ করেছেন, 'আগেকার কালে নতুন কথা কেউ শোনালে তার আর খোয়াবের শেষ থাকত না। ধর্মের কাছে তো ঘৃণিত হ'তোই, সতীর্থদের কাছেও হ'ত নির্যাতিত। নোতুন কথা শোনাবার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে হয়েছে তাকে। ভাবতুম, সেদিন আর বুঝি নেই।' ১(৩৯) বলেছেন, 'একবিংশ শতাব্দীর দরজায় দাঁড়িয়ে বিজ্ঞান গবেষককে প্রস্তুত হ'তে হবে নানা উদ্ভট সত্যের সম্মুখীন হবার, সংশোধন করতে হবে বহু বৈজ্ঞানিক সূত্র, নানা জ্ঞান যা শত শত শতাব্দী ধরে ছিল অলঙ্ঘনীয়।' ১(৪০) এই সমস্ত কথার মধ্যে দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে অতীতের অনেক সমালোচিত সত্যের মতোই তাঁর তত্ত্বও সমালোচনার মুখে পড়েছে 'সত্য' বলেই। কারণ তাঁর কথাতেই, 'নোতুন কিছু দেখলেই মন যেন আপনিই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।' কিন্তু যে কথাটি তিনি বলেন নি তা' হল যুগান্তকারী ঐতিহাসিক সমস্ত আবিষ্কার কেবল মন্তব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তা' ছিল যুক্তি প্রমাণের কঠোর সত্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত। শুধুই মন্তব্য কোন দিনই নতুন বলেই সমাদৃত হয় নি।

দুইটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। দানিকেনও উল্লেখ করেছেন, 'উর্দ্ধতন শত শত পুরুষ ভেবেছেন পৃথিবীটা বুঝি চ্যাপ্টা। সূর্য্য পৃথিবীকে পরিক্রমা করছে। এ স্থির বিশ্বাস হাজার হাজার বছর ধরে অটল থেকেছে।'১(১৭) ভারতীয় গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ আর্য্যভট্ট তাঁর 'আর্য্যভটীয়' গ্রন্থে ভূ-ভ্রমনবাদের উল্লেখ করেছিলেন। যদিও তার পরের গণিতজ্ঞ বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, লল্ল প্রভৃতি অনেকেই তা গ্রহণ করেন নি। কারণ তা প্রমানাদির দ্বারা সমর্থিত হয় নি। কোপার্নিকাসই সর্বপ্রথম পৃথিবীকেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ডের বিরোধিতা করেন। 'অন দি রেভলিউসন অফ দি সেলেশ্চিয়াল স্ফিয়ার' নামক গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত সরল যুক্তিপ্রমানের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে পৃথিবী গোল ও সূর্য্যের চারদিকে ঘুরছে। তিনি আলোচনার সূত্রপাত করেন এইভাবে যুক্তিগুলি সাজিয়ে নিয়ে: বিশ্ব গোলাকার; পৃথিবীও গোলাকার; জল-স্থল মিলে কি একটি গোলক হয়েছে; বিশ্বের সমস্ত গ্রহনক্ষত্রাদির নিয়মিত, বৃত্তাকার ও স্থায়ী গতি রয়েছে; পৃথিবীরও কি বৃত্তাকার গতি আছে; পৃথিবীর তুলনায় বিশ্বের বিরাটত্ব; প্রাচীনকালে কি মনে করা হ'ত যে বিশ্বের কেন্দ্র পৃথিবী; পূর্বের কথার অযৌক্তিকতা; পৃথিবী কি বিশ্বের কেন্দ্র হিসাবে অনেক প্রকার গতির ধারক হতে পারে; বৃত্তাকার পথ সম্পর্কে। এই ভাবে পরিচ্ছেদে ভাগ করে, যুক্তি ও প্রমাণ সন্নিবেশিত হয়েছিল বলেই সেই তত্ত্ব ছিল পূর্বের ধারণার প্রতিস্থাপনে যুগান্তকারী।

ডারউইন যখন মানুষকে ঈশ্বরসৃষ্ট বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রাণীর মর্যাদা থেকে, উৎপত্তির ক্ষেত্র সমগ্র প্রাণীকুলের একই ধারায় স্থাপন করেন তখনও রক্ষণশীল চিন্তা আঘাত পেয়েছিল। কিন্তু তাঁর গ্রন্থ 'অরিজিন অফ্ স্পিসিস বাই মিনস্ অফ্ ন্যাচারাল সিলেকশন' এবং 'দি ডিসেণ্ট অফ ম্যান অ্যাণ্ড সিলেকশন ইন রিলেশন টু সেক্স' এমন বিস্তৃত ও অকাট্য যুক্তি প্রমাণ ধরেছে যে সমালোচনার ঝড় তুলে সেই তত্ত্বের প্রসারকে রোধ করা যায় নি। দীর্ঘ বিশ বছরের একটানা অনুসন্ধান ও গবেষণার ফসল হিসাবে অজস্র তথ্য প্রমাণ যুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে বিবর্তনের তত্ত্বকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। শেষোক্ত গ্রন্থের কেবল পরিচ্ছেদ বিভাগগুলি উল্লেখ করলেই কিছুটা ধারণা করা সম্ভব হবে যে লেখক কত গভীর ভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন। বই এর প্রথম অংশে আছে: নিম্নতর প্রাণী থেকে মানুষ সৃষ্টির উদাহরণ; কতীপয় নিম্নতর প্রাণী থেকে মানুষ উৎপত্তির ধরণ; নিম্নতর প্রাণী ও মানুষের মানসিক ক্ষমতার তুলনা;

বুদ্ধি ও নীতিবোধের দক্ষতার ক্রমবিকাশ—আদিম অবস্থা থেকে সভ্য পর্যন্ত ; মানুষের দেহ আকর্ষণ ও বংশগতি ; মানব জাতির বিভিন্ন শাখা। দ্বিতীয় অংশে আছে : যৌন নির্বাচনের নীতিনিয়ম ; নিম্ন-শ্রেণীর প্রাণী জগতের অধস্তন যৌন বৈশিষ্ট্য সমূহ ; পতঙ্গাদির অধস্তন যৌন বৈশিষ্ট্য সমূহ ; মাছ, উভচর ও সরীসৃপের ভিতর অধস্তন যৌনবৈশিষ্ট সমূহ ; পাখীর অধস্তন যৌন বৈশিষ্ট্য সমূহ ; স্তন্যপায়ীর অধস্তন যৌনবৈশিষ্ট্য। আর তৃতীয় অংশে রয়েছে : মানুষের যৌনবৈশিষ্ট্য ও অপ্রধান বা অধস্তন যৌন বৈশিষ্ট্য সমূহ। দানিকেনের 'নতুন কথা' এই সমস্ত যুগান্তকারী বিষয়ের সঙ্গে তুলনা হ'তে পারে না। এই জন্য যে তাঁর কথা কেবল কথাই। তাঁর বিরুদ্ধে, বিশেষ করে ইউরোপে সমালোচনার ঝড়ও উঠেছে এই জন্যই। যুগান্তকারী বক্তব্যের প্রতি সহনশীলতার অভাব তার কারণ নয়। গীতগোবিন্দতে ১নং গীতে জয়দেব দশাবতার সম্পর্কে ভগবানের মীন শরীর, কূর্মশরীর, শূকর রূপ, নরহরি রূপ হয়ে কল্কিরূপ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। অনেক ভাষ্যকার তাকে বিবর্তনবাদের রূপক বলে মনে করেন। কিন্তু কেবল রূপক আশ্রয়ী মন্তব্যের আওতা থেকে তত্ত্ব হিসাবে তা' কখনও গৃহীত হতে পারে না। দানিকেনের তত্ত্ব অনেকটা তেমনি মন্তব্যধর্মী।

ইতিহাসের অব্যাখ্যাত সমস্যার সমাধান হিসাবে দানিকেন গ্রহান্তরের প্রাণীর হস্তক্ষেপ আবিষ্কার করেছেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি যত্রতত্র প্রচুর ঘুরেছেন, তথ্য সমাবেশ ঘটিয়েছেন বিচিত্র রকমের, মতামত ব্যক্ত করেছেন যথেচ্ছভাবে। জ্যামিতিক আকারের পাথর দেখলেই থমকে দাঁড়িয়েছেন ; গোলাকার বস্তু দেখলে চমকে উঠেছেন ; গুহাচিত্রের বৈচিত্র্যে মহাকাশচারীর সন্ধান পেয়েছেন ; পুরাণের কাহিনীতে গ্রহান্তরের প্রাণীর প্রমাণ খুঁজেছেন। সব মিলিয়ে বাস্তব ঘটনাবলীতেও তাঁর বিস্ময় জেগেছে। এই ভাবেই প্রাগৈতিহাসিক কালের নানা অব্যাখ্যাত বিষয়াবলী এনে জড়ো করেছেন তাঁর তত্ত্বের সমর্থনে। একথা অনস্বীকার্য্য যে মানুষের জ্ঞান এখনও বহু বিষয়ে অসম্পূর্ণ আর প্রাগৈতিহাসিক অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্তরও সর্ববাদী সম্মত নয়। দানিকেন সেই অবস্থাকে সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এই সব যতো বেশী করেছেন ততো স্ববিরোধিতা, আজগুবি কল্পনা আর অনাবশ্যক হাত পা ছোঁড়াছুঁড়ির মধ্যে গিয়ে পড়েছেন।

দানিকেন যে ভাবে তথ্য ও যুক্তির সমাবেশ ঘটিয়েছেন তা থেকে যে কোন পাঠকই অনুধাবন করতে পারেন যে, মানব জ্ঞানের সমস্ত শাখায় বিভিন্ন

প্রাসঙ্গিক বিষয় তিনি তাঁর তত্ত্ব প্রমাণের জন্য যেমন তেমন ভাবে প্রয়োগ করেছেন। বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক হিসাবে কখনও যুক্তি দিয়েছেন, কখনও আবার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান থেকে ভাববাদী যুক্তি নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। আত্মা, মৃতের কণ্ঠস্বর, দিব্যদর্শন প্রভৃতি নানা অলৌকিক কাহিনীকেও বিজ্ঞানের নামে তুলে ধরেছেন। ফলে অসংখ্য তথ্য আর বিভিন্ন রকম মন্তব্য সমাহারে তাঁর নিজের তত্ত্বটিই হয়ে দাঁড়িয়েছে এক বিভ্রান্তিকর বিশৃঙ্খলা।

প্যারাসাইকোলজি, টেলিপ্যাথী, দিব্যদর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ের অবতারণা করে দানিকেন সিদ্ধান্ত করেছেন, 'যদি ধরে নিই মানব মস্তিষ্কে প্রচণ্ডতম অনন্ত শক্তিসমূহ কাজ করে, তা হ'লে সেই সঙ্গে নিশ্চয়ই শক্তিশালী মানসিক অনুভূতিও পরিদৃষ্ট হবে সর্বত্র! বিজ্ঞান যদি এ অদ্ভুত কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে, তা হলে দেখা যাবে নিখিল বিশ্বের যেখানে যতো বুদ্ধিমান জীব আছে তারা সবাই এক অজানা সত্তায় গড়া'১(১৪০) কেমন গুরু গম্ভীর কথা। একজন 'অদ্ভুত কল্পনা' করবেন আর বিজ্ঞান তাকে 'বাস্তবে রূপায়িত' করবে। কোন গ্রহান্তরের প্রাণী যদি পৃথিবীতে এসেও থাকে, তার সঙ্গে নিখিল বিশ্বের যেখানে যতো বুদ্ধিমান জীব আছে তাদের একই সত্তায় গড়ে ওঠার কী সম্পর্ক থাকতে পারে? প্রচণ্ডতম অনন্ত শক্তি সমূহের অর্থই বা কী? লেখক নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন, 'আমি বলছি এমন একটা শক্তির কথা যা যুগপৎ সর্বব্যাপী এবং সমপ্রভাবী'।১(১৪১) এই বক্তব্যের মধ্যেও অস্পষ্টতা থাকায় তিনিই পরের লাইনে বলেছেন, 'আমি শুধু ভাবি আজো অজ্ঞাত যে শক্তি সেই হয়ত একদিন ধারণাতীতকে করবে ধারণাগত।' সমগ্রবক্তব্যের মধ্যে 'অদ্ভুত কল্পনা', 'অজ্ঞাত', 'ধারণাতীত' প্রভৃতি কথাগুলির উপর দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে সব মিলিয়ে বিভ্রান্তিকর একটা ভাব সৃষ্টি করা ছাড়া এর নির্গলিতার্থ কিছুই দাঁড়ায় না। অথচ এমন একটা 'অসাধারণ কল্পনার বাস্তব সম্ভাবনাকে' তুলনা করা হয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে শক্তি ও পদার্থের পরস্পর রূপান্তরের অসম্ভাব্যতা বোধের সঙ্গে। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে দানিকেন যে অসাধারণ কল্পনা করেছেন তা বাস্তব, কিন্তু কিছু লোক বুঝতে পারছেন না। সম্পূর্ণ না-জানা অজ্ঞাত বিষয় আর সাধারণ জ্ঞানে আপেক্ষিকতাবাদকে বুঝতে না পারা প্রমাণিত বিষয়কে একই সঙ্গে দাঁড় করান হয়েছে। আজো 'অনেক কিছুই জানি না' বলেই কি যে কোন কল্পনাকেই কাল সত্য হ'তে পারে বলে গ্রহণ করতে হবে?

মানব সভ্যতার ধারাপথে বিজ্ঞানের একটা বিশেষ মর্যাদা আছে। এই

মর্যাদার একটিই কারণ, তা হ'ল, বিজ্ঞান সত্যকে যুক্তি, বুদ্ধি ও গ্রাহ্যের মধ্যে এনে দিতে পেরেছে। এর ফলেই আজ আর কোন তত্ত্ব, বক্তব্য যদি অবৈজ্ঞানিক হয় তা হ'লে অনায়াসে তা অগ্রাহ্য হয়ে যায়। দানিকেন সে সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ হাতরে যখন ব্যর্থ হয়েছেন তখন কেবল অনুমান আর কল্পনা দিয়েই তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এ পথে অগ্রসর হতে গিয়ে তিনি ভুলেই গিয়েছেন যে তাঁর কাজ একজন প্রত্নতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিকের, কল্পলোকে বিচরণশীল কোন ভাববাদী বিলাসীর নয়।

তিনি বলেছেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বৈজ্ঞানিক কোন প্রেরণা যে জ্ঞানতৃষা জাগায়, তাঁর যতো কল্পনাকে তিনি রূপান্তরিত করতে চান বাস্তবে তা সব আজো অজানা বুদ্ধিমান জীবেরাই মানুষের স্মৃতিতে ভরে দিয়েছিল আদিম অতীতে। এ বিশ্বাসের একটা বড় ব্যাখ্যা হচ্ছে গোটা ইতিহাসকালে মানুষ বারে বারে মহাবিশ্বকেই তার গবেষণার একটা বড় আঁধার বলে ধরে নিয়েছে।'২(৫৩) কি অদ্ভুত কথা! না জানার অপার সমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে যদি জ্ঞানতৃষ্ণা জাগে, আকাশের অযুত নক্ষত্র যদি জানার আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করে, বাঁচার প্রয়োজন মেটাতে যদি উদ্ভাবনী শক্তি অনুসন্ধানে নিয়োজিত হয় তাকে বস্তু নির্ভর সত্য বলে মনে না করে ধরতে হবে অজানা বুদ্ধিমান জীবদের হস্তক্ষেপের ফল হিসাবে। মহাকাশ গবেষণার আকাঙ্ক্ষা নাকি তার প্রমাণ। তা' হলে মহাকাশ গবেষণা ছাড়া এই পৃথিবীর ভিতরে যে সমস্ত গবেষণার বিষয়ের অবস্থান যেমন পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, জীববিদ্যা, ভূবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয় ও কাব্য সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে মানবতৃষার কারণ কী হবে? এই সমস্ত দিকে মানুষের গবেষণা ও সৃষ্টি আজ পর্যন্ত মহাকাশ গবেষণার সামগ্রিক পরিমাণ থেকে বহুগুণ বেশি হবার পিছনে কার হস্তক্ষেপ আছে?

বিভ্রান্তিকর এমনি সমস্ত মন্তব্যের সঙ্গে লেখক দানিকেন নিয়ে এসেছেন নানা জনের মনগড়া দায়িত্বজ্ঞানহীন বিচিত্র সব বক্তব্যকে। টেলিপ্যাথীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'জগতের সব মগজের একটি অংশ মাত্র তার নিজের মগজ'।১(৪৩) ধাঁধাঁ লাগান বিভ্রান্তিকর মন্তব্যের এখানেই শেষ নয়। প্রমাণ তো দূরের কথা কল্পনাও নাগাল পাবে না এমন মন্তব্যের উপস্থাপনা করা হয়েছে এইভাবে, 'কাল চেতনা স্মৃতি এরাও মহাবিশ্বের এক একটি মৌলিক অংশ। এ অংশগুলোর একটার সঙ্গে আরেকটা যুক্ত, সম্পর্কও

আছে একটার সঙ্গে আরেকটার, কিন্তু কীভাবে যে তারা পরস্পর যুক্ত, কী সম্পর্ক তাদের মাঝে বর্তমান তা আজো আমাদের জ্ঞানের সীমার বাইরে। হয়ত কোন একদিন খোঁজ পাব আরো নানা মৌলিক অংশের যাদের বলি 'শক্তি' যাদের আজো আমরা কোন সঠিক সংজ্ঞা দিতে পারি না। পারি না পদার্থ, রসায়ন কিংবা বিজ্ঞানের অন্যকোন শাখার শ্রেণীভুক্ত করতে। তবু তাদের সংজ্ঞা দিতে না পারলেও, তাদের বস্তুরূপে কল্পনা করতে না পারলেও এটা ঠিক যে মহাজাগতিক পর্যায়ক্রমের ওপর তাদের প্রভাব বিদ্যমান। সে যাই হোক আমার যা বক্তব্য তা হ'ল সমস্ত গবেষণার শেষ কথা, শেষ মীমাংসা রয়েছে মহাবিশ্বেই নিহিত।'২(৫৪) এত সুগভীর বক্তব্যের মধ্যে কিন্তু সবটাই না-জানা আর না-পাবার অক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। তবু এগুলো বলা কেন? কেন এই সমস্ত অবাস্তব শব্দ সম্ভাবের সমাবেশ! এর একটাই কারণ, তা হ'ল, বিজ্ঞানের শক্ত ভিত্তিকে টলিয়ে দিতে না পারলে মনগড়া প্রকল্পের কোন স্থান পাওয়া সম্ভব নয়। সেই উদ্দেশ্যেই এই কাল, চেতনা, স্মৃতিকে তুলনা করা হয়েছে বস্তুকণার সঙ্গে। 'বস্তুর মৌলিক অংশ পরমাণু। আবার ঐ পরমাণুই মহাবিশ্বেরও বাস্তব মৌলিক অংশ। কিন্তু মহাবিশ্বের মৌলিক অংশ আরো আছে।'২(৫৪) তারাই হ'ল কাল, চেতনা, স্মৃতি।

এমনি সমস্ত 'ধারণাতীত', 'আজো অজ্ঞাত', 'জ্ঞানের সীমার বাইরে'র জিনিষ নিয়ে দানিকেন এত বেশী নাড়াচাড়া করেছেন যে তাতে মনে হয়, ভাববিলাসী সাধুপুরুষের মতো তিনি একাই সব প্রত্যক্ষ করতে পারছেন, উপলব্ধি করতে পারছেন কিন্তু অন্যসকলের কাছে তা 'জানার বাইরে' থেকে যাচ্ছে। আর সেই জন্যই তাঁকে বারবার ব্যবহার করতে হয়েছে আমার বিশ্বাস, আমার ধারণা, আমার আন্তরিক বিশ্বাস, একটি কল্পনা, একটি দূর কল্পনা, যদিও প্রমাণ করতে পারছি না প্রভৃতি আত্মগত কথা। গ্রহান্তরের প্রাণীর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্যাসন্ন কোন আবিষ্কারের দ্বার আগামীতে উন্মুক্ত হবার এক দুর্দম বিশ্বাসকে মূলধন করেই দানিকেনের যাত্রা। আর এই যাত্রাপথে বিজ্ঞানীর মতো নিজ প্রকল্পের কোন অংশ প্রমাণ করতে যতোই অক্ষম হয়ে পড়ছেন, ততোই তিনি গিয়ে পড়ছেন উদ্ভট তত্ত্বের মধ্যে। সামগ্রিক ফল দাঁড়াচ্ছে বিভ্রান্তি।

বিভ্রান্তিকর বহুবিষয় থেকে আপাততঃ কয়েকটি বিষয়কে তুলে ধরা যেতে পারে: (১) উল্কাতে পার্থিব প্রাণীসৃষ্টির উৎস সন্ধান। (২) পলিনেশিয়ায় দেবতাদের হস্তক্ষেপ আবিষ্কার। (৩) পিরামিডকে অতিপ্রাকৃত সৃষ্টি হিসাবে

দেখা। (৪) গোলমাত্রই দেবতার প্রতীক ভাবা (৫) শিরস্তানের শলাকাকে এরিয়েল মনে করা।

উল্কাতে পার্থিব প্রাণীসৃষ্টির উৎস সন্ধান

পৃথিবীতে প্রাণীসৃষ্টির এক ধারাবাহিক বর্ণনা দিতে গিয়ে দানিকেন বলেছেন, 'জীবন তা' হলে কী? জীবনের সংজ্ঞা নিরূপণ করা কখনো কি সম্ভব হবে? জীবনের উৎস সন্ধানে যদি তার আসল ধাপগুলো পর্য্যালোচনা করি, তা হ'লে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন দেখা দেবে, তা হ'ল প্রথম জীবকোষ এল কোথা থেকে?'২(২৮) জড় থেকে জীবনের সৃষ্টি সম্পর্কে বিজ্ঞানী মহলে আজ আর কোন সন্দেহ নেই। দানিকেন সে সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল থাকা সত্ত্বেও এমনি অধিবিদ্যক প্রশ্ন তুলেছেন; এবং বৈজ্ঞানিক সত্যকে গুলিয়ে দেবার জন্য তত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, বৈজ্ঞানিক কেলভিনের এমন নিছক মন্তব্যকেই বড় করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, 'তিনি বিশ্বাস করতেন আমাদের এ ক্ষুদ্র গ্রহে আদি জীবনের সূত্রপাত ঘটে নি। তিনি ধরে নিয়েছিলেন এ গ্রহে জীবন এসেছে দূর মহাকাশ থেকে ভাসতে ভাসতে বীজগুটি রূপে। সেই এককোষী উদ্ভিদকণা অযৌন সে বীজকোষ এমনই সর্বংসহ যে মহাকাশের চরম শৈত্যেও তার মৃত্যু ঘটে নি। জীবন সৃষ্টির পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে সে পৃথিবীতে এসে পৌঁচেছে মহাকাশের উল্কাকণাকে বাহন করে। তারপর পৃথিবীর আওতায় এসে সে বীজকণা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে, আলোকের জীবনদায়ী প্রভাবে বিকোশিত হয়েছে উন্নততর কোষে।'৩(৪৯)

লর্ড কেলভিন জন্মগ্রহণ করেন ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯০৭ সনে। পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টির ইতিহাসে—জড় থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং নিম্নতর প্রাণী থেকে ক্রমবিকোশিত হয়ে মানুষের উৎপত্তির সত্যতা তারপর থেকে আজ সর্বজন স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য। অথচ দানিকেনের আপশোষ, কেলভিনের এই 'দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা ইদানীং আর কিছুই শোনা যায় না।'

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার যে মহাকাশের তাপমাত্রা যখন ভীষণ কম—তরল হিলিয়ামের মতো—বীজবাহী উল্কাপিণ্ডের তাপ পৃথিবীর আবহ মণ্ডলে এসে তখন প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অধিকাংশ সময়েই উল্কাপিণ্ড প্রচণ্ডভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। প্রতি সেকেণ্ডে ২০-২৫ মাইল গতিতে উল্কাপিণ্ড যখন বাতাসের ভিতর প্রবেশ করে তখন উল্কার গাত্রদেশ ও বাতাসের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটে। উল্কা ও বাতাসের সংঘাবত অংশের অণুপরমাণু এর

এর ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আয়নায়িত বাতাস ও বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রন মিলে উল্কার ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করে। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে প্রাণীকোষ উল্কাপিণ্ডের গায়ে থাকলে তার কী অবস্থা হতে পারে! সাধারণতঃ প্রাণীর ধর্মই হ'ল একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় জীবনের স্পন্দনকে রক্ষা করতে পারা। তরল হিলিয়ামের শৈত্য থেকে প্রচণ্ড উত্তাপের এই বিরাট মাত্রাজুড়ে প্রাণীকোষের প্রাণ ধারণের চিন্তাও প্রায় অসম্ভবের পর্য্যায়ে পড়ে। আর যদি ধরেও নেওয়া যায় যে উল্কাবাহিত কোষেই পৃথিবীর সৃষ্টির সূত্রপাত তা হ'লেও প্রশ্ন দেখা দেয় যে উল্কা কোথা থেকে জীবকোষ বহন করে আনল! উল্কা তো সৌরমণ্ডলীয় পদার্থ মাত্র!

উল্কা বলতে সাধারণতঃ তারাখসা বলে মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু তারার সাথে উল্কার কোন যোগাযোগ নেই। উল্কাতে ক'রে কোন তারার গ্রহ থেকে প্রাণী বীজ সৌরজগতের কোন গ্রহে আসা সম্ভব নয়। বড় জোড় নবগ্রহের অন্য কোথাও যদি পৃথিবীর পূর্বে জীবনসৃষ্টি হয়ে থাকে তবে সেখান থেকে প্রাণী বীজ ভেসে এখানে আসার কথা তবুও বলা যেতে পারে।

উল্কা হ'ল দুই প্রকারের। ছোট আকৃতির উল্কা, যা প্রায়সই বায়ুমণ্ডলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সে গুলি ধূমকেতুর অবশেষ বলে মনে করা হয়। ধূমকেতু তার চলার পথে নিজ দেহাংশকে অনেক সময় বিচ্ছিন্ন করে ফেলে উল্কা সৃষ্টি করে থাকে। আবার কোন নৈসর্গিক কারণে ধূমকেতু ধ্বংস হয়ে গিয়েও উল্কা কণা সৃষ্টি হতে পারে। এই ধূমকেতু হ'ল মহাকাশে সূর্য্যকে পরিক্রমারত আকাশচারী বিশেষ। সূর্য্যকে ইলিপ্স, পারাবোলা ও হাইপারবোলা সদৃশ অক্ষপথ ধরে এগুলি ঘুরছে বলে মনে করা হয়।

ধূমকেতু দেখতে বিরাটকার ও প্রচণ্ড উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বলে মনে হলেও আসলে এগুলি অতি হাল্কা জড় কণিকার দ্বারা গঠিত। ধূমকেতুর ঘনত্ব এত কম যে হাল্কা জড় কণা সূর্য্যতেজ বিকিরণের চাপে ছড়িয়ে প'ড়ে অমন দীর্ঘ পুচ্ছের আকার ধারণ করে। ধূমকেতুর গোলাকার মূল অংশতেও জড়কণিকার সন্নিবেশ এত হাল্কা যে তার ভিতর দিয়েও দূরের মহাকাশ ও জ্যোতিষ্ক প্রায় পরিষ্কার দেখা যেতে পারে। যদি কোন ধূমকেতুর পুচ্ছ পৃথিবীকে স্পর্শও করে তবুও তাকে পৃথিবী থেকে প্রায় বুঝতেই পারা যাবে না। এইরকম আদিম জড় কণিকার প্রাণীকোষের বিরাট প্রোটিন কণা থাকা প্রায় অসম্ভব বলে মনে করা যেতে পারে। কোন কোন ধূমকেতু অবস্ত মহাকাশে ভ্রমণ করতে করতে সূর্য্য থেকে বহু দূর দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে দেখা দিয়ে আবার

মহাকাশে মিলিয়ে যায়। সুতরাং তাদের সৌরজগতের জ্যোতিষ্ক বলা যাবে না।

আরেক প্রকার উল্কাপিণ্ড অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকৃতির। এ গুলিরই কোন কোনটি বায়ুমণ্ডলে ভস্মীভূত না হয়ে পৃথিবী-পৃষ্ঠ স্পর্শ করে থাকে। এগুলি সূর্য্য থেকে গ্রহ সৃষ্টির সময় গ্রহাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন কিংবা ইতিপূর্বে বিচ্ছিন্ন গ্যাসপুঞ্জ ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হয়ে থাকে। খুদে গ্রহের মতো এরা সূর্য্যের চারদিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। প্রায়সই অনেকগুলি একসঙ্গে পরস্পর সমান্তরাল পথে সূর্য্য পরিক্রমা করে থাকে। গ্রহাণুপুঞ্জের সঙ্গেও উল্কাপিণ্ডের সংযোগ থাকতে পারে বলে মনে করা হয়। ভ্রাম্যমান এই সমস্ত উল্কা স্বভাবতই সম্পূর্ণ সৌরজগতীয় বস্তুকণা। এদের কক্ষপথ মোটামুটি তিন রকম: বৃহস্পতি থেকে দূরে, বৃহস্পতির কাছাকাছি ও পৃথিবীর কক্ষপথের মধ্য দিয়ে পরিক্রমারত। পৃথিবীর কক্ষপথ ও উল্কার কক্ষপথ যেখানে একই বিন্দুতে ছেদ করেছে সেইখানে পৃথিবী এলে দেখা যায়, উল্কা বৃষ্টি ঘটে থাকে। এইসব থেকে একথা মনে করা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে খুবই কঠিন যে উল্কাবাহিত জীবকণা তারকালোক থেকে পৃথিবীতে এসেছিল কিংবা পৃথিবীতে প্রাণীসৃষ্টির আগে উল্কাপিণ্ডে প্রাণীকোষ সৃষ্টি হয়েছিল।

উল্কাবাহিত বীজকণা থেকে পৃথিবীতে প্রাণী সৃষ্টি হয়ে থাকলে এই আদি প্রাণী বিকাশের ধারা আজো অব্যহত থাকবার কথা। কারণ প্রতিদিন পৃথিবী-পৃষ্ঠে দশ টনের মতো উল্কা কণা ঝ'রে পড়ছে। আর সংখ্যার দিক থেকে দশ লক্ষ উল্কাপিণ্ড প্রতিদিন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে। এই মতানুসারে প্রতিদিন জীবকণাও সুতরাং পৃথিবীতে আসছে অসংখ্য।

একজাতীয় উল্কা অবশ্য পাওয়া যায় যাতে জৈব যৌগ বর্তমান। এগুলিকে 'কার্বনেশাস কনড্রাইটিস্' বলে। প্রোটিনে উপস্থিত এমন ছয়টি এবং অপ্রটিন বারটি এমিনো এ্যাসিড পাওয়া যায় এই ধরণের উল্কাতে। অবশ্য পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে এই ধরণের জৈব যৌগ অজৈব প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে সৃষ্টি হয়।

দানিকেন উত্থাপিত কেলভিনের মতের একটি যৌক্তিক ফাঁকও রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সম্পর্কে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন, 'স্যার উইলিয়ম কহেন যে অনেক উল্কাপিণ্ড বীজবাহি। অন্যগ্রহ হইতে বীজ আনিয়া এই পৃথিবীতে বপন করিয়াছে। বুঝিলাম, এই পৃথিবী অন্যগ্রহ প্রেরিত বীজে উদ্ভিদ ও জীবাদি বিশিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সে গ্রহেই বা প্রথম বীজ কোথা হইতে

আসিল?' প্রাণীর উৎস সংক্রান্ত এই সঙ্গত প্রশ্নের জবাবের দিকে দানিকেন যান নি। একসময় প্রাণীবীজ তত্ত্ব নামে একটি বক্তব্য প্রচলিত ছিল। তাতে বলা হয়, পৃথিবী যখন ঠাণ্ডা হয়ে প্রাণীবাসের মতো অবস্থায় পৌছাল, তখন প্রাণীবীজ প্যানস্পারমিয়া পৃথিবীতে উপযুক্ত পরিবেশে প্রাণী সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে। পরবর্তী বিজ্ঞান-গবেষণা বিশেষ করে আলেকজাণ্ডার আইভানোভিচ ওপারিন, জে. বি. হ্যালডেন ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের আবিষ্কার ও মতাদর্শ সেই সমস্ত তত্ত্বকে বাতিল করে দেয়। দানিকেন এই অবস্থাতেও নাচার। তিনি গায়ের জোরেই তবুও দাবী করেছেন, 'যতদিন না প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করছেন যে কেলভিনের বিশ্বাস ভিত্তিহীন ততোদিন পর্য্যন্ত জীবনের উৎস সংক্রান্ত নানা মতোবাদের উর্দ্ধে তাঁর মতোবাদকে স্থান দিতেই হবে।'৩(৪৯) সাধারণ পাঠকের কাছে এমন মন্তব্য চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারে—কিন্তু তা সত্যকে প্রজ্জ্বলিত করে কি?

পলিনেশিয়ায় দেবতাদের হস্তক্ষেপ আবিষ্কার

প্রশান্ত মহাসাগরের একেবারে মাঝামাঝি জায়গায় যে দুটি দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত তার একটির নাম মাইক্রোনেশিয়া আর একটির নাম পলিনেশিয়া। মাইক্রোনেশিয়ার অন্তর্গত ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জের ভিতর অবস্থিত বৃহত্তম দ্বীপ পেনাপের স্থাপত্যকীর্তি ও পলিনেশিয়ার অন্তর্গত ইস্টার দ্বীপের অসমাপ্ত মূর্তিগুলিকে দানিকেন তুলে ধরেছেন অনৈসর্গিক গ্রহান্তরের জীবের কার্য্যকলাপ ব'লে। 'বিমানের যান্ত্রিক কোন গোলযোগের দরুণ একদল বুদ্ধিমান জীব আটকে পড়েছিল এই ইস্টার দ্বীপে।... অজানা সেই জীবেরা আদিম দ্বৈপায়নদের করলো ভাষায় বর্ণপরিচয়, শোনালো ভিনজগতের কথা, তারার কথা, সূর্য্যের কথা। তারপর তাদের একটা অনপনেয় ছাপ রাখার জন্যই হোক বা সন্ধানকারী আপনজনদের উদ্দেশ্যে সঙ্কেত খাড়া করবার জন্যই হোক আগ্নেয়শিলা থেকে কেটে বের করল প্রকাণ্ড একটা মূর্তি। তারপর অমন আরো অনেক অনেক বিশাল মূর্তি খোদাই করে দাঁড় করিয়ে দিল দ্বীপের কিনারায় সমুদ্রের তীরে, পাথরের বেদীর ওপরে। উদ্দেশ্য যেন বহুদূর থেকে তাদের দেখা যায়।'২(১০৪) কথা ছুঁড়ে দিতে দানিকেনের অবশ্য কোন বাস্তব ভিত্তির উপর নির্ভর করতে হয় না। তাই বিশ্বময় তাবৎ বিস্ময়কর কীর্তিতেই তিনি গ্রহান্তরের প্রাণীর হস্তক্ষেপ দেখতে পেয়েছেন। আর তা দেখতে গিয়ে তিনি সবসময়েই মানব ইতিহাসের সমগ্র ধারা থেকে বিশেষ কোন অংশকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন।

বাড়তি একটা প্রশ্ন এই মন্তব্য প্রসঙ্গে থেকেই যায়; তা হ'ল, সবজান্তা দেবতাদের এমন হাল হওয়াও কি সম্ভব? আর হ'লেও ছায়াপথ দাবড়ে বেড়ান প্রাণীরা পৃথিবীর একটা দ্বীপে হারিয়ে যাওয়া সাথীদের খুঁজে পাবে না, এ কেমন করে ঘটল!

প্রশান্ত মহাসাগরকে একচোখে দেখলে একটা স্থল বেষ্টিত জলরাশী হিসাবে দেখা যাবে। এর পূর্ব দিক জুড়ে রয়েছে দুই আমেরিকা। উত্তর পশ্চিম দিকে এশিয়ার মূল ভূখণ্ড এবং পশ্চিম দক্ষিণে ফিলিপাইন, বোর্নিও, গিনি অবস্থিত। দক্ষিণাংশে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড আর সর্ব দক্ষিণে দক্ষিণমেরু। এরি মাঝখানে মাইক্রোনেশিয়া ও পলিনেশিয়ার দ্বীপমালা। প্রশান্ত মহাসাগরের সর্ব অধিক গভীরতা হল ৩৫,৮০০ ফিট, গড় গভীরতা ১৪,০০০ ফিট। পলিনেশিয়া ও মাইক্রোনেশিয়ার বিস্তৃত দ্বীপাঞ্চলে গড় সামুদ্রিক গভীরতা ৬০০ ফিট মাত্র। এই সমগ্র অঞ্চলের অনেক দ্বীপই আগ্নেয় শিলার দ্বারা গঠিত। জীবন্ত আগ্নেয়গিরি এখনও রয়েছে সলেমান দ্বীপপুঞ্জ, নিউ হেব্রাইড, টাঙ্গা দ্বীপপুঞ্জ এবং হাওয়াই দ্বীপে। স্বভাবতই এই সমগ্র অঞ্চলের ভূভাগের পরিবর্তন দ্রুত হওয়া অসম্ভব নয়। অতীতে এই ভূভাগের ভৌগোলিক গঠন কেমন ছিল জোর করে কিছু বলা কঠিন। নিউগিনি-নিউব্রিটেন-নিউআয়ার্ল্যাণ্ড-সলোমান দ্বীপপুঞ্জ-নিউহেব্রাইড-নিউক্যালেডনিয়া হয়ে নিউ-জিল্যাণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল এক দ্বীপমালার মতো অবস্থান করছে। এই অঞ্চলেরও চারপাশে সামুদ্রিক গভীরতা কমবেশী ৬০০ ফিটের কাছাকাছি। কাজেই হাজার হাজার বছর পূর্বের পেনাপ ও ইস্টারের অবস্থান বর্তমানের মতো নাও থাকতে পারে। অবশ্য কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক এই অঞ্চলের সমুদ্র শ্যাওলা, ঝিনুক ও শংখ পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে সুদূর অতীত থেকেই এই দ্বীপগুলি অপরিবর্তিত আছে। পেনাপের প্রস্তর গৃহ-প্রাসাদের অংশবিশেষ যে ভাবে সমুদ্রের জলভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত তা থেকে এই সিদ্ধান্ত খুব জোর করে বলা কঠিন। বিশেষ করে যখন এই সমস্ত অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য্য কিছুই হয় নি।

দানিকেন অবশ্য বিস্ময়কে বৃদ্ধি করবার জন্য, পেনাপের কীর্তির পিছনে স্থানীয় অধিবাসীদের যে হস্তক্ষেপ ছিল না তা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সেই সমস্ত দ্বীপের লোকসংখ্যা যতো তাতে তাদের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেও ঐ সমস্ত কীর্তি স্থাপন সম্ভব নয়। 'নানমাদলের এই অট্টালিকাশ্রেণী যখন তৈরি হয়েছিল, পেনাপের লোকসংখ্যা তখন আজকের তুলনায় অনেক

কম ছিল।' কিন্তু আগ্নেয়শিলা-বিশিষ্ট দ্বীপের ক্ষেত্রে নৈসর্গিক পরিবর্তনকে গণ্য করলে এমন কথা কি জোর করে বলা যায়? ভূ-ভাগ হিসাবে এই বিরাট অঞ্চল সংযুক্ত থাকার কোন চিহ্ন না থাকলেও ইয়োরোপের চার গুণ এই অঞ্চলে প্রধানতঃ একই পলিনেশিয় ভাষা প্রচলিত। যদিও লিখতে পারার মতো কোন উন্নত বর্ণপরিচয় পাওয়া যায় না। এই বিশাল অঞ্চল জুড়ে একই পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত। জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্যও কম বেশী একই প্রকার। স্বভাবতই মূল প্রশ্নটা থেকেই যায় যে এই বিশাল এলাকা জুড়ে সমস্ত অধিবাসীরা কীভাবে পরস্পর যোগাযোগ রক্ষা করত আর তাদের বংশগত উৎসই বা কোথায়? জনসংখ্যা আজ যতো তার থেকে অতীতে কম থাকাটা সব সময়ে নাও ঘটতে পারে। হারকুলেনিয়ম আর পম্পিয়াই নগরী বিসুভিয়সের অগ্নুৎপাতে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তারপরই সেখানকার জনসংখ্যা নিশ্চয়ই পূর্বের থেকে বেশি হওয়া সম্ভব ছিল না। আর ঐ দ্বীপাঞ্চলে সমুদ্র জলোচ্ছাস কত অঘটন ঘটিয়েছে কে বলতে পারে! লোকসংখ্যার বর্তমান স্বল্পতার যুক্তিতে বৃহৎ বৃহৎ স্থাপত্য কীর্তির কর্মক্ষমতার পিছনে অজ্ঞাত দেবতাদের নিয়ে আসার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক থর হেয়ারডেল ইস্টার দ্বীপের অধিবাসীদের বংশগত ও স্থাপত্য-অভিজ্ঞতার উৎস খুঁজতে গিয়ে পেরুর ইন্‌কাদের সঙ্গে পলিনেশিয়দের যোগসূত্রের তত্ত্ব দিয়েছেন। পলিনেশিয়দের উৎপত্তির প্রশ্নে বাস্তবের কাছাকাছি সে চিন্তার কিছু পরিচয় এখানে তুলে ধরা যেতে পারে।

মেক্সিকো এবং পেরুর সভ্যতার সঙ্গে মিশরের সভ্যতার যোগাযোগের বেশ কতকগুলি পরিচয় পাওয়া যায়। আবার পেরুর ইন্‌কাদের সঙ্গে প্রচুর মিল খুঁজে পাওয়া যায় ইস্টার দ্বীপের অধিবাসীদের। যেমন পলিনেশিয়দের কাছে সূর্য্যদেবতা 'রা' নামে পরিচিত। সেই একই নামে সূর্য্যদেবতাকে মিশর ও পেরুতে পূজা করা হয়। মিশরের পিরামিড আর মেক্সিকোর পিরামিডের মূল গঠনকার্য্য একই রকম। দানিকেন উত্থাপিত দক্ষিণ আমেরিকার হাতির চিত্র মিশর থেকে আগত মানুষদের স্মরণ থেকে অংকিত হওয়া অসম্ভব নয়। আর সব থেকে যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হল, পেরু-মেক্সিকো-ইস্টার দ্বীপের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য থেকে হঠাৎ সুরুর লক্ষণই বেশী পাওয়া যায়। যেন কোন উন্নত জাতির হাতে গড়া এই সভ্যতাগুলি। এ থেকে এই স্থানগুলির ভিতর সুদূর অতীতে স্থলপথে কোন যোগাযোগের উপায় ছিল ব'লে অনেকে মনে করেন। হেয়ার ডেল অবশ্য জলপথেই যোগাযোগ থাকা সম্ভব বলে

অভিমত প্রকাশ করেন।

মিশরে রিড জতীয় একরকম বেতের বোটের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। প্যাপাইরাসের বোটের ছবিও দেখতে পাওয়া যায় অনেক। এই নৌকাগুলি কীভাবে তৈরী হ'ত তার ছবিও মিশরের নানা চিত্রাঙ্গনে খুঁজে পাওয়া যায়। পেরুতে একরকম রিড বোটের ছবি দেখতে পাওয়া যায়, যেমন বোটের প্রচলন ছিল ইস্টার দ্বীপের মানুষের ভিতরেও।

পেরু ও পলিনেশিয়া—এই উভয় জায়গাতেই বছরের হিসাব রাখা হয় সপ্তর্ষি মণ্ডলের অবস্থানের সঙ্গে হিসাব করে। এই দুই দেশেই সপ্তর্ষিকে মনে করা হয় কৃষি দেবতা হিসাবে।

পলিনেশিয়াতে বৃদ্ধলোকেরা তাদের পূর্বপুরুষের নাম মুখস্ত ব'লে যেতে পারে। বিভিন্ন দ্বীপ থেকে এই নামগুলো সংগ্রহ ক'রে দেখা গেছে যে সব নামের তালিকায় প্রায় একই রকম। পূর্বপুরুষ প্রত্যেক সর্দারদের গড় রাজত্বকাল ২৫ থেকে ৩০ বছর ক'রে ধরলে দেখা যায় যে সে দেশে প্রথম রাজার আবির্ভাব ঘটেছিল ৫০০ থেকে ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি। সেই সমস্ত রাজাদের নাম যা পলিনেশিয়াতে প্রচলিত তা হ'ল—কামা, ইলো, মাউরি, রা, রাঙ্গি, পাপা, তাবাঙ্গা, কুরা, কুকারা, হিটি, টিকি প্রভৃতি। এই একই নামগুলি পেরুতেও শুনতে পাওয়া যাবে।

পেরুর ইন্‌কাদের মধ্যে কাহিনী প্রচলিত আছে যে বিরাকোচা ছিলেন ইন্‌কাদের একজন রাজা। সূর্য্যদেবতা বিরাকোচার যে নাম প্রাচীনকালে পেরুতে প্রচলিত ছিল, তা হ'ল কনটিকি এবং ইল্লাটিকি অর্থাৎ সূর্যটিকি ও অগ্নিটিকি। টিটিকাকা হ্রদের তীরে ধ্বংসাবশেষকে মনে করা হয় যুদ্ধরত দুই অংশের লড়াই এর ফল হিসাবে। কোকুইম্বো উপত্যকা থেকে কারি নামে এক রাজা সাদা দাড়িওয়ালা কনটিকির উপর আক্রমণ হানে। টিকিকাকার তীরে যুদ্ধ হয়। কনটিকি ও তার দল পরাস্ত হয়। সদলে তারা প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে পালিয়ে যায়; আর পশ্চাদ্ধাবনে ভীত হয়ে বিরাট বিরাট ভেলার বাহিনী নিয়ে সমুদ্রে ভেসে রওনা হয়ে যায়।

পলিনেশিয়ার অধিবাসীদের অনেকের রঙ ফরসা, চুল লালচে আর কটা চোখ। নাক ও ঠোঁট সেমেটিক জাতির মতো। অন্য আরেকদল অধিবাসীর নাক হ'ল মোটা ও ভারি। তাদের গায়ের রঙ হলদে বাদামী এবং চুল কালো।

লালচুলওয়ালারা বলে, তাদের পূর্বপুরুষ এসেছিল, পুবদিকের কোন এক রোদঝলসান পাহাড়ী দেশ থেকে। তারা নিজেদের বলে উরুকেহু। এই

দ্বীপের রাজা টাঙ্গারোয়া, কানে, টিকি প্রভৃতি তাদের পূর্বপুরুষ।

হেয়ারডেল এই সব তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে শ্বেতবর্ণ সূর্য্যটিকিই পেরু থেকে বিতাড়িত হয়ে পলিনেশিয়দের আদিপুরুষ সূর্য্যটিকি হয়ে অবির্ভূত হয়। পেরুথেকে পশ্চিমে বিতারিত শ্বেতবর্ণের মানুষ আর পলিনেশিয়ার পূর্বদেশের আগন্তুক আদি পুরুষ আসলে একই। পরবর্তী সময়ে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের আমেরিকানরা দ্বিতীয় আরেক দলে হাওয়াই থেকে পলিনেশিয়ায় এসে থাকবে। এদের দুই এর সংমিশ্রনে পলিনেশিয় জাতের উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং তাদের পূর্ববর্তী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই ইস্টার দ্বীপের মূর্তি গড়তে সাহায্য করে।

মিশর থেকে পেরু আর পেরু থেকে ইস্টার দ্বীপে আদিবাসীদের গমনা-গমনের দুস্তর বাধা সমুদ্র সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন ওঠে, মন্তব্যের আওতা থেকে তার বাস্তব সমাধান করতে হেয়ারডেল দু'টি সমুদ্র অভিযান পরিচালনা করেন। তাঁর সেই দু'টি বিখ্যাত অভিযান হ'ল 'রা' অভিযান ও 'কনটিকি' অভিযান। প্রথমটি পরিচালিত হয় মিশর থেকে আটলান্টিকের বক্ষচিরে আমেরিকার পানে আর দ্বিতীয়টি পরিচালিত হয় আমেরিকা থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্ময়কর দ্বীপ ইস্টার-এর দিকে।

ম্যাজিল্যান, কুক প্রভৃতি সমুদ্র অভিযাত্রীরা সমুদ্রস্রোত আর বাতাসের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করেই বিশাল জলপথ অতিক্রম করেছিলেন। তারো অতীতের দুদ্ধর্ষ আদিম মানুষেরা প্রয়োজনের তাগাদাতেই সেই সব প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে আরো ব্যবহার্য্য জ্ঞান নিয়েই চলাচল করত। সমুদ্রপথে যাতায়াতের বিস্ময়কর দক্ষতা যে অদিবাসীদের ছিল তার প্রমাণ অধুনা বহু দ্বীপবাসীর ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক বিভাগের বছর পঞ্চাশেক আগের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী ওঙ্গোরা স্বচ্ছন্দে ভেলায় ক'রে সমুদ্রের নানা দ্বীপে যাতায়াত করত। কোন কম্পাস ছাড়া যে কীভাবে তারা এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে পৌছাতে পারত তার কোন সহজ উত্তর পাওয়া যায় না। এই দক্ষতা যে প্রকৃতি নির্ভর অতীতের মানুষের আরো বেশি ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রাগৈতিহাসিক মানুষী ক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে একটা কথা মনে রাখা দরকার আছে তা, হ'ল মানব দক্ষতা যা অতীতে অর্জিত হয়েছিল তার অনেক কিছুই আজ আর অবশিষ্ট নেই, কারণ অন্য কোন দক্ষতা দিয়ে তা, প্রতিস্থাপিত হয়েছে। আজকের মানুষের শারীরিক শক্তি দিয়ে অতীতের

দৈহিক শক্তির কোন পরিমাপ করা সম্ভব নয়। একটা কাঠের ভেলায় করে অক্লেশে জেলেদের সমুদ্রে নেমে পড়তে দেখে শহরের শিক্ষিত আধুনিক মানুষ চমকে যাবে। এই তুলনায় অতীতকে দেখতে পারলে তাদের সাহস ও ক্ষমতার কিছুটা পরিমাপ করা সম্ভব। প্রকৃতিকে আজকের মানুষ অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে। কিন্তু অতীতে মানুষের উপর প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ ছিল সর্বতোমুখী। সুতরাং মানবিক গুনাবলীর যেমন সেদিন ছিল অনেক বেশি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা তেমনি প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান আর তাকে অবলম্বন করবার জন্য তার সযত্ন রক্ষণাবেক্ষন ছিল স্বাভাবিক। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে একদেশ থেকে অন্যদেশে পাখির ভ্রমণের যে দক্ষতা তা সম্পূর্ণই প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে তার জৈবিক গুণের যোগসূত্রের এক স্বাভাবিক পরিনাম। আদিম অবস্থার মানুষের মধ্যে এমন গুণের অবশেষ ছিল। দেহ ও মন মস্তিষ্কে যে পরাবর্ত অতীতে গড়ে তুলতে পারত আজ নানা অবস্থার বিপাকে তার প্রয়োজনীয়তা যেমন একদিকে ফুরিয়ে গেছে, সে গুণও তেমনি অন্য দিকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। এখানেই ছিল সেদিনের মানুষের অসাধারণ কীর্তির চাবিকাঠি। সমুদ্র যাত্রাকে এই দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে অসম্ভব মনে হবার কারণ নেই। হিমালয়ের নানা শৃঙ্গে বহু অনুশীলনের পর অভিযাত্রীরা যাত্রা করে। অথচ শেরপাদের সে ট্রেনিং ছাড়াই অধিক দক্ষতার পরিচয় দিতে দেখা যায়। দানিকেন অতীতকে দেখতে গিয়ে পরিবর্তনের এই বৈজ্ঞানিক ধারাটি ভুলে গিয়েছেন।

পেরুর ইন্‌কারা সমুদ্রে যেত বাহিনী নিয়ে। বালসা কাঠের ভেলা তৈরী করে দলে দলে তারা সমুদ্রে নেমে যেত। বালসা কাঠের ভেলায় দলে দলে যেত মাছ ধরতে। বালসার গুড়ি দিয়ে তৈরী ভেলাতে ক'রে পঞ্চাশ মন পর্য্যন্ত মাছও নেওয়া যেত। ভেলা বা নৌকা তৈরীর দক্ষতা বহু দেশের আদিম অধিবাসীদের ভিতরেই প্রচলিত। যেমন এস্কিমোদের কায়াক নৌকা—এর বাঁধন ও গঠন অসাধারণ। আধুনিক অভিযাত্রীরাও এমন নৌকা তৈরি করতে পারে না।

হেয়ারডেল মিশরের রিডবোটের অনুকরণে এক নৌকা তৈরী ক'রে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেবার অভিযান সংগঠিত করেন। 'রা' অভিযান নামে পরিচিত এই সমুদ্র যাত্রা, প্রথমবার ৩০০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করবার পর বর্জিত হয়। নানা কারণে নৌকা ভেঙে যায়। দ্বিতীয়বার সফল অভিযান পরিচালনা ক'রে তিনি প্রমাণ করেন যে মিশর থেকে প্যাপাইরাসের

নৌকা ক'রে আমেরিকা যাওয়া অতীতে সম্ভব ছিল। দ্বিতীয় 'রা' অভিযানের প্যাপাইরাসের নৌকার দৈর্ঘ্য ছিল ৪০ ফুট, প্রস্থ ১৬ ফুট আর ছৈ-এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ছিল যথাক্রমে ১২ ফুট ও ৯ ফুট। মরক্কোর বন্দর থেকে ছেড়ে ৫৭ দিনে দক্ষিণ আমেরিকার বারবাডোস বন্দরে নৌকা পৌছায়। এই পথের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ৬১০০ কিলোমিটার।

ঐ ধরনের একই অভিযান তিনি পরিচালনা করেন পেরু থেকে ইস্টার দ্বীপের দিকে বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে। 'রা' অভিযানে ছিল নৌকা। এই 'কনটিকি' অভিযানে ব্যবহৃত হয় ভেলা। কারণ পেরু ও ইস্টার দ্বীপে ছিল প্রধানতঃ ভেলারই প্রচলন। রেড ইণ্ডিয়ানরা যে ভাবে ভেলা তৈরী করত ঠিক তেমনি ভেলা তৈরী ক'রে হেয়ারডেল তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ইস্টার দ্বীপে রওনা হ'ন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, পেরুর ইন্‌কারা এইভাবেই ইস্টার দ্বীপে গিয়ে ঘর বেঁধেছিল।

বালসা কাঠের তৈরী ভেলাতে আদিম সময়ের ব্যবহৃত মালমসলা ছাড়া কিছু ব্যবহার করা হয় নি। কোন পেরেক বা কাঁটা কিংবা লোহার তার জাতীয় কিছু ব্যবহার না ক'রে রেশমের দড়ি দিয়ে ভেলা বাঁধা হয়েছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের দীর্ঘ পথ অতিক্রান্ত হয়েছিল ১৩১ দিনে।

হেয়ারডেলের অভিমত হ'ল, ইস্টারের দ্বৈপায়নেরা পূর্ববর্তী সভ্যতার উত্তরাধিকার বহন করেই মূর্তিগড়ার কাজে লেগেছিল। হেয়ারডেলের তত্ত্ব কতটা সঠিক তার বিচার এখানে করবার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু রহস্যময় ইতিহাসের প্রশ্নের সমাধানে এটা যে একটা বাস্তবসম্মত পদ্ধতি সেটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

হেয়ারডেল ইস্টার দ্বীপের ঐ মূর্তিগুলি যে প্রাচীন পদ্ধতিতে তোলা যায় তারও প্রমাণ করেছেন। দানিকেন নিজেই উল্লেখ করেছেন, 'দড়ি দিয়ে বেঁধে কাঠের কড়ি দিয়ে ঠেলে আঠারো দিন ধরে হাড়ভাঙা পরিশ্রম ক'রে সুন্দর এক আদিম পদ্ধতিতে, মারে জোয়ান হেঁইও বলে হেয়ারডেল দাঁড় করাতে পেরেছিলেন একটিমাত্র মাঝারি হেলে পড়া মূর্তিকে।'১(১০৩) আর ঐ দ্বীপবাসীরা যে পরবর্তী সময়ে মূর্তিগুলিকে বাঁধ দিতে পাথরের মতো ব্যবহার করেছে তা, এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

মূর্তিগুলির নিকটে ও অন্যত্র প্রচুর পাথরের অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। দানিকেনের ব্যাখ্যা হ'ল যে আদিবাসীরা ওগুলি তৈরী ক'রে মূর্তিগুলি সম্পূর্ণ করার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে ফেলে রেখে চলে গেছে। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দেয় যে

আদিবাসীরা কি পরিকল্পনা ছোকে নিয়ে সেই মাফিক অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী করে কাজ শুরু করেছিল? তা না হ'লে পাথরের অত যন্ত্রপাতি কেন তারা তৈরী করবে যদি কাজই না হবে। প্রাচীনকালে মানুষ কাজ ক'রতে গিয়ে তার প্রয়োজনেই সব কিছু গড়ত। পাথর দিয়ে পাথর কাটার প্রয়োজন ছিল বলেই পাথরের অস্ত্র তৈরী ক'রত। এবং স্বভাবতই তার সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ত কাজ ক'রতে ক'রতে। ইস্টার দ্বীপের মূর্তিগুলির যে ধরন তা যে সূক্ষ্ম কাজ নয় সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। যদি গ্রহান্তরের প্রাণী তাদের উদ্ধারের প্রয়োজনে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য ওগুলো গ'ড়ে থাকে তবে তা জ্যামিতিক আকার হওয়াই তো স্বাভাবিক ছিল।

ইস্টার দ্বীপের উপর গবেষণা কমই হয়েছে। হেয়ারডেলের ব্যাখ্যা এই পরিস্থিতিতে দুঃসাহসিক। কিন্তু তাঁর ব্যাখার ভিত্তি রয়েছে মাটিতে। আর দানিকেনের ব্যাখ্যা প্রথম থেকেই গড়ে উঠেছে শূন্যের ওপর দিয়ে।

পিরামিডকে অতিপ্রাকৃত সৃষ্টি হিসাবে দেখা

মিশরের পিরামিড এক বিস্ময়কর স্থাপত্যকীর্তি। এই পিরামিড বলতে সাধারণতঃ বোঝায় গিজাতে অবস্থিত খুফুর পিরামিডকে, যাকে হেরোডোটাস বলেছিলেন, শিমক্‌সের পিরামিড। এই পিরামিডের বিশালত্ব, নিখুঁতত্ব ও জ্যামিতিক আকৃতিই বিস্ময়ের কারণ। সন্দেহই নেই যে বহু গবেষণার পরও পিরামিড সম্পর্কে শেষ কথা কেউ বলতে পারেন নি। অর্থাৎ পিরামিড সৃষ্টির পিছনে সর্বজনস্বীকৃত ব্যাখ্যা আজো দেওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু গবেষণা যা হয়েছে তা থেকে পিরামিড তৈরী করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব, এমন কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

দানিকেন অন্যান্য স্থাপত্যের সৃষ্টির ব্যাখ্যার মতো পিরামিড আর দ্বিতীয় রামেসিসের মন্দির সৃষ্টির ব্যাখ্যাতেও একইভাবে বলেছেন, 'তা হ'লে কি বহির্জাগতিক নভশ্চরেরা তাদের অত্যুন্নত প্রযুক্তি কৌশল দিয়ে ওদের সাহায্য করেছিল? কিন্তু ভিন্‌গ্রহবাসী নভশ্চরেরাই বা কেন অত কষ্ট স্বীকার করতে গেল? তা'হলে কি তারা চেয়েছিল হাজার হাজার বছর পরের মানুষ প্রশ্ন করুক, জানবার চেষ্টা করুক এই যেমন আমি প্রশ্ন করছি জানতে চাইছি।'৪(৩৩) হাজার হাজার বছর পরের মানুষের জন্য প্রশ্ন রেখে যেতে পিরামিডই কেন সৃষ্টি করা হ'ল, সে প্রশ্ন অবশ্য তুলে লাভ নেই। তবে পিরামিড তৈরীর ইতিহাসে, মিশরের মতো জায়গায়, খুফুর পিরামিড স্বতন্ত্র

হলেও একমাত্র নয়। গিজাতেই আরো দু'টি পিরামিড আছে, খাফ্রে এবং মেনকউরের পিরামিড। হেরোডোটাস যাদের বলেছেন যথাক্রমে শেফ্রেন এবং মিসেরিনাস-এর পিরামিড। এ ছাড়া মিশরে বিভিন্ন জায়গায় অন্ততঃ ২৫টির মতো পিরামিড তৈরী হয়েছে ইতিহাসের নানা পর্বে।

পিরামিড বলতে সেই জ্যামিতিক আকারের ঘনককেই বোঝায় যার ক্ষেত্র ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, ষষ্ঠভুজ, অষ্টভুজ জাতীয় আকারের এবং যার প্রত্যেকটি দিক শীর্ষে ত্রিভুজাকারে একটি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। তবে স্থাপত্যের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ চতুর্ভুজের উপর পিরামিডই দেখতে পাওয়া যায়। বহির্জাগতিক নভশ্চরেরা প্রশ্ন সৃষ্টির জন্যই যদি খুফুর পিরামিড গড়ে থাকবে তবে অন্যান্য পিরামিড থেকে বিশিষ্টতা স্থাপনের জন্য বহুভুজের উপর তা গড়তে পারত। সে ক্ষেত্রে মিশরের এত পিরামিডের ভিতর জীবন্ত ব্যতিক্রম স্বভাবতই বিরাট প্রশ্নাকারে দেখা দিতে পারত। অবশ্য কী হ'তে পারত তার গবেষণা করে লাভ নেই। বরং দেখা যেতে পারে, মিশরে পিরামিড সৃষ্টির পিছনে মানুষের ভূমিকা থাকাটা কতটা স্বাভাবিক ছিল। পিরামিড মনুষ্যসৃষ্ট যদি হয়ে থাকে তবে শতরহস্য-জালে-জড়িয়ে থাকলেও সে ধাঁধা কাটান অসম্ভব হবে না। যদি তা না হয়ে দানিকেনের মন্তব্য মতো অত্যুন্নত জীবের হাত এর পেছনে থাকে, তবে সেই উন্নত প্রাণীর প্রাযুক্তিক জ্ঞানের পর্যায়ে পৌছাতে না পারলে রহস্য উন্মোচন সম্ভব হবে না। পিরামিডের ইতিহাসভিত্তিক সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে আলোচনা এ ব্যাপারে কিছুটা সহায়ক হতে পারে।

পিরামিডের গায়ে রাজার ইচ্ছানুক্রমে যে সব মন্ত্র লিখিত আছে তার ৫০৮ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে: আমার পায়ে উল্লম্ফনের শক্তি জোগানোর মতো তোমার রশ্মিতে আমি পরিভ্রমণ ক'রে রা এর কপোলে অবস্থানকারী ইউরেয়াস এর কাছে আরোহণ করি।

৫২৩ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে: হে সূর্য্যরশ্মি, ঈশ্বর তোমাকে শক্তিদান করেছেন যাতে তুমি নিজেকে রা এর চক্ষুর মতো স্বর্গে উত্তোলন করতে পার।

২৬৭ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে: স্বর্গের জন্য এক সিঁড়ি রচিত হয়েছে যাতে আরোহণ করে রাজা স্বর্গে যেতে পারেন।

রা মিশরের সূর্যদেবের নাম। সূর্য্যের সঙ্গে স্বর্গারোহণের সম্পর্ক মিশরীয়দের চিন্তায় নানাভাবে প্রতিফলিত। পিরামিড সৃষ্টির পিছনে সূর্যের কাছে যাবার বাসনার প্রতিফলন থাকা অস্বাভাবিক নয়। খাজুরাহ মন্দিরের

পরিকল্পনায় পাহাড়ের প্রতিরূপ আছে। কারণ হিন্দুদের বিশ্বাস, ঈশ্বর পাহাড়ের চূড়ায় বাস করেন। কিন্তু সূর্যের সঙ্গে পিরামিডের সম্পর্ক কী?

অস্তায়মান সূর্যরশ্মি যখন মেঘের আবরণ ভেদ ক'রে পৃথিবীর উপর পড়ে, তখন রশ্মিগুলিকে সুন্দর ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। আর তা দেখে পিরামিডের কল্পনা মাথায় আসা অস্বাভাবিক নয়। প্রত্যেকটি আলোক রশ্মি একই বিন্দু থেকে বিচ্ছুরিত হ'য়ে ত্রিভুজাকারে বিশ্লিষ্ট হ'য়ে পশ্চিমাকাশে যে দৃশ্য রচনা করে তার দিকে তাকিয়ে, সূর্যের কাছে পৌছাবার ইচ্ছায় পিরামিড রচনার পরিকল্পনা মাথায় আসা খুব-ই স্বাভাবিক। মিশরীয় স্থপতির কাছে হয়ত এই দৃশ্যই পিরামিড গঠনের প্রেরণা জুগিয়ে থাকবে। কিন্তু সে পরিকল্পনা কাজে পরিণত করা যাবে কী ভাবে? পিরামিড তৈরীর প্রথম সূত্রপাত ঘটলই বা কী ভাবে?
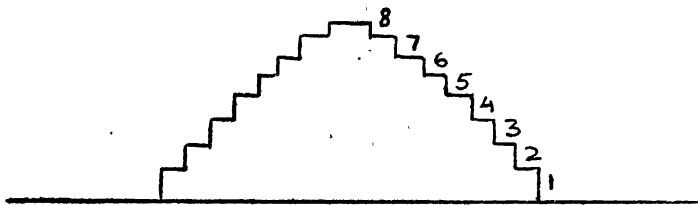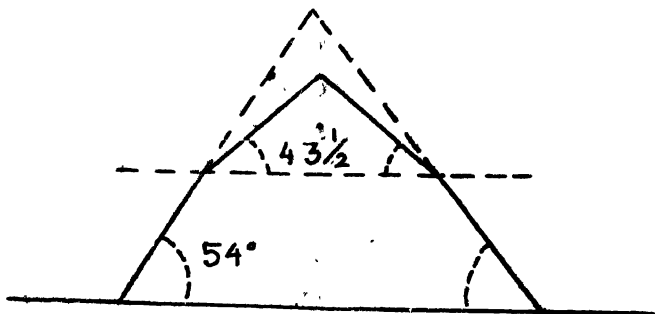
ধাপ পিরামিড

বাঁকা পিরামিড

মিশরের পিরামিডগুলির কালানুক্রমিক অনুসন্ধান থেকে দেখা যায় যে তিনটি ধাপে পিরামিড গঠিত হয়েছে। প্রথম, খাঁজকাটা বা ধাপ পিরামিড। অর্থাৎ চারপাশের ত্রিভুজের পৃষ্ঠদেশ অসমতল। সিঁড়ির মতো ক্রমশঃ

উপরে উঠে গিয়েছে। দ্বিতীয়, বাঁকা পিরামিড। এগুলির পৃষ্ঠদেশ মাটি থেকে যে কৌণিক বক্রতায় উপরে উঠে গেছে, কিছুটা পর তা আরেকটু বেশী বেঁকে গিয়ে শীর্ষে মিশেছে। একটানা সোজা উপরের দিকে ওঠে নি। তৃতীয়, যে ধরনের পিরামিড সাধারণতঃ দেখা যায় অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশ সমতল এবং একই কোণ করে একেবারে শীর্ষ পর্যন্ত পৌছিয়েছে। এই তিনটি স্তর প্রমাণ করে মিশরীয় শিল্পীরা ক্রমে ক্রমে পিরামিড তৈরীর দক্ষতা অর্জন করেছে।
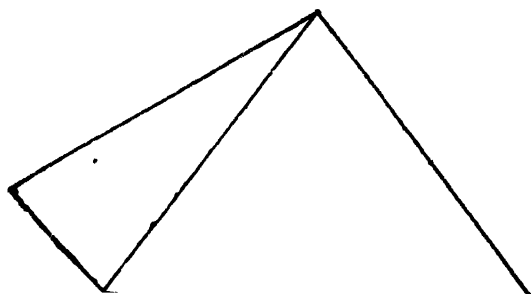
পিরামিড

পিরামিডের সঙ্গে সূর্য্যদেবের সম্পর্ক থাকা যে সম্ভব তা বোঝা যায় মিশরীয় লিপিতে আর অক্ষরটির চিহ্ন হিসাবে ধাপ পিরামিডের ছবির ব্যবহার থেকে। রা হল সূর্যদেব। ধাপ পিরামিড 'র' এর লিপিচিত্র। এ যোগাযোগটি অহেতুক নয়।

নীলনদের পশ্চিম তীরে সমস্ত পিরামিড অবস্থিত। অস্তায়মান সূর্যের পিছু পিছু বা এর কাছে গমনের ইচ্ছায় হয়ত পশ্চিমতীরকেই পিরামিড স্থাপনের জন্ম বেছে নেওয়া হয়েছে। আবু রোশ গিজা, জরিয়েৎ এল এরিয়েন, আবু গোরোব, আবুসুর, সাক্কারা, দাসুর, মিডাম প্রভৃতি বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে পিরামিডগুলি ছড়িয়ে আছে।

সাক্কারাতে জোসোর পিরামিড হ'ল ছয় থাকে নির্মিত ধাপ পিরামিড। সেখেমখেটের থাঁজকাটা পিরামিড সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যায় নি। তৃতীয় ধাপ পিরামিড হ'ল, খাবার পিরামিড।

দাসুরে সন্ধান পাওয়া যায় বাঁকা পিরামিডের। এ রকম দু'টি পিরামিড খুঁজে পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী পিরামিড থেকে এগুলি বড়। একটির

ভূমির ক্ষেত্রের পরিমাণ ১৯০ বর্গমিটার। প্রথম বাঁক শুরু হয় ৫৪° কোণ দিয়ে, এক তৃতীয়াংশ উচ্চতা অতিক্রম করার পর উন্নতি কোণ কমে ৪৩°২ দিয়ে শুরু হয়েছে। ফলে যে পিরামিডের উচ্চতা হবার কথা ১৩৫ মিটার তা শেষ পর্যন্ত হয়েছে ১০১ মিটার উঁচু।

মিডামে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত পিরামিড আবিষ্কৃত হয়েছে। সেইটি পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে পিরামিডের স্থাপত্য কৌশলের পরিচয় মেলে। এটি প্রথমে তৈরী হয় সাত ধাপে। তারপর সেই ধাপের উপর আর এক ধাপ ক'রে দ্বিতীয়বারে আট ধাপ করা হয়। এর উপর ধাপগুলি ভরে দিয়ে পৃষ্ঠদেশ সমান ক'রে গড়া হয়। এটির উন্নতি কোণ প্রথম থেকেই ৫২°। মিশরের পরবর্তী সমস্ত পিরামিডেই এই কৌণিক বক্রতা অনুসরণ করা হয়েছে।
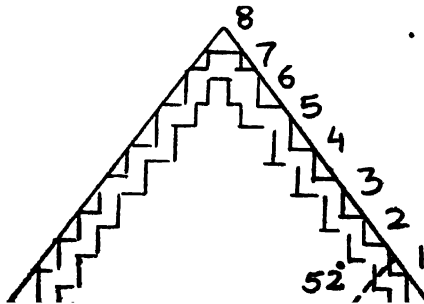
পিরামিডের গঠন কৌশল—মিডামের নক্সা

দাসুরে রেড পিরামিড নামে স্নোফ্‌রুর যে পিরামিড দেখতে পাওয়া যায় সেটিই হ'ল সর্বপ্রাচীন অক্ষত পিরামিড। কিন্তু এটি একটি ছোট পিরামিড। এর ক্ষেত্রের আয়তন ২২০ বর্গমিটার, আর উন্নতি কোণ ৪৩২ ডিগ্রি।

পিরামিড স্থাপনের কালানুক্রমিক বর্ণনা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বিস্ময়কর পিরামিড মিশরে হঠাৎ গড়ে ওঠে নি। নীচের তালিকায় দেখা যাবে যে পিরামিড স্থাপন মিশরের ইতিহাসে একটা বৈশিষ্ট্য। কোনো হঠাৎ-আসা দেবতাদের কার্যকলাপ হ'লে তা এত বড় একটা সময় ধরে বিরাট সংখ্যায় হ'তে পারত না।

রাজার নাম	রাজবংশ	পিরামিডের অবস্থান	প্রাপ্ত আকার	মন্তব
জোসর	তৃতীয়	সাক্কারা	—	২৮১৫ খ্রীঃ পূঃ। ধাপ পিরামিড।
রাবাখ্‌ট	—	”	—	২৭০০ খ্রীঃ পূঃ
সেখেমকেট	তৃতীয়	”	—	ধাপ পিরামিড
খাবা	”	জাউয়েৎ-এল-এরিয়ান	২৭৬ বঃ ফুঃ	ধাপ পিরামিড
নেবকা	”	”	—	২৭০০ খ্রীঃ পূঃ
হুনি	”	দাস্থর	৬২০ বঃ ফুঃ	বাঁকা পিরামিড
সেনেফেরু	চতুর্থ	মিডাম	৪৭৩ বঃ ফুঃ	২ ৯০ খ্রীঃ পূঃ। বাঁকা পিরামিড
সেনেফেরু	”	দাস্থর	৭১৯ বঃ ফুঃ	রেড পিরামিড
খুফু	”	গিজা	৭৫০ বঃ ফুঃ	বৃহত্তম পিরামিড। বিস্ময়কর।
জেডেফ্রি	”	আবুরোসা	৩২০ বঃ ফুঃ	—
খাফ্রে	”	গিজা	৭০৮ বঃ ফুঃ	দ্বিতীয় বৃহত্তম। ফ্রিংক্স সম্মুখে।
মেনথাউরি	”	গিজা	৩৫৬ বঃ ফুঃ	—
উসেরকাফ	পঞ্চম	সাক্কারা	২৩১ বঃ ফুঃ	২৫৬০ খ্রীঃ পূঃ
সাহুরা	”	আবুস্থর	২৫৭ বঃ ফুঃ	—
নেফেরিরকারা	”	”	৩৬০ বঃ ফুঃ	—
নেফেরেফ্রা	”	”	—	—
নিউসেররা	”	”	২৭৪ বঃ ফুঃ	—
ইসেসি	”	সাক্কারা	২৭০ বঃ ফুঃ	—

রাজার নাম	রাজবংশ	পিরামিডের অবস্থান	প্রাপ্ত আকার	মন্তব্য
উনাস	পঞ্চম	সাক্কারা	২২০ বঃ ফুঃ	—
টেটি	ষষ্ঠ	,,	২১০ বঃ ফুঃ	২৪২০ খ্রীঃ পূঃ
পেপি—প্রথম	,,	,,	২৫০ বঃ ফুঃ	—
মেরেনরা	,,	,,	২৬৩ বঃ ফুঃ	—
পোপ-দ্বিতীয়	,,	,,	২৪৫ বঃ ফুঃ	—
ইবি	সপ্তম	,,	১০২ বঃ ফুঃ	২২৯৪ খ্রীঃ পূঃ
নেভেপেট্রা মেনথুহেটেপ	একাদশ	ডেড বাহরি	৭০ বঃ ফুঃ	। —
সিংখারা মেথুহেটেপ	,,	থেবেস	—	অসমাপ্ত।
আমেনেমহেট-প্রথম	দ্বাদশ	লিস্ট	১৯৬ বঃ ফুঃ	১৯৯০ খ্রীঃ পূঃ
সেনুস্রেট-প্রথম	,,	,,	৩৫২ বঃ ফুঃ	—
আমেনেমহেট-দ্বিতীয়	,,	দাসুর	২৬৩ বঃ ফুঃ	—
সেনুস্রেট-দ্বিতীয়	,,	জুয়াহুন	৩৪৭ বঃ ফুঃ	—
সেনুস্রেট-তৃতীয়	,,	দাসুর	৭৪২ বঃ ফুঃ	—
আমেনেমহেট-তৃতীয়	,,	হাওয়ারা	৩৩৪ বঃ ফুঃ	—
সেবেকনেফেরু	,,	মাজঘুন্না	—	রাণীর রাজত্বে পিরামিড।
আমেনেমহেট-চতুর্থ	,,	,,	—	—
খেন্‌জের	ত্রয়োদশ	সাক্কারা	—	১৭৭৭ খ্রীঃ পূঃ

বিশাল পিরামিড স্থাপত্যের মধ্যে গিজার তিনটি পিরামিডই সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এগুলি হ'ল শিঅপস্, শেফেরেন ও মাইসেরিনাস এর পিরামিড। শেফেরেনের পিরামিডের সামনে রয়েছে বিখ্যাত স্ফিংক্স। তাবৎ জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যামিতিক বিস্ময়কে তুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছে শিঅফসের পিরামিড। আগের ও পরের সমস্ত পিরামিডের মধ্যে এটি বিশালত্বে ও গঠননৈপুণ্যে অনন্যসাধারণ। দানিকেন এইটিকেই গ্রহান্তরের জীবের কীর্তি ব'লে তুলে ধরেছেন। কিন্তু পিরামিডকে, প্রারম্ভের ধাপ পিরামিড, তারপরের দুই বাঁকে সম্পূর্ণ পিরামিড এবং সর্বশেষ সমতল পিরামিডের ধারাবাহিকতায় বিচার করলে অতিপ্রাকৃত ভাবনার কোন স্থান নেই তার তৈরীর পিছনে। মিডামের ধ্বংসপ্রাপ্ত পিরামিডের বিভিন্ন স্তর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে প্রথমে তাকে তাকে সিঁড়ির মত ধাপের আকৃতিতে প্রাথমিক অংশ গড়ে উঠেছে। তারপর আরো উচ্চতার জন্য ধাপের উপর ধাপ তুলে উদ্দিষ্ট উচ্চতায় পৌছান হয়েছে। সবশেষে ধাপগুলো সমান ক'রে দিয়ে বাঁককে সমতল করা হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান যে পরবর্তী সমস্ত পিরামিডের গঠনের ক্ষেত্রেই এই কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। শিঅফসের পিরামিডও যদি খানিকটা উন্মোচন ক'রে পাথরের ভিতরটা দেখা যেত তা হ'লে তার গঠনও এমনিরকম দেখতে পাওয়া যাবে ব'লে মনে করা হয়। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে স্থাপত্য কৌশল ধীরে ধীরে শিখেই শিঅফসের পিরামিড সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। কোনো হঠাৎ জানা বিদ্যা থেকে এটি গঠিত হয় নি।

শিঅফসের পিরামিডের উন্নতি কোণ সারাবিশ্বের বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। সেই উন্নতি কোণও মিডামের ধ্বংসপ্রাপ্ত পিরামিডের কৌণিক মাপের রকমফের। ধ্বংসপ্রাপ্ত পিরামিডের উন্নতি কোণ ছিল ৫২ ডিগ্রি। দাস্থরের বাঁকা পিরামিডে এই কোণের পরিমাণ শুরুতে ৫৪ ডিগ্রি, পরে ৪৩½ ডিগ্রি। দাস্থরের রেড পিরামিডও অনুরূপ। শেফেরেনের পিরামিডের এই কোণ ৫২° ২০´। আর শিঅফসের পিরামিডের উন্নতি কোণ হ'ল ৫১°৫২´। এটির উচ্চতা ১৫০ মিটার। শেফেরেনের উচ্চতা ১৪০ মিটার। মাইসেরিনাসের উচ্চতা ৭০ মিটার। শিঅফসের পিরামিডের চতুর্ভুজের ক্ষেত্রের পরিসীমা আর উচ্চতাই সৃষ্টি করেছে ঐ উন্নতি কোণ। যার ফলে জ্যামিতিক পিরামিডের ফর্মুলা মতো 'পাই' এর মান পাওয়া যায় এর আঙ্কিক মাপ থেকে।

খুফুর পিরামিড বিস্ময়কর। আবার অন্যদিকে এই পিরামিডকে কেন্দ্র করেও কম বিস্ময় সৃষ্টিও করা হয় নি। যেমন দানিকেন বিস্ময় সৃষ্টি ক'রে ব'লছে

চেয়েছেন—এ মনুষ্য সৃষ্টিই নয়। আবার তিনি শেফেরেনের পিরামিড প্রসঙ্গে একজন সমীক্ষকের বয়ানে বলেছেন, 'বিজ্ঞানের সাহায্যে এ কাজ অসম্ভব। পিরামিডের ভিতরে যা কিছু ঘটে তা আমাদের জানা পদার্থবিদ্যা এবং ইলেকট্রন বিদ্যার নিয়ম বিরুদ্ধ'।৩(৩২) খুব অদ্ভুত কথা। বিজ্ঞানের সাহায্যে যদি পিরামিডের রহস্য উদ্ধার করা সম্ভব না হয় তবে কি ভোজবাজী দিয়ে তার সমাধান হবে? দানিকেনের কথামতো উন্নতদেবতারাই যদি এই পিরামিডের গঠনে সাহায্য ক'রে থাকে তবেই বা বিজ্ঞান দিয়ে তার ব্যাখ্যা করা যাবে না কেন? ইলেকট্রন বিদ্যা কি এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীর হাতে ভিন্ন ভাবে আবির্ভূত হবে? পিরামিডের উপর সারা পৃথিবীতে অসংখ্য পুস্তক রচিত হয়েছে। কিন্তু কোনো প্রামাণিক গ্রন্থে পিরামিডের ভিতর ভোজবাজীর কথা লেখা হয় নি। আর যে প্রসঙ্গে দানিকেন এমন মন্তব্যের অবতারণা করেছেন সে প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে।

শেফেরেনের পিরামিড শিঅফসের পিরামিডেরই যমজ ভাই-এর মতো। প্রত্নতাত্ত্বিকদের চোখে যেদিন থেকে শিঅফসের পিরামিডে দু'টি কক্ষের দু'টি প্রবেশ পথের সন্ধান মেলে সেদিন থেকেই তাঁদের কাছে প্রশ্ন ছিল, শেফেরেনের পিরামিডেও অমনি দ্বিতীয় কক্ষপথ নেই তো? নানাভাবে তার পরীক্ষা চলে। এইরকম একটি পরীক্ষা বহু অর্থব্যয় ক'রে আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে শেফেরেনের পিরামিডের ভিতর চালান হয়। 'মার্কিন সাহায্য নিয়ে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিকিরণ সন্ধানী অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈরী ক'রে তাকে একটি কমপিউটারের সঙ্গে যুক্ত ক'রে বসিয়ে দিয়েছিলেন শেফেরেনের পিরামিডের অভ্যন্তরে।' মহাজাগতিক রশ্মি শূন্য স্থানের ভিতর দিয়ে এলে এবং ঘনপাথরের ভিতর দিয়ে এলে ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া ঘটায়। সুতরাং শেফেরেনের পিরামিডে যদি দ্বিতীয় কক্ষপথ থাকে, তবে সেই শূন্যস্থান দিয়ে আগত রশ্মি নিশ্চয়ই ঘন পাথরের পথ দিয়ে আগত রশ্মি থেকে ভিন্ন হবে। এই প্রক্রিয়ায় বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা চালিয়ে সংশয়াতীত ভাবে সিদ্ধান্ত করেন যে এই পিরামিডে কোনো দ্বিতীয় কক্ষ নেই। কোনো ভেলকী না দেখিয়েই এই পরীক্ষা সমাপ্ত হয়। এতে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত নামকরা বৈজ্ঞানিকও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আর অজ্ঞাত সব ঘটনা যদি ঘটেও থাকে তবে শেফেরেনের পিরামিডে তা ঘটবে কেন? পিরামিডের যা কিছু বিস্ময় তা তো শিঅফসের পিরামিডকে কেন্দ্র করেই! তা হ'লে কি দানিকেন বলতে চান যে মিশরের সব পিরামিডই সেই আগন্তুকদের সৃষ্টি? এ কথা পিরামিডের চেয়েও বড় বিস্ময় সৃষ্টি করতে

পারে। বিশেষ ক'রে পিরামিড যখন কেবল মিশরেই দেখা যায় না। পিরামিডের সন্ধান মেলে মেক্সিকোতেও।

মেক্সিকোর পিরামিডগুলি সবই ধাপ পিরামিডের আকৃতির। উচ্চতায় মিশরের পিরামিডের চেয়ে অনেক ছোট। মাথার ওপরটা চ্যাপ্টা। এগুলো তৈরী হয়েছিল আত্মোৎসর্গ অনুষ্ঠান করবার জন্য। পিরামিডের মাথার ওপর সমান জায়গায় পুরোহিতেরা বন্দী বা স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গকারীকে নিয়ে আসত এবং তার বুক চিরে হৃৎপিণ্ড বের করে সূর্যদেবকে দান করত। এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য চারপাশে অনেকগুলি উঁচু মঞ্চ তৈরী করা হয়েছিল। সেগুলোও খুদে পিরামিড আকৃতির। এই পিরামিডের গঠন পরীক্ষা করে দেখা যায় যে এগুলি অত্যন্ত শক্ত ভিতের উপর তৈরী। এর উচ্চতা মিশরের পিরামিডের চেয়েও বেশী হ'তে পারত। এমনকি ৭৫° উন্নতি কোণ হওয়াও সম্ভব ছিল।

স্পেনীয়রা যখন প্রথম সে দেশে যায়, তারা প্রচুর নরকঙ্কাল আবিষ্কার করে। তা থেকে এমন অনুমান করা হয় যে এইসব পিরামিডের ওপর ৫০,০০০ এর অধিক মানুষকে বলিদান করা হয়েছিল। আজটেকদের ভিতর এই সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত তা হ'ল, সূর্যদেবতার অধীনে প্রথমে মানুষ ধ্বংস হয়েছে জাগুয়ারের পেটে। দ্বিতীয়বার ধ্বংস হয়েছে ঝড়ে। তৃতীয়বার আগুনে। চতুর্থবার বন্যায়। সুতরাং সূর্যদেবকে বলিদান জুগিয়ে যেতে হবে, আর তা মনুষ্য রক্তে। পিরামিডগুলি সেই উদ্দেশ্যেই তৈরী।

মিশর ও মেক্সিকোর পিরামিড বহির্জাগতিক সৃষ্টি নয়, বরঞ্চ তা সেই সমস্ত দেশের প্রথাগত চিন্তারই ফলশ্রুতি।

মিশরের সুউন্নত সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় পিরামিড সৃষ্টির নিপুণ স্থাপত্য-পদ্ধতিটি সহজে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। তবুও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা যে সমস্ত উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন সে গুলি লক্ষ্য করা যেতে পারে। তাঁদের গবেষণার উপর দাঁড়িয়ে যে সম্ভাব্য যুক্তিগুলি তুলে ধরা যায় তার কয়েকটি হ'ল :

(১) পশ্চিমাকাশে সূর্যাস্তের সময় পিরামিডের আকারে রশ্মি বিচ্ছুরণ নদীর পশ্চিম তীরকে পিরামিড নির্মাণের স্থান হিসাবে নির্বাচনে প্ররোচিত করে থাকতে পারে। সূর্যরাজ্যে গমনের ইচ্ছা সূর্যের প্রস্থানের দিককেই প্রাধান্য দেয়।

(২) পাহাড়ের যে স্বাভাবিক কাটল ছিল তার সুবিধা গ্রহণের চিন্তাও

স্থান নির্বাচনে পশ্চিম তীরকে প্রাধান্য দিয়ে থাকতে পারে।

(৩) তৎকালীন রাজধানী ছিল মেমফিস, নীল নদীর তীরে। সুতরাং কবরস্থান হিসাবে পশ্চিম তীর নির্বাচিত হওয়া অসম্ভব নয়।

(৪) বন্যার সময় নদী থেকে পিরামিডগুলির দূরত্ব কমে আসে। মিডামে এই দূরত্ব হয়ে দাঁড়ায় ২৫০ গজ। গিজাতে একমাইলের এক চতুর্থাংশ। দাস্থর ও আবু রোসাতে এই দূরত্ব দাঁড়ায় এক মাইল। নদীপথে পাথর বহনের এতে সুবিধা হয়ে থাকা সম্ভব।

(৫) গ্র্যানাইট পাথর খুব বেশী তাপে গরম করলে এবং তারপর জল দিয়ে ঠাণ্ডা করলে ফেটে যায়। এই পদ্ধতিকে বার বার প্রয়োগ করলে ছোট ছোট টুকরো পর্যন্ত করা সম্ভব। এইভাবে পাওয়া ছোট টুকরো চেঁছে নেওয়া শক্ত নয়। পাথর সংগ্রহে এই পদ্ধতি প্রয়োগ অসম্ভব নয়।

(৬) কোয়ার্টজ পাথর মিশরে প্রচুর লভ্য। অত্যন্ত শক্ত এই পাথর, কাটার কাজে খুব উপযোগী। একে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে।

(৭) সাক্কারাতে প্রথম রাজবংশের সময় তামার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। তা দিয়ে লাইমস্টোন কাটা যায়। তামার করাত ও বাটালির ব্যবহারও সে সময় হ'ত।

(৮) কার্নাকে 'র‍্যাম্প' ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। মন্দির তোরণ তৈরীতে এর ব্যবহার হ'ত। খনন কার্য চালালে মাটির নীচে তার সন্ধান পাওয়া যাবে বলে অনুমান করা হয়।

(৯) জেহুটিহেটেপের এক ৬০ টনের মূর্তিকে স্লেজে চাপিয়ে ১৭২ জন লোকের টেনে নিয়ে যাবার ছবি দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং কাঠের বড় বড় গুঁড়ির ওপর দিয়ে পাথর নিয়ে যাওয়ার প্রচলন যে ছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। পিরামিডে এ পদ্ধতি প্রয়োগ হয়েছিল চক্রাকারে ক্রমউন্নত ধাপ এর ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমিত সে পদ্ধতির পরিকল্পনা পর পৃষ্ঠার চিত্রতে প্রদর্শিত হল।

(১০) মিশরের সেচ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের উপর ছিল সমগ্র মানুষের জীবন ও ভবিষ্যৎ। এই সেচ ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ রাজার নিয়ন্ত্রণে। ফলে রাজভক্তি ও রাজার আদেশ মান্য করার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা, এই দুইটিই ব্যাপক ভাবে থাকা সম্ভব। এইখানেই ছিল হাজার হাজার মানুষকে পিরামিডের কাজে নিযুক্ত করার রাজশক্তির উৎস।
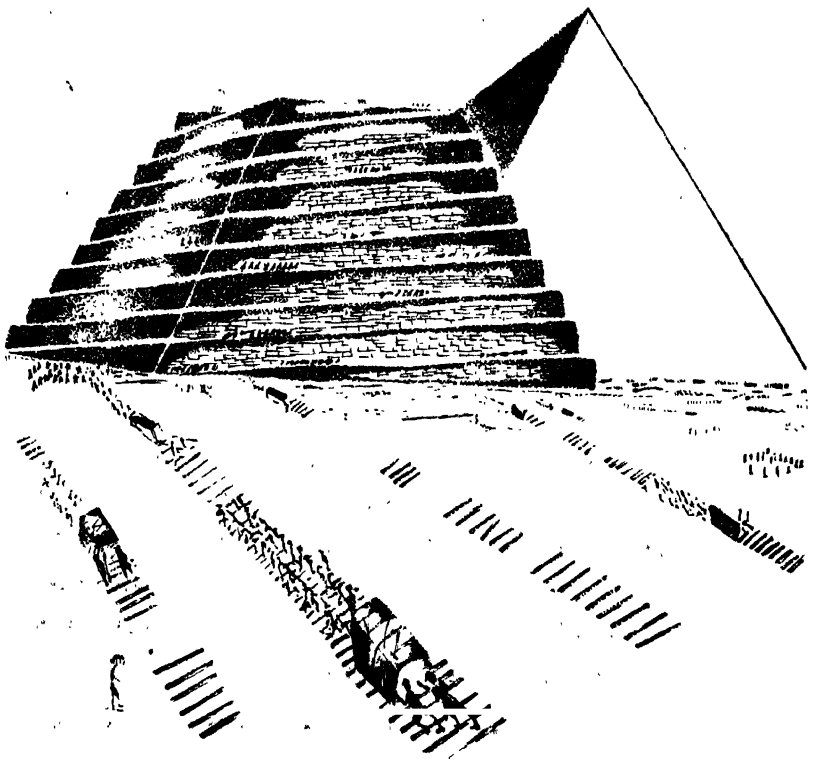
পিরামিড গঠন প্রক্রিয়া

(১১) গিজার বৃহৎ পিরামিডে ধ্বংসপ্রাপ্ত পূর্ববর্তী পিরামিডের পাথর আর এক প্রস্থ চেঁছে লাগান হয়ে থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে পিরামিডের বিশালত্ব ও মসৃণত্বের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে।

(১২) মেক্সিকোর পিরামিড যে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত তাতে ইচ্ছা করলে সেগুলি মিশরের পিরামিডের থেকে বেশী উঁচু হতে পারত সুতরাং পিরামিডের গঠনশৈলী কেবল খুফুর পিরামিডের ক্ষেত্রেই বিস্ময়কর ছিল, সেটা ভাবা যায় না।

গিজায় খুফুর পিরামিডকে কেন্দ্র করে নানারকম বৈজ্ঞানিক অনুসিদ্ধান্ত টানা হয়ে থাকে। তার অনেকগুলিই সত্য। তবে আরোপণও যে অনেক আছে, অনেক কষ্ট কল্পনাও যে একে ঘিরে ঘটছে তারও নজির কম নেই। কিছু কিছু সিদ্ধান্ত তো রীতিমত উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত।

যেমন খুফুর পিরামিডকে কেন্দ্র করে নীলনদের বদ্বীপ ও উপকূলাঞ্চলে এর

সমান দূরত্ব নিয়ে একটি বৃত্তচাপ অঙ্কন করলে তা নীলনদের মোহনার সমস্ত দ্বীপ ও উপকূলকে বেষ্টন করে। ঘটনা হিসাবে এটি সত্য। অর্থাৎ খুফুর পিরামিড বদ্বীপগুলি নিয়ে নিয়ে অঙ্কিত বৃত্তের কেন্দ্রে অবস্থিত। কিন্তু এই বৃত্তটি এত বড় যে সেক্ষেত্রে খুফুর পিরামিডের বদলে অন্য পিরামিড, মানে এমন কি আবু রোসার পিরামিডকে নিলেও ব্যাপারটা প্রায় একইরকম ভাবে সত্য হবে।

দানিকেন এমনি একটি বিস্ময়ের কথা বলেছেন, 'সেটি (পিরামিড) আবার মহাদেশগুলোর ভারকেন্দ্রে স্থাপিত।'১(৮৪)। মহাদেশগুলোর স্থলভূমি একটা বিশাল অঞ্চল। তার তুলনায় গিজার পিরামিড থেকে অন্য পিরামিড-গুলি যে দূরত্বের সূচনা করে তাতে ভারকেন্দ্র হিসাবে খুফুর পিরামিডকে একটি বিশেষ বিন্দু হিসাবে চিহ্নিত করার কোন তাৎপর্য নেই। বিশাল ভূভাগের ভারকেন্দ্র হিসাবে একটি বিন্দুকে চিহ্নিত করে খুফুর পিরামিডকে উল্লেখ করলে অবশ্যই মনে রাখতে হয় যে, স্থলভাগের অবিরত পরিবর্তন বিশেষ করে বিভিন্ন নদীবাহিত মৃত্তিকার সমুদ্রে পতন কোন ক্রমেই ভারকেন্দ্রবিন্দুকে নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তিত রাখতে পারে না। দানিকেন অবশ্য আরো অনেক বিস্ময়ের কথাও উল্লেখ করেছেন।

পিরামিডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই ধরনের একটি প্রচারিত সিদ্ধান্তের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে। পিরামিডের উচ্চতার সমান ব্যাস নিয়ে কোন বৃত্ত অঙ্কন করলে তার পরিধি পিরামিডের ভূমির পরিসীমার সঙ্গে সমান হবে। এবং ঐ বৃত্তের ক্ষেত্রফল ও পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল সমান হবে। এর দ্বারা বলা হয়ে থাকে যে, পিরামিড বৃত্তকে বর্গক্ষেত্রে পরিণত করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। কিন্তু জ্যামিতিক ধারণা অনুসারে এটা কখনই সম্ভব নয়। কারণ বৃত্তের একটি বিশেষ ধর্মই হ'ল যে, একই পরিসীমা হওয়া সত্ত্বেও একটি বর্গক্ষেত্র থেকে একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল হবে বেশী। $2\pi r$ হ'ল একটি বৃত্তের পরিধি। কোন বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা যদি $2\pi r$ এর সমান হয়, তবে বৃত্তের ক্ষেত্রফল যখন হবে πr^2 বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তখন হবে $\left(\frac{2\pi r}{4}\right)^2$ অর্থাৎ $\pi^2 r^2/4$। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে π এমন একটি সংখ্যা যার মান সম্পূর্ণ ভাবে জানা সম্ভব নয়। কাজেই বৃত্তকে বর্গক্ষেত্রে পরিণত করা ও উভয়ের ক্ষেত্রফল সমান হওয়ার পিরামিডিও সমাধান একটা ধাঁধা মাত্র।

দানিকেন তেমনি একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন, 'খিঅফসের পিরামিডের সঙ্গে পৃথিবীর যে কত যোগাযোগের কথা বলেছেন তা পড়লে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।' 'খিঅফসের পিরামিডের উচ্চতাকে যদি ১০ কোটি দিয়ে গুণ করা যায় তা হলে তা পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের সমান অর্থাৎ ৯,৩০,০০,০০০ মাইল হবে।'১(৮৩)। পিরামিডের উচ্চতা হ'ল ৪৮১ ফিট। একে ১০ কোটি দিয়ে গুণ করলে কখনই ৯,৩০,০০,০০০ মাইল হ'তে পারে না।

অনুরূপ ভাবেই বলা হয়ে থাকে, পিরামিড-ইঞ্চির হিসাবে খুফুর পিরামিডের ভূমিক্ষেত্রের পরিসীমা হয় ৩৬৫২৪'২ ইঞ্চি। অর্থাৎ একটা শতাব্দীর মোট দিনের সমান। কিন্তু এটিও একটি ভুল সিদ্ধান্ত। পিরামিডের চারপাশ থেকে বালি সরিয়ে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে একবার খুফুর পিরামিডের আসল ভূমির পরিসীমা মাপা হয়। তাতে পরিসীমার পরিমাণ হয় ৩৬২৩৪'১ পিরামিড ইঞ্চি। কাছাকাছি হলেও সৌর বৎসরের সঙ্গে এই সংখ্যার অমিল রয়েছে।

এমনি সব সিদ্ধান্তের স্তূপের ভিতর বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে চেষ্টা করা হয়েছে গুলিয়ে দেবার। দৈববিশ্বাসী ধার্মিকেরা তো পিরামিডকে প্রহেলিকা বানাবার চেষ্টা করেছে। পিরামিডলজি নামে বাইবেল ও যীশুখৃষ্টের সঙ্গেও পিরামিডের যোগাযোগ টানার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এই সব যোগাযোগ টানার চেষ্টা হয়েছে কেবল খুফুর পিরামিডের সঙ্গে। কারণ সেইটিই সবচেয়ে বড় এবং আশ্চর্য তার নির্মাণ দক্ষতা। খুফুর পিরামিডের মাথার উপরের সর্বোচ্চ পাথরটি পাওয়া যায় না। তা নিয়েও প্রচুর দৈবহস্তক্ষেপের অনুসিদ্ধান্ত টানা হয়ে থাকে। দানিকেনও তাদেরই মতো পিরামিডকে মনুষ্য সৃষ্ট স্থাপত্য হিসাবে না দেখে এর পিছনে অতিমানবীয় হস্তক্ষেপের কল্পনা করেছেন।

গোল মাত্রই দেবতার প্রতীক ভাবা

অব্যাখ্যাতকে ব্যাখ্যার আওতায় নিয়ে আসার কাজ নিঃসন্দেহে মহান। আর সে ভাবেই অন্ধকারের অবসান হয়ে জলে ওঠে নতুন জ্ঞানের আলোক-বর্তিকা। সে কাজ কেবল কল্পনা নির্ভর তো নয়ই, অনুমান কেন্দ্রীকও নয়। বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রমাণের দ্বারাই সে পথ হয় সমৃদ্ধ। দানিকেন সে পথে অগ্রসর হতে চান নি। অন্ততঃ বিভিন্ন উদাহরণ ও মন্তব্য উপস্থাপনার ধরন দেখলে তো তাই মনে হয়।

গোল জিনিষ দেখলেই তা, সূর্য, চন্দ্র আর তার পাশে তৃতীয় একটি

থাকলেই তা, পৃথিবী, কিংবা বস্তু হিসাবে বা ছবিতে ছোট ছোট গোলাকৃতি কিছু দেখলেই তাকে পরমাণুর মডেল অথবা দেবতাদের গোলাকৃতি মহাকাশ যানের নমুনা বলে মনে করাটা দুঃসাহসিক কল্পনা বৈকি! দানিকেন মন্তব্য করেছেন, 'সারা পৃথিবীর অসংখ্য জায়গায় ছড়িয়ে আছে বৃত্ত আর গোলকের ঝাঁক। মনে হয় যেন ইচ্ছে করে সুকৌশলে তাদের সাজিয়ে রাখা হয়েছে।'২(৬৭) ইচ্ছাকৃত তো বটেই। কারণ অনিচ্ছা ক'রে তো আর আঁকা হয় নি ছবিগুলি। কিন্তু গোলকের ধারণা সেই আদিম মানুষেরা কোথা থেকে করলেন? দানিকেন উত্তর দিয়েছেন, 'মোদ্দা কথা হ'ল ঐ সব গোলক আর বৃত্ত—তা সে সৃষ্টি কাহিনীতেই হোক, প্রাগৈতিহাসিক ছবিতেই হোক অথবা পরবর্তী কালে রিলিফে কিংবা চিত্রকলাতেই হোক সর্বত্রই তাদের ব্যবহার করা হয়েছে হয় 'দেবতা' না হয় 'দৈব' কিছু বোঝাবার উদ্দেশ্যে' ২(৬৮) তাঁর মতে গোলাকার মহাকাশযানে ক'রে গ্রহান্তরের প্রাণীর মর্ত্যে আগমনকে দেখেই প্রাগৈতিহাসিক শিল্পীরা গোলকের ধারণা করে এবং গোলককে তাদের সৃষ্টিতে এত প্রাধান্য দেয়। কিন্তু এ চিন্তা সম্পূর্ণই অবাস্তব—সমাজবিকাশ-এর ধারাকে প্রত্যক্ষ করতে না পারার ফল। গোলকের ধারণা আদিম মানুষের মাথায় আসার বাস্তব হাজার রকম উপকরণ থাকতে পারে। সে উপকরণ গুলিও দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সঙ্গে জড়িত থাকা খুব-ই স্বাভাবিক ছিল। কাজেই কোন গ্রহ থেকে গোলাকার উড্ডীন যন্ত্রে মহাকাশচারী না এলেও সে চিন্তা দেখা দেয়া একটা অসম্ভব কিছু ভাবার কোন অবকাশ নেই। মানুষের চোখের সামনে দেখা নানারকম ফল গোলাকার, মানবমস্তিষ্ক গোলাকার। ফলের বীজ, চোখের মণি, বৃষ্টির ফোঁটা, পদ্মের পাতা, মুখের হা প্রভৃতি কতরকম জিনিস থেকেই না এই গোলের ধারণার জন্ম হ'তে পারে। শ্রদ্ধার চিহ্ন বা দৈব চিহ্ন হিসাবে গোলাকার বস্তুর প্রাধান্য দেখা দিতে পারে সূর্য-চন্দ্র-রামধনু-দিকচক্রবাল প্রভৃতি নৈসর্গিক ব্যাপার থেকে। নারীর স্তন, যোনির গোল চিহ্নকে নানা মঙ্গল অমঙ্গল আর সৃষ্টির প্রতিভূ হিসাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকতে পারে। এই অত্যন্ত বাস্তব সম্ভাবনাকে একদম লোক চক্ষুর বাইরে রেখে তাকে দৈব সম্পর্কে গ্রহান্তরের জীবের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়ার অর্থ পাঠককে বিভ্রান্ত করা ছাড়া কিছু নয়।

শিরস্তানের শলাকাকে এরিয়েল মনে করা

এমনি আর একটি ব্যাপার হ'ল, মস্তিষ্কের আবরণে শলাকা জাতীয় কিছু

দেখলে তাকে 'এরিয়েল' ব'লে চিহ্নিত করার চেষ্টা। দ্বিতীয় রামেসিসের শিরস্ত্রাণকে তেমনি এরিয়েলের অনুকরণ ব'লেই দানিকেন উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শিরস্ত্রাণের বৈচিত্র্যে আদিবাসীদের মধ্যে যে কতরকম ধারা প্রবাহিত তার ঠিক নেই। অধুনাকাল পর্যন্ত প্রচলিত আদিবাসীদের শিরস্ত্রাণের কয়েকটি এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে। সলোমন দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসী সাগুর গাছের পাতার একরকম টুপি পরে। এগুলি কলসির মতো দেখতে। উপরের দিকটা বেশ সরু। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপবাসী ডাক ডাক জাতীয় লোকেরা যে টুপি পরে তা কনিক্যাল আকৃতি। পরপর তিনটি ত্রিভুজের মাথায় বসান হয়েছে এক আয়তাকার বস্তু। সব মিলিয়ে মাথার অন্তত চারগুণ লম্বা। অস্ট্রেলিয়ায় এমু পাখি শিকারের জন্য আদিবাসীরা মাথায় পরে প্রায় এক মানুষ সমান উঁচু শিঙার মতো শিরস্ত্রাণ। শেষ প্রান্ত একেবারে সরু কাঠির মতো। নিউগিনি, কঙ্গো, সিংহল, ভারতের আসাম প্রভৃতি স্থানে আদিবাসীদের শিরস্ত্রাণেও এমনি সব বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই সব কিছুকে সমাজ বিকাশের ধারার সাথে একসঙ্গে দেখলে তার মধ্যে থেকে একটিকে বিচ্ছিন্ন করে এরিয়েল হিসাবে বলা যুক্তিবাদী মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব কাজ।

দানিকেনের বিভ্রান্তির চরমতম পরিণাম ঘটেছে অলৌকিক আর দিব্যদর্শনের রাজ্যে পৌঁছানোর মধ্যে দিয়ে। অবৈজ্ঞানিক চিন্তা আর ভাববাদী দর্শন বহুবার বিজ্ঞান আর বস্তুবাদের কাঠামোকে অবলম্বন করার ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ঐশ্বরিক ব্যাপারে গিয়ে পরিণতি লাভ করেছে। দানিকেনের ভাববিলাসী বিজ্ঞান-চিন্তাও ঠিক একই পথে শেষপর্যন্ত দিব্যদর্শনের কল্পলোকে পৌঁছে গেছে। সারা পৃথিবীর হাজার দিব্যদর্শনের ঘটনা, ভয় হবার ঘটনাকে জড়ো করে দানিকেন পাঠককে হত-বুদ্ধিকর এক জায়গায় নিয়ে যেতে চেয়েছেন। আর এই সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর একটি পা রেখেছেন বিজ্ঞানের দিকে। দানিকেন বলেছেন, 'এই সব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে আমি আলোক দর্শনের ইতিহাস সংগ্রহ করেছি পুরো দশ বছর ধ'রে। যখন শুরু করেছিলাম তখন বুঝিনি কি অবিশ্বাস্য বইপত্র জমে উঠবে।'৫(১২) হ্যাঁ, মানব-সমাজের ইতিহাসের সাথে সাথে ধর্মীয় ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার, কুসংস্কার, আচার, বিশ্বাসকে কেন্দ্র ক'রে নানা ধরনের অলৌকিক কাহিনী গড়ে উঠেছে। তাকে একজায়গায় এনে জড়ো করলে মহাভারত রচনা করা যায় ঠিকই কিন্তু তা দিয়ে কী প্রমাণ করা

যেতে পারে? আর এই সব ঘটনা অতীতে যেমন হ'ত আজ তেমন হয় না। গ্রামে যতো ঘটতে দেখা যায়, শহরে ততো দেখা যায় না। অশিক্ষিতের মধ্যে যতো শোনা যায় শিক্ষিতের মধ্যে ততো শোনা যায়'না। মহিলা ও শিশুর মুখে যতো বর্ণনা পাওয়া যায়, পুরুষ ও বয়স্কের কাছে ততো ধরা প'ড়তে দেখা যায় না। এই সহজ সত্যের কারণটা অনুসন্ধান না ক'রে দানিকেন টেনে এনেছেন যথারীতি তাঁর দেবতাকে। 'বাইরের কারুর দ্বারা দিব্যদর্শনকে যদি বস্তুগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয় তা' হ'লে বাণী, প্রত্যাদেশ, অভিলাষ, বাস্তব নির্দেশ এবং সর্বোপরি মূর্তির অভিক্ষেপ আসে কোথা থেকে?'৫(২৫) বক্তব্য সুস্পষ্ট। গ্রহান্তরের উচ্চতর প্রাণী যারা সুদূর কোন গ্রহে বসে আছে তারাই মানব মস্তিষ্কে এই সব এলোমেলো এবং অর্থহীন সমস্ত কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে চলেছে। কোন রামকৃষ্ণের কাছে কালী হয়ে, কোন মহম্মদের কাছে দেবদূত হয়ে, কোন পোপের কাছে যীশু হয়ে তারা চিন্তা আর দৃশ্য জুগিয়ে যাচ্ছে। সেই সুউচ্চ প্রাণীকুলের কোন অভিপ্রায় মেটাতে যদি এইসব কাণ্ডকারখানা তা হ'লে সব ঘটনাই কেবল ধর্মীয় সম্পর্কে দেখা যায় কেন? কেনই বা সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান প্রতিভাসম্পন্ন মানুষের মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত ঘটনাবলীর সমাবেশ ঘটিয়ে তাদের পরিকল্পনা রচিত হচ্ছে না? কোথাকার জলপড়া বা জ্যোতির্ময়ী প্রস্তর মূর্তির মধ্যে এই সব প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকছে কেন? নিরাকার ঈশ্বর এবং দেবদেবীর মূর্তি শূন্য ইসলাম ধর্মে এই জাতীয় ঘটনাবলীর ভিড়ই বা কম কেন? এই সব প্রশ্নের বাস্তব-সম্মত উত্তর না খুঁজে একনাগাড়ে বিচিত্র অলৌকিক ঘটনাবলীর লিস্টি ক'রে দানিকেন কেবল বিভ্রান্তিই বাড়িয়েছেন।

দানিকেনের বড় ক্ষোভ, 'অলৌকিক সম্পর্কে অনেকে উৎসাহী হন, বোঝবারও চেষ্টা করেন, কিন্তু শুধু দুটো বুকনি দেবার জন্য। গবেষণার প্রয়োজনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, দিব্যদর্শন সংক্রান্ত নবতর ঘটনা এবং সমস্যার উপস্থাপনা দৃঢ়তর মনের কাজ, আমার নয়।'৫(৬৯) তা, হ'লে ব'লতেই হয়, যা তাঁর কাজ নয় তাই তিনি করবার চেষ্টা করেছেন, ফলে প্রকৃতপক্ষে তা' কিছু 'বুকনি' দেবার মতোই ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিহাসের বহু জিজ্ঞাসার বিজ্ঞান ও বাস্তব সম্মত ব্যাখ্যার কঠিন ও রূঢ় কাজকে এড়িয়ে গিয়ে তাই তিনি বিভ্রান্তিকর অজস্র বিষয়ের পাহাড় গড়েছেন যে দিকে সহসা তাকালে চোখে ঝিলিমিলি লাগে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরই বোঝা যায় এ সমস্ত আর কিছুই নয় দানিকেনের বিভ্রান্তি মাত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উদাহরণে আতিশয্য

দানিকেনের সমগ্র তত্ত্বটি উদাহরণ নির্ভর। অসংখ্য উদাহরণ নানা জায়গা থেকে এনে জড়ো করা হয়েছে গ্রহান্তরের কোন প্রাণীর আগমনের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে। মানুষের সামাজিক বিকাশের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে খাপছাড়া ভাবে হঠাৎ হঠাৎ এমন সব উদাহরণ উপস্থিত করা হয়েছে বিভ্রান্তিকর মন্তব্য সহ, যে সেগুলির স্বাভাবিকত্ব পাঠকের মাথায় চট ক'রে আসতে পারে না। কোন ঘটনাকে পারিপার্শ্বিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিলে তাকে সঠিক মূল্যে অনুধাবন করা যায় না। সমগ্রের সঙ্গেই অংশ অর্থবহ হয়ে ওঠে। দানিকেন অবশ্য দাবি করেছেন এমনি এলোমেলো চিন্তার অধিকার ও যৌক্তিকতাকে, 'তাই বলি আমাদের চিন্তা করতে দিতে হবে আর দূর কল্পনাকে চিন্তারই একটা বড় অংশ, একটা ফলপ্রসূ অংশ বলে মেনে নিতে হবে।'৪(৯১)

যে কোন বিচ্ছিন্ন উপস্থাপনা কোন কিছুকে ভিন্ন ভিন্ন রকম ব্যাখ্যার সুযোগ ক'রে দেয়। দানিকেনের উদাহরণগুলি বিচ্ছিন্ন আর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বেপরোয়া রকমের স্বেচ্ছাচারী।

একটি উদাহরণে উল্লেখ করা হয়েছে, 'এঙ্কিডু মারা গেল অজানা অদ্ভুত এক রোগে। এমনই অদ্ভুত সে রোগ যে গিলগামাসের মনে প্রশ্ন জাগে, এঙ্কিডুর কি কোন স্বর্গীয় পশুর বিষাক্ত নিশ্বাস লেগেছিল? এমন ধারণা গিলগামাসের হ'ল কি ক'রে? কোথা থেকে কেমন ক'রেই বা এল সে ধারণা যে স্বর্গীয় পশুর বিষাক্ত নিশ্বাসে যে মারাত্মক রোগ হ'তে পারে তা সারানো ধন্বন্তরিরও অসাধ্য।' ১(৫৬) আজ থেকে পাঁচ হাজারের বেশি বছর আগে রচিত গ্রন্থের এই কথায় আশ্চর্য হবার যথেষ্ট কারণ দেখেছেন দানিকেন। কি ক'রে এমন ধারণা এল? তিনি আশ্চর্য হয়েছেন। কিন্তু সে আমলে বিষাক্ত পোকা-মাকড়ের কামড়ে মারাত্মক ঘা ইত্যাদি হওয়া খুবই স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। এখনও পর্যন্ত পাহাড়াঞ্চলে এমন গাছ-গাছড়া দেখা যায় যার ফুল পর্যন্ত স্পর্শ করলে, তার কষে চোখ অন্ধ হয়ে যায়। তখন কোন পশু, বৃক্ষ বা কীট-পতঙ্গকে স্বর্গীয় বলে ভাবা কি সে সময় আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছিল? দেবতাদের বাহনরূপে আমাদের দেশে সিংহ-প্যাঁচা-ইঁদুর-সাপ-

বৃশ্চিক প্রভৃতি তো এখনও স্বর্গীয় বলে প্রচলিত। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সেই সময়ে মানুষের মধ্যে পুরোহিতেরা এর সঙ্গে দেবতার অভিশাপের ব্যাপারটা যোগ ক'রে থাকলে এমন মন্তব্যে আশ্চর্য হবার কিছু থাকে না। তার উপর রয়েছে সাপ। যাকে কেন্দ্র করে অজস্র সংস্কার দানা বেঁধে রয়েছে।

জীমূতবাহনের গল্পে সাপ তো সূর্যকে জড়িয়ে ধ'রে পৃথিবীতে অন্ধকার নামিয়ে এনেছে। সাপের পূজা বহু জাতির আদিম মানুষদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। এর কারণ খুঁজতে দানিকেন অবশ্য যথারীতি গ্রহান্তরে গমন করেছেন। 'ড্রাগন এবং সাপ, সাপই বেশী, সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে মহাকাশের কোন ব্যাপারের প্রতীক হিসাবে।'৩(২৪) তিনি সামাজিক ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হন নি। আক্রমণ বা ক্ষিপ্রতার প্রতিমূর্তি, উর্বরতার প্রতীক, খোলস ছেড়ে নব কলেবর ধারণ করতে দেখে তাকে অমরত্বের প্রতীক প্রভৃতি ভাবার থেকে মহাকাশের কোন ব্যাপারের প্রতীক ভাবাটাই তাঁর কাছে বেশী যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়েছে। বনবাসী মানুষ, এমন কি বন ছেড়ে লোকালয়ে বসবাসকারী মানুষ সাপকে ভয় ক'রত ব'লেই তাকে পূজার আসনে বসিয়েছে, এমন জানারও কোন যুক্তি নেই তাঁর কাছে। কারণ, 'বাঘ ভাল্লুক সিংহেরা তো আরো বেশী বিপজ্জনক। সাপ তো শুধু খাবার জন্যই জন্তু ধরে। যথেচ্ছ এবং যত্রতত্র মেরে বেড়ায় না।'৩(২৪) বাস্তবকে এমন উল্টোভাবে দেখার এই ধরনের নজির খুবই বিরল। সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতাতেই এ কথা বোঝা যায় যে, বাঘ-সিংহ-ভালুকের বাসস্থান আর মানুষের বাসস্থানের কিছুটা অন্ততঃ দূরত্ব সব সময়েই ছিল। আর ঠিক বিপরীত কথা হ'ল, বাঘ-সিংহ কখনই কেবল হত্যার জন্য মানুষকে আক্রমণ করে না। যত্র তত্র মেরে বেড়ায় না। বিখ্যাত শিকারী জিম করবেট বলেছেন, 'আসলে মানুষ বাঘের স্বাভাবিক শিকার মোটেই নয়। নেহাত বার্ধক্য কিংবা আঘাতের ফলে অক্ষম হয়ে পড়লে প্রাণধারণের জন্য তাকে বাধ্য হয়ে মানুষের মাংস খেতে হয়।...জীব-জন্তুর মাংস থেকে মানুষের মাংস, বাঘের এই যে মুখ বদল তা প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাকেচক্রে ঘটে।' সাপও মানুষকে খাদ্য হিসাবে তাক করে না ঠিকই, কিন্তু মানুষের বাসস্থানের সঙ্গে সাপের যোগাযোগটা ঘনিষ্ঠ ব'লে প্রায়শঃই মানুষকে সাপের মুখে পড়তেই হয়। এখনও ভারতে প্রতি বছর সাপের কামড়ে মারা যায় দশ হাজার মানুষ। সুতরাং সাপের পক্ষে আদিম মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবে দানিকেনের বড়ই অনীহা।

'সেই ঘৃণ্য জীব দেব সম্মান পায় কি করে?'১(১০৮) তাঁর আশ্চর্য লাগে, "কিন্তু কোন্ গুণে সাপ সৃষ্টিসংক্রান্ত সমস্ত পুরাণ কাহিনীতে ঠাঁই ক'রে নিয়েছে।' ৪(২৩) জলে-স্থলে-জঙ্গলে-লোকালয়ে মাটির ওপরে গর্তে এমন কি বাসস্থানের গৃহচত্বর পর্যন্ত সাপ ছাড়া অন্য কোন হিংস্র প্রাণীর এমন বেপরোয়া ভূমিকা নেই। এবং অন্য কোন প্রাণীর কামড় থেকে মারা না গেলে আহত হবার ঘটনা পাওয়া যায়, কিন্তু সাপের কামড়ে মৃত্যু ছাড়া কোন পরিণাম সেদিনের মানুষের না দেখাই স্বাভাবিক। কাজেই সাপের এই গুণটি যদি দানিকেন না দেখতে পান তবে সব ব্যাপারেই তাঁকে উর্ধ্বেই তাকিয়ে থাকতে হবে।

কল্পনা এবং বাস্তব, এই দুইএর প্রকৃতিগত পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত না থাকলে গল্পকে সত্য ব'লে প্রচার, আবার বাস্তবকে কেবল গল্প ব'লে প্রতিষ্ঠা করা খুবই সহজ হয়ে দাঁড়ায়। জুলে ভার্নে গল্পচ্ছলে চাঁদে যাবার কথা বলেছিলেন। আর তখনকার বৈজ্ঞানিক মানে তিনি কল্পনা করেছিলেন, কামানের পাল্লাকে আরো বাড়িয়ে গোলার ভিতর মানুষকে ছুঁড়ে দেওয়া হবে ব'লে। জোনাথান সুইফ্‌ট তাঁর গালিভারস্ ট্রাভলস্ গ্রন্থে লাপুটা ভ্রমণে উল্লেখ করেছেন মঙ্গলের দু'টি উপগ্রহের কথা। পরবর্তীকালে দু'টি কল্পনাই বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বাস্তব ব'লে চিহ্নিত হয়েছে। দানিকেন প্রশ্ন করেছেন, 'যারা আবিষ্কৃত হ'ল সুইফটের দেড়শত বছর পরে তাদের বর্ণনা তিনি দিলেন কেমন ক'রে। নিঃসন্দেহে তার আগে কোন জ্যোতির্বিদ মঙ্গলের উপগ্রহদ্বয়ের কথা অনুমান করেছিলেন।...সুইফ্‌ট যে কোথায় পেলেন এ তথ্য তা আমাদের অজ্ঞাত।'১(১৩১) মিলে যাওয়া ব্যাপারটাতে দানিকেনের খুব আশ্চর্য লেগেছে।

কবি সুকুমার রায়ের কবিতায় আছে, 'হাস ছিল সজারু (ব্যাকরণ মানি না) / হ'য়ে গেল 'হাসজারু' কেমনে তা জানি না। বক কহে কচ্ছপে বাহবা কি ফূর্তি/অতি খাসা আমাদের বকচ্ছপ মূর্তি।' শল্যচিকিৎসার কল্যাণে কোনদিন যদি হাসজারু বা বকচ্ছপকে বাস্তবে সম্ভব ক'রে তোলা যায় তবে কি কবিকে কেউ বাস্তব চিন্তার কাব্যিক রূপকার বলবেন?

দানিকেনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে নিছক কল্পনা করবার কোন জায়গা রাখা যাবে না। পরী, মৎস্যকন্যা, রাক্ষস ইত্যাদি যে কোন ধারণাই, বাস্তবের শিকড়ের উপরে দাঁড়িয়েও, যে নিছক কল্পনারই ব্যাপ্তি তা মনে ক'রবার কোন স্থান নেই দানিকেনের কাছে। কল্পনার আতিশয্যে তিনি একথাও বলেছেন,

'আরব্য উপন্যাসের কাহিনীকার কল্পনার অমন অফুরন্ত খনি কোথায় পেলেন? মাজিকের খুশি মোতাবেক জাদুকর কথা বলতো প্রদীপের ভিতর থেকে, একথা এলো কেমন ক'রে? কোন্ দুঃসাহসিক কল্পনা আলিবাবা গল্পে 'চিচিংফাঁক' আবিষ্কার করল?'১(৭৩) কল্পনার মধ্যে বাস্তবকে খুঁজে পেতে গিয়ে দানিকেনই কল্পনার রাজ্যে পৌঁছে গেছেন। প্রাচীন জিনিসে যেমন রক্ষণশীল মানুষের এক প্রকার আসক্তি আছে, প্রাচীন কাহিনী হ'লেও তেমনি দানিকেন তাকে গ্রহণ ক'রে দেবতার সঙ্গে জুড়ে দেবার লোভ সামলাতে পারেন না। একটু প্রাচীন সাহিত্য হ'লে বুঝি তিনি কঙ্কাবতীকেও রেহাই দিতেন না। 'কঙ্কাবতী ও সিপাহী আকাশ বুড়ির নিকট গিয়া একখানা গামছা চাহিলেন। অনেক বকিয়া ঝকিয়া আকাশ বুড়ি একখানি গামছা দিলেন। তখন কঙ্কাবতী আকাশের মাঠে নক্ষত্র তুলিলেন। বাছিয়া বাছিয়া ফুটন্ত, ফুটন্ত আধকুঁড়ি, আধফুটন্ত নানা ধরনের নক্ষত্র তুলিলেন। সেইগুলি গামছায় বাঁধিয়া মোটটি সিপাহীর মাথায় দিলেন।' অবশ্য এমন কল্পনারও রেহাই নেই। দানিকেনের মতে বহির্জাগতিক উন্নত প্রাণী নিজগ্রহে বসেই মানব মস্তিষ্ককে পরিচালনা ক'রে চলেছে দিব্যদর্শনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সিঞ্চনে। 'ইতিহাসের মহামানবদের জীবনী পর্যালোচনা ক'রে দেখেছি, কোন না কোন সময়ে তাঁদের জীবনে দিব্যদর্শন ঘটেছে। সেই বিশেষ ক্ষণের প্রেরণা, সেই হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে জীবনের মোড় গেছে তাঁদের ঘুরে।' ৫(৩১০) এই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের সমস্ত কল্পনাকেই গ্রহান্তরের জীবের সঙ্গে যুক্ত করতে কোন অসুবিধা থাকে না। আর তাই করাও হয়েছে একের পর এক দানিকেনের ছয়টি গ্রন্থে।

কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা যাক এ প্রসঙ্গে। স্থূল বুদ্ধিতেই যার সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব, দানিকেন তাকেই কেমন জটিলতর ক'রে তুলেছেন তা বোঝা যাবে এই সব বক্তব্য থেকে। এখানে তেমন দশটি বিষয় তুলে ধরা হ'ল।

(১) **পাথরের নরকঙ্কাল :** 'সামনে একটি মানুষের কঙ্কাল পড়ে রয়েছে পাথর কেটে তৈরী! গুনে গুনে দেখলুম দশজোড়া পাঁজর রয়েছে দৈহিক গঠন অনুযায়ী নিখুঁতভাবে সাজানো। প্রাগৈতিহাসিক ভাস্করদের প্রয়োজনে কি শব-ব্যবচ্ছেদী পণ্ডিতেরা দেহ কাটা-ছেঁড়া করতেন? আমরা তো জানি ১৮৯৫ সালের আগে ভিলহেল্‌ম্ কনরাড র‍্যাণ্টজেন সেই নতুন রশ্মি, যার নাম এক্সরে, আবিষ্কারই করেন নি।' ৩(১০) সহজ সত্যকে জটিল ক'রে তোলার এমন উদাহরণ কদাচিৎ মেলে। দানিকেনের উপস্থাপনা থেকে একথা বুঝতে

অসুবিধা হয় না যে তিনি বলতে চেয়েছেন, এক্স রে ছাড়া সেই সময়ে কি ক'রে পাঁজরের সম্পর্কে ভাস্করদের জ্ঞান জন্মাল। কিন্তু এক্স রে ছাড়া চর্মচক্ষু দিয়েও যে তা দেখা সম্ভব, এ কথা তাঁর মনেই পড়ল না। মৃত জন্তুর পচে যাওয়া কঙ্কাল, কবরস্থ মানুষের বেরিয়ে পড়া কঙ্কাল, এমন কি রুগ্ন মানুষের বুকের হাড় দেখেও এই ধারণা করা অসম্ভব নয়। ভারতের বুভুক্ষু মানুষের বুকটা তো জীবন্ত কঙ্কালেরই প্রতিভূ। কাজেই ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অপেক্ষা না ক'রেও সেদিনের পাথরের খোদাই খুবই সম্ভব ছিল। গ্রহান্তরের জীবকে দানিকেনের প্রয়োজন হ'লেও প্রাগৈতিহাসিক ভাস্করের সেদিন প্রয়োজন হয় নি।

(২) **খালের মতো সমুদ্র:** 'বেবিলনীয় মহাকাব্যে দেখি 'এতানা' ওড়বার আকাঙ্ক্ষায় জর্জরিত। হয়তো সে ওড়বার স্বপ্নও দেখেছিল, হয়তো সে কথা নিয়ে সে আলোচনাও করেছিল, কিন্তু তার স্বপ্নে কিংবা তার কল্পনায় মহাকাব্যে বর্ণিত দূর আকাশ থেকে দেখা পৃথিবী পৃষ্ঠের অমন চমৎকার বাস্তবরূপ তো ফুটে ওঠবার কথা নয়—পৃথ্বী উপবন সম! সাগর অনুপ্রবিষ্ট মাটির বুকে। কাটা খালের মতো।' ৩(১০৬) আপাতদৃষ্টিতে এমন কল্পনা অস্বাভাবিক বলে মনে হওয়ার সঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু তা যে অসম্ভব, মহাকাশ ভ্রমণ না করলে ভাবাই যায় না, এমন কথা বুঝি জোর ক'রে বলা যায় না। সামান্য টিলা পাহাড় থেকে স্থলভূমি দেখার অভিজ্ঞতাকে সম্প্রসারিত করলে অনেক কল্পনাই তা থেকে আসতে পারে। সাঁচি স্তূপের সামান্য উচ্চতা থেকে সমতল ভূমিকে যেমন দেখায়, কিংবা মুসৌরী থেকে দেরাদুনকে যে ভাবে দেখা যায় তার অভিজ্ঞতায় কল্পনা চড়ালে এমন ভাবা অসম্ভব নয়! চীনাপিক্ থেকে দেখা নৈনিতালের লেককে ছোট্ট পুষ্করণী বলেই মনে হয়। সেদিনের মানুষের কাছে এই সব অভিজ্ঞতা না থাকার কোন কারণ নেই। কাজেই সমুদ্র বিশাল জলরাশী—তাকেও খালের মতো ভাবাতে কবির কল্পনা শক্তির প্রশংসা নিশ্চয়ই করা যায়। কিন্তু তাকে খুব একটা অস্বাভাবিক বলা যায় কি? আর পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ যেখানে জল সেখানে বহু উঁচু থেকে সমুদ্রকে কাটা খালের মতো দেখা যাবার কথা নয়। মহাকাশযানের তোলা ছবিও কাটাখালের মতো ওঠে নি।

(৩) **সূর্যের ওজন বৃদ্ধি:** 'আকাশ গর্জে উঠল, মাটি উঠল কেঁপে, তারপর সূর্যদেব এসে চেপে ধরলেন এঙ্কিডুকে তাঁর বিশাল বক্ষ দিয়ে, তীক্ষ্ণ নখর দিয়ে। ভারী আশ্চর্য ঠেকে যখন পড়ি, এঙ্কিডুর দেহের ওপর 'সূর্যদেব'

নেবে এলেন ভারী সীসার মতো, বিশাল একখানা পাথরে চাপা পড়ল যেন সে।' ১(৫৫) কোন পাঠকের এতে আশ্চর্য ঠেকবার কারণ নেই। পাথর, সীসা ভারী জিনিসের উদাহরণ হিসাবে ব্যবহারের মধ্যে আশ্চর্য হবার কী আছে! সূর্যদেব, যাকে বিরাট, যাকে শক্তিশালী বলে কল্পনা করা যায় সে যদি কারো ওপর চেপে বসে চেপে ধরে, তবে তা ভারী হওয়াই তো স্বাভাবিক। কিন্তু দানিকেন যথারীতি বিস্মিত হয়েছেন, 'সব বাতিল করলেও একটা কথা বাদ দিতে বাধে যে সেই প্রাচীন কাহিনীকার জানলেন কেমন ক'রে যে একটা বিশেষ গতিতে যে কোন বস্তু সীসার মতো ভারী হয়ে ওঠে।' ১(৫৫) সূর্যদেব-এস্কিডুর কাহিনীকার গতির সঙ্গে জড়বস্তুর ওজনের বৃদ্ধির কথা জানতেন বলে এখানে ব'লবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু প্রথম কথা, সাধারণ কাহিনীতে কারো আসা যাওয়া, ছুটে চলা প্রভৃতি গতির চিন্তা যখন করা হয় তখন নিশ্চয়ই আলোর গতির কাছাকাছি কোন গতির কথা ভাবা হয় না। বস্তুর ভরের বৃদ্ধি হওয়া কেবলমাত্র আলোর গতির কাছাকাছি এলেই সম্ভব। পৃথিবীতে যে বস্তুর ওজন ১০০ কিলোগ্রাম, সেকেণ্ডে ১১ কিলোমিটার বেগে চললে তার ভর বৃদ্ধি পায় ·৩৫ মিলিগ্রাম। এই গতি প্রতি সেকেণ্ডে ২·৫ লক্ষ কিলোমিটার হ'লে ভর বাড়বে দ্বিগুণের চেয়ে বেশী। আসলে আইনস্টাইনীয় পরিবর্তনগুলি এর চেয়ে বেশী গতির ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য। সাধারণ কাহিনীতে, যেখানে বিজ্ঞানের আলোচনা নেই, এমন গতির চিন্তা লেখকের মাথায় ছিল কিনা বলা দুষ্কর। দ্বিতীয় কথা, বর্ণনাতে যখন চেপে ধরার কথা বলা হয়েছে তখন নেবে আসার সঙ্গে মিলিয়ে তার উল্লেখ রয়েছে। চেপে ধরা বা চাপা পড়া ব্যাপারটি চলন্ত অবস্থায় ঘটেছে এমন কথা বলা হয় নি। নেমে আসা ও চাপা পড়া কার্যটি গতির শেষেই ঘটে। সুতরাং ভরবেগের পরিবর্তনের কথা কাহিনীকার জানলেও, প্রচণ্ড গতি যখন নেবে আসে অর্থাৎ থেমে যায়, তখন যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভর আবার কমে যায়, সেটাও তাঁর জানার কথা। 'বিশেষ গতিতে' ভর বৃদ্ধির প্রসঙ্গ এই বর্ণনায় আসার কোন কারণই নেই।

(৪) **বালির কাচে পরিণত হওয়া:** 'তা ছাড়া এমনিতরো কাচে পরিণত বালি দেখেছি গোবী মরুভূমিতে আর ইরাকের প্রাচীন এলাকায়। নেভেদা মরুভূমিতে আণবিক বিস্ফোরণের ফলে বালি যেমন কাচ হয়ে গিয়েছিল, গোবীতে আর ইরাকেও ঠিক তেমনি আছে। কিন্তু কে ব'লে দেবে দুটোই একই রকম কেন হ'ল ?' ১(৩৩) মহাজাগতিক প্রাণীকে

ঈশ্বর কল্পনার মতো সব কাজের পেছনে দেখলে কোন 'কেন'রই উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। বালির উপাদান আর কাচের উপাদানে মিল আছে। একটি নির্দিষ্ট তাপে বালি কাচে পরিণত হয়। আণবিক বিস্ফোরণই এই তাপের উৎস ব'লে ব'লবার চেষ্টা হয়েছে। এখানে মনে রাখা দরকার যে প্রাকৃতিক নানা রকম কারণেই প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি হ'তে পারে। বালি গলে যায় ১৭০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। পাথর অবশ্য তার গঠনের উপর নির্ভর ক'রে বিভিন্ন তাপে গলে থাকে। তবে প্রায় সব ক্ষেত্রেই ২০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পাথরও গলে যায়। উল্কাপাত ঘটার সময় প্রচণ্ড উত্তাপে বালি বা পাথরের গলে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। মাটিতে পৌঁছাবার সময় উল্কার তাপমাত্রা ১২০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ৩৫০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত দেখা যায়। সুতরাং সেই তাপে বালি গলে যাবার সহজ উত্তর না খুঁজে দানিকেন আণবিক বিস্ফোরণের সঙ্গে তার যোগাযোগ দেখেছেন। উল্কাপাত যে আণবিক বিস্ফোরণের মতোই অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে, তার অনেক উদাহরণ আছে। উত্তর আমেরিকার এরিজোনায় উল্কাপাতের ফলে যে গর্ত সৃষ্টি হয়েছে তার ব্যাস এক মাইল, গভীরতা ৫০০ ফুট। সাইবেরিয়ায় তুঙ্গুসে যে উল্কাপাত ঘটে তা ৪০০ বর্গমাইল স্থানকে পুড়িয়ে দেয়। তায়গা বনভূমিতে উল্কাপাত ঘ'টে আড়াই বর্গকিলোমিটার জায়গা ধ্বংস ক'রে দেয়। অসংখ্য টুকরো হয়ে উল্কাটি ছড়িয়ে পড়ে। সবচেয়ে বড় টুকরোটির ওজন হ'ল ৪৩ মন। অনুমান করা হয়, এর সম্পূর্ণ ওজন ছিল ২,৫০০ মন। এর ফলে বালির কাচে পরিণত হওয়া আর এমনকি অস্বাভাবিক ব্যাপার।

(৫) **ডাইনোসরাসের ছবি :** 'বহুকাল আগে লুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক সেই জীবটি, ছবিতে দেখানো মতো, পেছনের পায়ে ভর দিয়েই মাটির ওপর চ'রে বেড়াত। ডাইনোসরাসের দৈর্ঘ্য ছিল পঁয়ষট্টি ফুটের মতো। এ ছবিতে তার গুটিয়ে সুটিয়ে বসা চেহারাটা আর তার পায়ের তিনটে করে আঙুল দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে, ছবিটা ডাইনোসরাসের।...আমি চিন্তা করতে পারি না। শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করি কেমনতরো চিন্তাশীল জীব সে যে ডাইনোসরাসের মতন সরীসৃপকে পৃথিবীর বুকে চ'রে বেড়াতে দেখেছে?' ৩(১০
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরা ঐ সরীসৃপকে পৃথিবীর বুকে চ'রে বেড়াতে না দেখলে হাজার উন্নত ভিন্নগ্রহের জীবেরাও তা দেখতে পারে না। উন্নত নভশ্চরের দেশে প্রাণীজগতের বিবর্তনের ধারাতে ডাইনোসরাসের জন্ম যে হবেই এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কাজেই

তাদের নিয়ে আসা ছবির অনুকরণেও ঐ ছবি আঁকা হতে পারে না। যারা বেড়াতে এসেছিল তারা হঠাৎ অন্য গবেষণা রেখে পৃথিবীর প্রাণী বিবর্তনের উপর গবেষণা শুরু ক'রে ডাইনসরাসের ছবি এঁকে ফেলল এমনটা ভাবা দুষ্কর। কাজেই ছবিটা আঁকার পিছনে বাস্তব কারণ অন্য কিছু যা 'চিন্তা করা যায়'। এক, অন্য কোন জন্তুর অনুকরণ করতে গিয়ে অমন ছবি আঁকা হতে পারে। দুই, শীলান্তরে কোন জীবাশ্মে এমন ছবি উঠে থাকতে পারে যার অনুকৃতি আঁকা হয়েছে ঐ ছবিতে। চীনে এমন এক ডাইনোসরাসের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। তার ওজন ছিল ৩০ টন। লম্বায় ২০ মিটার এবং উচ্চতায় ছিল ১৪ মিটার। তিন, ঐ ধরনের কোন প্রাণীর সাক্ষাৎ তারা চাক্ষুষ পেয়েছে, এটা অসম্ভব নয়। মাছ থেকে প্রথম চতুষ্পদ জন্তুর আবির্ভাবের সময়ের মাছ হ'ল কয়লাকান্ত। সেই মাছও বিংশ শতাব্দীতে পাওয়া গিয়েছে। কোটি কোটি বছর অতিক্রম ক'রে বিশেষ অবস্থানুকূল্যে কেউ কেউ বংশরক্ষা ক'রে গিয়েছে। কাজেই সেই প্রাগৈতিহাসিক কালের ডাইনোসরাসের দুই একটি শাখা টিকে গিয়ে থাকতেও পারে। ব্যাপারটি যতোই আশ্চর্য শোনাক স্থলচর-জলচরের যোগসূত্র কয়লাকান্ত ১৯৩৮ সালে প্রথম ধরা পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায়। মাদাগাস্কারে তারপর পাওয়া যায় ১৯৫৬ সনে। ডাইনোস-রাসেরও একটি শাখা দেখতে পাওয়া যায় কোমডো দ্বীপে। সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইরিয়ানের এক দল জেলে ঝড়ে আটকা পড়ে যায় কোমডো দ্বীপে। সেখানেই তারা সাক্ষাৎ পায় দানবাকৃতি ডাইনোসরাসের। সে প্রায় গল্পের মতো। পরবর্তী সময়ে তা আর বিশ্বাসযোগ্য ব'লে বিবেচিত হয় নি। ১৯১২ সনে কোমডোতে একটি যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ে। রক্ষা পেয়ে যাওয়া বৈমানিক সেখানে ডাইনোসরাসের সাক্ষাৎ পায়। উত্তেজনা ও ভয়ে সে পাগল হয়ে যায়। তাকে জেরা ক'রে যা জানা গেল তাতে উৎসাহিত হয়ে ১৯২৭ সনে একদল মার্কিন অভিযাত্রী কোমডোতে অভিযান চালায়। তারাই প্রথম ছবি তোলে ডাইনোসরাসের। তারপর ১৯৫৬ এবং ১৯৬১তে ফরাসী ও রুশ অভিযাত্রীরা ডাইনোসরাসের সম্পর্কে কোমডো থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে। সেই সব কিছু থেকে জানা যায় যে অস্ট্রেলিয়াতে ডাইনোসরাসের যে ফসিল পাওয়া যায় তারই কোন প্রজাতি ইন্দোনেশিয়ার কোমডোতে এসে থাকবে। এদের ইন্দোনেশিয়ার আদিবাসীরা বলে, ভারান। এরা লম্বায় হয় চার মিটার। গিরগিটির জাতভাই। টিকে থাকা সরীসৃপের সর্ববৃহৎ বংশধর। এদের বিরাট লম্বা লেজ আর তাতে প্রচণ্ড শক্তি। খুব ভাল সাঁতার জানে। অনুমান করা

হয় অস্ট্রেলিয়া থেকে সাঁতার দিয়েই এরা ভারতমহাসাগরের কোমডো দ্বীপে আস্তানা গেড়েছিল। এ তথ্য আলোচনা করার একটাই হেতু, তা হ'ল প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের আঁকা ডাইনোসরাসের ধারণা পাবার মতো সরীসৃপ তারা চাক্ষুষও দেখে থাকতে পারে। সম্ভাবনার দিক থেকে সেটাই অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য। নভশ্চরদের হাত এর পেছনে দেখাটাই হ'ল কষ্ট কল্পনা।

(৬) **আকাশের শৈত্য:** 'সব পলিনেশীয় জেলেরা তাদের পুরাণ-কাহিনীতে বলেছে, ওপরের ওই অনন্ত বিস্তার আকাশে আছে শৈত্য, আছে শূন্যতা। এর চেয়ে বড় আশ্চর্যের কথা আর কী হ'তে পারে? তারা মাটির কথা, সমুদ্রের কথা অনেক জানত মানি, কিন্তু ওপরের ঐ অনন্তবিস্তার আকাশের কথা জানল কেমন ক'রে?' ৩(১০৩) আকাশের কথা বলতে এখানে শৈত্যের কথা বলা হয়েছে। পলিনেশীয় পুরাণে বলা হয়েছে, 'ঊর্ধ্বের ওই অনন্ত বিস্তার/আকাশের মত/তীব্র শৈত্য নেই হেথায়/শূন্যও নয় মহাশূন্য সম।' এখানে বলা হচ্ছে আকাশ মহাশূন্য ও ঠাণ্ডা। দানিকেনের জিজ্ঞাসা, আকাশকে মহাশূন্য বলেই বা তারা কেমন ক'রে জানল আর ঠাণ্ডাই বা ভাবল কী ক'রে? তিনি অবশ্য বলতে চেয়েছেন যে বহির্জাগতিক প্রাণীর রেখে যাওয়া উন্নত জ্ঞানের ফলেই এই ভাবনা তারা করতে পেরেছে। কিন্তু কোনভাবেই কি এই ভাবনা করা সেদিন সম্ভব ছিল না?

একটি বালককে যদি প্রশ্ন করা যায় আকাশে কী আছে? সম্ভবত সমস্ত ছেলেই নির্দ্বিধায় উত্তর দেবে, কিছু নেই, শূন্য। আকাশ যে মহাশূন্য, একথা জানার জন্য তাদের বহির্জাগতিক জ্ঞানের প্রয়োজন হবে না। সাধারণ জ্ঞানেই আকাশকে মহাশূন্য বলে ভাবা সম্ভব। নিখুঁত বৈজ্ঞানিক চিন্তায় আকাশকে মহাশূন্য ভাবা সম্ভব নয়। মহাকাশ হ'ল আকাশধূলি, ফোটন কণা আর বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গের এক বিশাল সমুদ্র। শূন্য বলে কোন স্থান নেই। সুতরাং আকাশকে মহাশূন্য ব'লে জানার মধ্যে বিস্ময়ের কী থাকতে পারে?

মহাকাশের শৈত্য কল্পনাও স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা থেকে মনে হওয়া খুবই সম্ভব। আকাশ থেকে নানা ঘটনা ঘটতে দেখেছে সেদিনের মানুষ। বজ্রপাত, উল্কাপাত, বরফবৃষ্টি, তুষারপাত, শিশিরপড়া, বৃষ্টি, ঝড়ো হাওয়া ইত্যাদি নানা ঘটনা বছরের পর বছর বারবার ঘটতে দেখেছে সেদিনের অজ্ঞ মানুষ। বজ্রপাত ও উল্কাপাত ছাড়া আকাশকে কেন্দ্র করে শৈত্যের কল্পনা আসাই

স্বাভাবিক! রাতের ঠাণ্ডাকে উষ্ণ করেছে দিনের সূর্য। আর দিনের সূর্যকে ঢেকে দিয়েছে জলভরা মেঘের আস্তরণ। নেমে এসেছে বৃষ্টির শীতল স্পর্শ। তুষার যুগের অভিজ্ঞতা মানুষের কাছে শৈত্যের আকাশকেই করেছে পরিচিত। বাতাস তো বছরের বেশী সময়েই শীতল আকাশকেই মানুষের স্পর্শের জন্য নিয়ে এসেছে। পর্বত যেখানে আকাশ ছুঁয়েছে, সেখানে মহাকাশের শৈত্য জলকে করেছে বরফ। পাহাড়ের গা বেয়ে মানুষ যতো উপরে উঠেছে ততো আকাশকে সে দেখেছে ঠাণ্ডা বলে। সুতরাং উর্ধ্বাকাশকে হিমশীতল রূপে কল্পনা করাই সেদিন ছিল মানুষের কাছে স্বাভাবিক। আকাশের কথা তারা জেনেছে, ঠিক যেমন জেনেছে মাটির কথা, সমুদ্রের কথা। আর এর কোনটি জানতেই তারা গ্রহান্তরের দেবতার দিকে চেয়ে থাকে নি।

(৭) **লুর্দ্দে লোক সমাগম:** 'ফরাসী পিরেনীজে অবস্থিত লুর্দ্দ, পৃথিবীর এক প্রখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। ফি বছর কম পক্ষে পঞ্চাশ লাখ লোক সেখানে তীর্থযাত্রা করে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে।'৫(১৫০) দানিকেন অলৌকিক এক শক্তির বাস্তব উপস্থিতি আবিষ্কার করেছেন সেখানে। নইলে 'কী সে শক্তি যা বছরের পর বছর লক্ষ লক্ষ মানুষকে টেনে এনেছে এখানে।' ৫ ১৫৫) প্রত্নতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিকের প্রশ্নের ধরন দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না। লক্ষ লক্ষ মানুষকে টেনে আনাটাই অলৌকিক শক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ ব'লে দাবি করার মতো বাতুলতা আর কী হতে পারে? কুম্ভমেলা, সাগরমেলা আর ভারতবর্ষের বার মাসে তের পার্বণ উপলক্ষ্যে কতরকম জমায়েৎ আর সম্মিলন যে বছরের পর বছর হয়ে আসছে তার সীমা সংখ্যা নেই। এই উপস্থিতির সংখ্যা দিয়ে কী বিচার হ'তে পারে? লুর্দ্দ তো সহজগম্য। ভারতের মানুষ পুণ্য সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে মানস-সরোবরে অভিযান করত। রূপকুণ্ডে এক কঙ্কালের স্তূপ পাওয়া গিয়েছে। পুণ্য সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ওখানে গিয়ে বরফ চাপা পড়েছিল একদল হতভাগ্য যাত্রী। তারকেশ্বরে, দেশে অভাব আর হতাশা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে, 'পার করে গা'র ভিড় ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সমস্ত ধর্মীয় কুসংস্কারের সঙ্গে বাস্তব ফললাভের কোন যোগাযোগ থাকা সম্ভব নয়। ফললাভের থেকে ফললাভের আশাই হ'ল এই সমস্ত ভিড়ের আকর্ষণ।

ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা সতীদের কোন্ শক্তির আকর্ষণে এমন ভাবে টেনে নিয়ে যেত? সেখানে তো প্রত্যক্ষ পাবার কোন কিছুই ছিল না। ১৪২০-২১ সনে ইতালীর পর্যটক নিকোলা কন্টী মন্তব্য করেন, 'এদেশে

(বিজয়নগর) লোকেরা যতবার খুশী বিবাহ করে। তাদের স্ত্রীরা মৃত পতির চিতায় পুড়িয়া মরে। এই দেশের রাজার প্রায় ১২,০০০ রাণী আছে। এদের মধ্যে দুই তিন হাজার এই শর্তে বিবাহে রাজী হয় যে রাজার মৃত্যু হইলে স্বেচ্ছায় তাহার সহিত পুড়িয়া মরিবে।' উইলিয়ম হকিনস্ ১৬০৮-১৩ সনে লেখেন, 'জাহাঙ্গীর সহমরণের জন্য অনুমতি প্রচলন করেন। তথাপি অনুমতিদান কালে বহু বিধবাকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করা যাইত না।' এই অবস্থায় লুর্দের অলৌকিক সলিলকে পবিত্র বলে মনে করাতে আর এমন কি অস্বাভাবিক থাকতে পারে। জর্ডন নদীর জল, গঙ্গার জল এখনও কত মানুষের ঘরে পবিত্রতার স্বাক্ষর নিয়ে শিশিতে বন্দী হয়ে আছে। পৃথিবীর অসংখ্য ঝর্ণা ও প্রস্রবণের সঙ্গে এমন বিশ্বাস জড়িত। মানালীর বশিষ্ঠ প্রস্রবণের জল সম্পর্কে অনেক রকম বিশ্বাস প্রচলিত। এ জল নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করেও কোন কিছু সন্ধান পাওয়া যায় নি। ভিড় কিন্তু তাতে আজো কমে নি। এমনি ধারা কুসংস্কার বশতঃ পৃথিবীর দেশে দেশে কত 'অলৌকিক' যে টিকে আছে তার কোন সীমা সংখ্যা নেই। 'লুর্দ' 'এরই মধ্যে একটি মাত্র।

(৮) **মঙ্গলের উপগ্রহ:** জোনাথান সুইফ্‌টের বই, গালিভার্স ট্রাভলস এ লাপুটা জ্যোতির্বিদ এর দেখা মঙ্গলের উপগ্রহ সম্পর্কে এক বর্ণনা রয়েছে। সে সম্পর্কে দানিকেন বলেছেন, 'মঙ্গলের দুটো চাঁদ ফোবস আর ডাইমোস, গ্রীক ভাষায় যার অর্থ ভীতি এবং সন্ত্রাস। ১৮৭৭ সালে মার্কিন জ্যোতির্বিদ এসাফ হলের আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই এদের কথা মানুষের জানা ছিল।'১(১৩০) অর্থাৎ 'দেবতারা' সেই তথ্য রেখে গিয়েছে। সুইফ্‌টের বক্তব্যকে তৎকালীন সৌরজগতের জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে ঐ অনুমানের কিছুটা সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যাবে।

জোনাথান সুইফ্‌ট যখন গালিভারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখেন, তখন পৃথিবীর একটি উপগ্রহ চাঁদ, সকলের জানা। পৃথিবীর পর মঙ্গলের অবস্থান। তার কোন উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয় নি। মঙ্গলের পর বৃহস্পতি। তার উপগ্রহের সংখ্যা এখন পর্যন্ত জানা যায় ১২টি। তখন আবিষ্কৃত হয়েছিল চারটি—আইয়ো, ইউরোপা, গ্যানিমেড এবং ক্যালিস্টো। এই চারিটিই আবিষ্কৃত হয় ১৬১০ সনে। বৃহস্পতির পর শনির অবস্থান। তার মোট উপগ্রহের সংখ্যা ১০টি। সেই সময় আবিষ্কৃত হয়েছে পাঁচটি; বলয়কে ধরলে ছয়টি। এগুলির আবিষ্কার কাল—১৬৫৫তে টাইটান, ১৬৭১এ জ্যাপিটাস, ১৬৭২এ রিয়া, ১৬৮৪তে ডাইওন ও টেথিস। গালিভার ট্রাভলস্ লেখা হয় ১৭২৭

সনে। তখন পৃথিবীর উপগ্রহ ১টি মঙ্গলের ২টি বৃহস্পতির ৪টি এবং শনির ৬টি ভাবা খুবই সঙ্গত। ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো তখনো আবিষ্কৃত হয় নি। এ ছাড়াও কেপলার ও গালিলিও মঙ্গলের দু'টি উপগ্রহের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। মঙ্গল গ্রীসের যুদ্ধের দেবতা। তার রথের দুটি ঘোড়া নাম ফোবস্ এবং ডাইমস্। পৌরাণিক কাহিনী থেকেও এমন কল্পনা আহরণ করা সম্ভব।

লাপুটা ভ্রমণে উপগ্রহের বর্ণনা আছে, 'কাছেরটা মঙ্গলের কেন্দ্র থেকে নিজের ব্যাসের ঠিক তিনগুণ দূরে আর দূরেরটা আছে তার নিজের ব্যাসের পাঁচগুণ দূরে। একটা মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করে দশ ঘণ্টায় আর দ্বিতীয়টা করে সারে একুশ ঘণ্টায়।' এই বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক সম্ভবতঃ পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলের আয়তন এবং চাঁদের তুলনায় উপগ্রহের আয়তন ও পরিক্রমণ কালের কাল্পনিক হিসাব ক'রে থাকবেন। মঙ্গলের ব্যাস পৃথিবীর অর্ধেক, আয়তন পৃথিবীর দশভাগের এক ভাগ। মঙ্গলের উপগ্রহ কাছেরটি ঘুরছে মঙ্গলের কেন্দ্র থেকে ৬৮০০ মাইল দূর দিয়ে, ৭ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে একবার ক'রে। আর দূরেরটি ঘুরছে ১৪,৬০০ মাইল দূর দিয়ে, ৩০ ঘণ্টা ১৮ মিনিটে একবার ক'রে। কাছেরটির ব্যাস ১০ মাইল, দূরেরটির ৫ মাইল। সুতরাং মঙ্গলের দু'টি উপগ্রহ আছে, এই বিষয়টি ছাড়া লাপুটা জ্যোতির্বিদরা আর কোন ব্যাপারে সত্যের কাছাকাছিও আসতে পারে নি।

লাপুটা ভ্রমণে উল্লিখিত, আর সঠিক হিসাবের তুলনা করলে বুঝতে সুবিধা হবে যে মিলের দিকটা তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়।

	লাপুটা বর্ণনা		প্রকৃত হিসাব
১।	মঙ্গলের দু'টি উপগ্রহ	১।	মঙ্গলের দু'টি উপগ্রহ।
২।	কাছেরটি মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করে প্রতি ১০ ঘণ্টায় একবার ক'রে।	২।	কাছেরটি মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করে প্রতি ৭ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটে একবার ক'রে।
৩।	দূরেরটি মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করে প্রতি ২১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে এক বার।	৩।	দূরেরটি মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করে প্রতি ৩০ ঘণ্টা ১৮ মিনিটে একবার।
৪।	ব্যাসের উল্লেখ নাই।	৪।	ব্যাস কাছেরটির ১০ মাইল, দূরেরটি ৫ মাইল।
৫।	কাছেরটি মঙ্গলের কেন্দ্র থেকে ৩০ মাইল দূর দিয়ে ঘুরছে।	৫।	কাছেরটি মঙ্গলের কেন্দ্র থেকে ৫৮০০ মাইল দূর দিয়ে ঘুরছে।
৬।	দূরেরটি মঙ্গলের কেন্দ্র থেকে ২৫ মাইল দূর দিয়ে ঘুরছে।	৬।	দূরেরটি মঙ্গলের কেন্দ্র থেকে ১৪,৬০০ মাইল দূর দিয়ে ঘুরছে।

(৯) **মার্তণ্ডের প্রমাণ :** দানিকেন প্রশ্ন করেছেন, 'বহির্জাগতিকেরা ইজেকিয়েলকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ? যে নিখুঁত বর্ণনা তিনি দিয়েছেন কোন্ মন্দিরটি তার সঙ্গে মেলে ?' ৬(২৭৫) দানিকেনই উত্তর দিয়েছেন, 'সে মন্দিরে থাকবে চারটি তোরণ আর সামনে একটা ঘেরা উঠান, থামের সারি আর একটা ছোট নদী।' ৬(২৭৫) এই বর্ণনার জোরে দেবতাদের অবতরণ ক্ষেত্র খুঁজতে দানিকেন এসেছিলেন কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দির। সেই-খানে মহাকাশযান নামার জন্য তেজস্ক্রিয়তা রয়েছে বলে দানিকেন তা মাপবার যন্ত্রও সঙ্গে নিয়েছিলেন। ফলে 'হঠাৎ প্রধান তোরণ থেকে বেরিয়ে আসা একটি রেখার ওপর দাঁড়াতেই' তাঁর 'যন্ত্রের কাঁটা ছটফটিয়ে উঠল পাগলের মতো।' ৬(২৭৭) ব্যস ! হাতে হাতে প্রমাণ মিলে গেল। ইজেকিয়েল সত্যি। মহাকাশযান সত্যি ! অবতরণ ক্ষেত্রও সত্যি ! দানিকেনের বর্ণনা মতো সেই 'বিকিরণ ক্ষেত্রের বিস্তৃতি ১.৫ মিটার।' দানিকেনের এ প্রমাণ বিশ্বাস করতেই হবে, কারণ তাঁর এ যন্ত্র ছিল আধুনিক। 'এ যন্ত্র আলফা, বিটা, গামা আর নিউট্রন বিকিরণ পরিমাপ করে, নিয়ন্ত্রণও করে।' ৬(২৭৮)

এই উদাহরণকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত ক'রবার সময় কৈফিয়ৎ দানরত দানিকেন একবারও ভাবেন নি যে, ঐ অত্যুন্নত নভশ্চরেরা কেন মন্দির তৈরি করলেন নামবার জন্য ? পাথরের ভিতর লোহার ছড় ভ'রে তা দিয়ে মন্দির তৈরির অবৈজ্ঞানিক পথে তাঁরা গেলেন কেন ? মহাকাশযান অবতরণের অত্যাধুনিক ঘাঁটি তো অন্য রকমও হ'তে পারত।

সে কথাও থাক। দানিকেনের এত সাধের প্রমাণ সম্পর্কে তাঁরই এক সমর্থক প্রযুক্তিবিদ ব্লুমরিশ বলেছেন, 'ইজেকিয়েলের রথ নামাবার দরুন যে তেজস্ক্রিয়তা থাকার কথা তা দানিকেনের মাপা যন্ত্রের তেজস্ক্রিয়তার সমান হতেই পারে না। কারণ, আজ আড়াই হাজার বছর পরে সে তেজস্ক্রিয়তা নাম মাত্র অবশেষই থাকবার কথা।' ৬(২৮০)

দানিকেন পুরো ছয় খণ্ড বইএ বহুবার বহু দায়িত্ব বৈজ্ঞানিকদের হাতে তুলে দিয়েছেন। মার্তণ্ডের প্রমাণও মিলিয়ে নেবার জন্য তিনি বলেছেন, 'উপযুক্ত বিজ্ঞানীদের হাতে এ কাজ আমি তুলে দিচ্ছি' ৬(২৭৯) সৌভাগ্যের কথা হ'ল, সে দায়িত্ব তুলে নিয়ে শ্রীনগর ও কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিকেরা দানিকেন নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পরীক্ষা চালান। তাদের বিটা, গামা ডিটেকটরে কোন প্রক্ষেপ দেখা দেয় নি। তাঁরা মন্তব্য করেন,

'মন্দিরের ভিতরে ও বাইরে কোন উল্লেখযোগ্য রেডিও এ্যাকটিভিটির চিহ্ন পাওয়া যায় নি।'

এর পরও কি বলা যায় না যে দানিকেন উত্থাপিত উদাহরণ গুলোতে আতিশয্য রয়েছে একটু বেশী মাত্রাতেই ?

(১০) **মিলের ঐতিহাসিকতা :** ঋগ্বেদে একটি আখ্যানে আছে যে একদল কুকুর দেবতার সামনে সমবেত হয়েছে। তারা দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা করছে, আমাদের গান দাও। আমরা ক্ষুধার্ত। এই আখ্যানের কী ব্যাখ্যা হ'তে পারে? কুকুরেরা সমবেত হয়েছে। তাও আবার গান চাইছে। ক্ষুধার্ত হয়ে খাদ্যের বদলে গান। আপাত অসঙ্গতিপূর্ণ এই আখ্যানও সামাজিক বিকাশের পটভূমিকায় দেখলে রহস্যময় মনে হবে না।

মর্গান যাকে বলেছেন টোটেম বিশ্বাস, সেই মত অনুসারে প্রাচীন সমস্ত গোষ্ঠীর নাম কোন পশু-পক্ষী-প্রাণীর নামে করা হ'ত। কুকুর বলতে এখানে কোন গোষ্ঠীকে বোঝানো হয়ে থাকতে পারে। সুদূর অতীতে, সমস্ত যৌথ কাজে সমবেত সঙ্গীত হ'ত। শিকার ও কৃষিকাজে বিশেষ বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠানকে জাদুবিদ্যার মতো মনে করা হ'ত, সাফল্যের মূল কারণ হিসাবে। তাই অভুক্ত ও অভাবগ্রস্ত কোন গোষ্ঠী অধিক ফলনের আশায় গান চাইতে পারে। দানিকেন ঐ ধরনের অনেক আখ্যান তুলে ধরেছেন সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে। যেমন :

(ক) আরো একটি ভয়ঙ্কর কথা শোনাবার আছে। চিচেন ইটজার পবিত্র কূপের কথা।...অনাবৃষ্টির দিনে পুরোহিতেরা কূপের কাছে গিয়ে বরুণদেবের তুষ্টি কামনায় যুবক-যুবতী বিসর্জন দিতেন সাড়ম্বরে ষোড়শোপচারে। ১(১০৭)

(খ) মায়া পুরোহিতেরা বন্দীদের বুক চিরে হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিত। কেন? সে কি দেবতাদের দ্বারা সংঘটিত শল্য চিকিৎসার কোন বিস্মৃত ঘটনার বিকৃত ব্যবহার। ২(৮১)

(গ) ছবিগুলি মনোমুগ্ধকর। হেন জিনিস নেই যা সে সব পুঁথিতে নেই। ধূমপানরত দেবতার ছবি। ভোজনপাত্রের সামনে দেবতার ছবি, জিব ফুটো ক'রে শাস্তি দেবার ছবি। চরকার সামনে সর্পমুণ্ডবিশিষ্টা দেবী মূর্তির ছবি, এমনি আরো কত ছবি। ৪(৪৩)

এই সমস্ত ছবি ও আচরণের অর্থ আজকের মানসিকতার বিচারে পাওয়া সম্ভব নয়। সে দিনের আচার, আচরণ ঐন্দ্রজালিক প্রথার অর্থ কেবল সমাজ

পরিবেশ ও সমাজ বিকাশের ধারার সঙ্গে মিলিয়েই পাওয়া সম্ভব।

ফোনেসিয়ান, কার্থেজিয়ান যে সমস্ত চিত্র সংবলিত পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে তার একটিতে আঁকা আছে, অন্যান্য ছবির সঙ্গে দণ্ডায়মান পশুর মতো মনুষ্য আকৃতি এক ছবি। গা তার লোমে ঢাকা। খর্বাকৃতি। হাতে একটি ঢিল, অন্য হাতে গাছের ডাল যেন মানুষের প্রতি আক্রমণোদ্যত। পাশে মানুষের ছবি আঁকা রয়েছে। একে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সবচেয়ে প্রাচীন চিত্র ব'লে মনে করেন।

সেই সময় মানুষের, সর্বাপেক্ষা নিকটতম পিছিয়ে পড়া পূর্বপুরুষের সঙ্গে সজ্ঘর্ষ হ'ত। মনুষ্য সদৃশ লোমে ঢাকা, মাথা ঠাসাভাবে দাবান, শক্ত শরীর, এ প্রাণীটি হ'ল সেই পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। অনুমান করা হয়, সম্পূর্ণভাবে পশুর স্তর থেকে উত্তীর্ণ মানুষ ঐ পিছিয়ে পড়া প্রজাতিকেই রাক্ষস নামে আখ্যা দিত।

অতীতকে বর্তমানের মানে বিচার করতে গেলে গোলকধাঁধায় পড়তে হবেই। দানিকেন তো বর্তমানকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি ব্যাখ্যা করতে এগিয়ে এসেছেন, আমাদের কল্পনারও বাইরে এমন এক প্রাযুক্তিক জ্ঞান সম্পন্ন সভ্যতার চোখ দিয়ে। অতীতের বহু প্রথা ও আচরণ আজ অবলুপ্ত। তাদের কথা কাহিনীর ভাষার সঙ্গেও বর্তমানের একটা বৈষম্য রচিত হয়ে গেছে। সেদিনের বিষয়বস্তু তাই এদিনের চোখে বিস্ময়কর ঠেকে।

মায়াপুরাণের হিসাব সংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়ে দানিকেন কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন। তাতে চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, শুক্রকে নিয়ে আবর্তন চক্র গড়ে দেখান হয়েছে, 'এই সবক'টি চক্রের আবর্তন মিলে যাচ্ছে ৩৭,৯৬০ দিনে। মায়া পুরাণে কথিত আছে সেই সময় দেবতারা আসবেন পরম বিশ্রাম নিতে।'১(৬৪) এই চক্রের আবর্তনের সঙ্গে দেবতার আসা বা বিশ্রাম নেবার যোগাযোগ কি ভাবে থাকতে পারে, তা বুদ্ধির অগম্য। আর এমন হিসাব-নিকাশ বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি ছাড়াই ইতিহাস কালে অনেকবার প্রকাশ করেছেন নানা ব্যক্তি।

পৃথিবী ও সৌরজগৎ সম্পর্কে গ্রীক দার্শনিকদের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

পিথাগোরাসের শিষ্য দার্শনিক ফিলোলাউস বলেছিলেন, পৃথিবী গতিশীল। বিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে কেন্দ্রীয় অগ্নি। একে ঘিরে চলেছে সব কিছু। প্রথমটি অদৃশ্য, যার নাম বিপরীত পৃথিবী। পিথাগোরাস বলেছিলেন, বিশ্বের আকার

গোল। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ আবর্তিত হচ্ছে এক কেন্দ্রীয় বৃত্তে। ফিলোলাউস সেই কেন্দ্রের চারপাশে পর পর কল্পনা করেছিলেন, বিপরীত অদৃশ্য পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, তারপর পাঁচটি গ্রহ ও নক্ষত্র মণ্ডল।

হেরাক্লিটাস বলেন, পৃথিবী নিজেই ঘুরছে। বুধ, শুক্র সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। সূর্য এদের নিয়ে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। চন্দ্র ও বাকি গ্রহও পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। আরিস্টার্কাস বলেছেন, সূর্য বিশ্বের কেন্দ্র।

প্লেটো বিশ্বকে বলেছেন নিটোল গোল রূপে। সব গ্রহ, চন্দ্র, সূর্য গোল। পৃথিবীও গোল। অ্যারিস্টটল ও টলেমি বলেছেন, বিশ্বের কেন্দ্র পৃথিবী।

এই সমস্ত বক্তব্যের মধ্যে দু'চারটি বিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তার সঙ্গে মিলে গেছে। পৃথিবীর আকার, তার আহ্নিক ও বার্ষিক গতি এইসব বক্তব্যের ভিতর খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁরা যে ভাবেই নিজেদের বক্তব্যে পৌঁছিয়ে থাকুন না কেন, সুনির্দিষ্ট কোন বৈজ্ঞানিক ধারা যে তাঁরা অনুসরণ করেন নি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবু কিছু কথা মিলে গেছে।

জোহন এলার্ট বোডে গ্রহগুলির দূরত্ব নির্ণয় করার এক পদ্ধতি বের করেন। এই পদ্ধতির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তবু তা আশ্চর্যজনক ভাবে প্রকৃত দূরত্বের সঙ্গে মিলে গেছে। ইউরেনাস তখন আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু যখন আবিষ্কৃত হ'ল, দেখা গেল, তার দূরত্বও সেই অনুসারে নির্ণীত হয়েছে। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে কোন গ্রহ, মানে বর্তমানের গ্রহাণুপুঞ্জ, তখন জানা ছিল না। বোডের সূত্রানুসারে সেখানে একটি গ্রহ থাকা উচিত। সেই সূত্রকে অনুসরণ ক'রে অনুসন্ধান চালিয়ে সত্যই গ্রহাণু-পুঞ্জের সন্ধান পাওয়া গেল।

সেই সূত্র অনুসারে, সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বকে ১ ধরে সেই অনুপাতে অন্যান্য গ্রহের দূরত্ব পাওয়া যাবে। প্রত্যেক গ্রহের নামের নীচে ৪ সংখ্যাটি লিখে তারপরের লাইনে বুধ ও শুক্রের নীচে যথাক্রমে ০ এবং ৩ লিখে তারপর তিনের দ্বিগুণ পৃথিবীর নীচে, পৃথিবীর মানের দ্বিগুণ মঙ্গলের নীচে এই ভাবে ক্রমাগত লিখে যাওয়া হ'ল। প্রত্যেক গ্রহের নীচে লেখা সংখ্যা দু'টির যোগফলকে ১০ দিয়ে ভাগ করলে পৃথিবীর দূরত্বের তুলনায় অন্য গ্রহের দূরত্ব পাওয়া যাবে। ব্যাপারটি এই রকম হবে:

বুধ	শুক্র	পৃথিবী	মঙ্গল	?	বৃহস্পতি	শনি	?
৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
০	৩	৬	১২	২৪	৪৮	৯৬	১৯২
৪	৭	১০	১৬	২৮	৫২	১০০	১৯৬

১০ দিয়ে ভাগ	০'৪	০'৭	১'০	১'৬	২'৮	৫'২	১০'০	১৯'৬
প্রকৃত দূরত্ব	০'৩৯	০'৭২	১ ০	১'৫২	—	৫ ২	৯'৫৪	১৯'১৯

এই সূত্রের পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। ৪ ধরা, ৩ দিয়ে গুণ করা বা ১০ দিয়ে ভাগ করায় সমস্ত ব্যাপারটাই নিতান্তই মিলে যাওয়া ছাড়া কিছু বলা সম্ভব নয়। এমনি মিলে যাওয়ার পিছনে দানিকেন দেবতার হাত আবিষ্কার করতে পারতেন, যদি বোডে ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে না জন্মে খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৪৭ সনে জন্মগ্রহণ করতেন।

এমনি মিলে যাওয়ার সন্ধান পাওয়া যাবে আর্নস্ট হেকেলের বক্তব্যে। তিনি ছিলেন জার্মান প্রকৃতি বিজ্ঞানী। ১৮৭০ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে তাঁর তিনটি জীববিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে শেষ গ্রন্থটি ছিল মানব বিবর্তনের বিষয় সম্পর্কিত। তিনি অবশ্য আর গ্রন্থ রচনা করতে পারেন নি। কারণ, মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে যান।

শেষোক্ত গ্রন্থে তিনি দেখান যে সমস্ত প্রাণিজগৎ এক আদি অভিন্ন স্থান থেকে উদ্ভূত। তারই ভিন্ন ভিন্ন ধারা আজকের অসংখ্য প্রাণিজগৎ সৃষ্টি করেছে। প্রথম প্রাণবিন্দুর তিনি নাম দেন মোনেরোন।

কল্পনা নির্ভর তাঁর সেই প্রকল্পে তিনি পরের পর প্রাণী প্রজাতির নামকরণ ও বর্ণনা রেখে যান। বৈজ্ঞানিক কোন ভিত্তি না থাকলেও বাস্তবের উপর দাঁড়িয়ে কল্পনাকে প্রসারিত ক'রে তিনি বর্ণনা রাখেন। মানুষের এক বিবর্তনের ধারা চিত্রিত করেন তাঁর গ্রন্থে। মনুষ্য সদৃশ বানর থেকে মানুষের মাঝখানের ধাপের এক পরপর ছবি আঁকেন।

আশ্চর্য ঘটনা হ'ল, হেকেলের অনুমিত সেই সব ধাপ পরবর্তী সময়ের আবিষ্কারে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইউজেন ডুবোয়া, বলতে গেলে, হেকেলের অনুমিত স্তর আবিষ্কার করবার তাগাদাতেই জাভায় ছুটে আসেন এবং পিথাকানথ্রপাস আবিষ্কার করেন।

সুতরাং মিলে যাওয়া ব্যাপারটার সাথে মহাজাগতিক প্রাণীর হস্তক্ষেপের কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। মানব ইতিহাসে এমন ঘটনার অনেক উদাহরণ মিলবে। প্রাচীন হয়ে গেলেই দানিকেনের কাছে তা গ্রহান্তরে প্রাণীর রেখে যাওয়া জ্ঞান ভাণ্ডার ব'লে মনে হতে পারে।

ব্যাখ্যায় বিভ্রান্তি : দানিকেন পুরাকীর্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহা-বিশ্বের উন্নত জীবকে খোঁজবার চেষ্টা করেছেন। তেমনি আরেক রকম প্রচেষ্টা আছে, বিশ্বের বিস্ময়কর স্থাপত্যকে পৃথিবীরই এক প্রাচীন ধ্বংস হয়ে যাওয়া

সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত করার। সেই আনুমানিক সভ্যতা হ'ল আটলান্টিক মহাসাগরে তলিয়ে যাওয়া আটলানটিস সভ্যতা। একই উদাহরণ মহাকাশ ও মহাসমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

প্লেটো বর্ণিত আটলানটিস নিয়ে বহুদিন থেকেই জল্পনা-কল্পনা হয়ে আসছে। সম্প্রতি তা নিয়ে বহু লেখাও হয়েছে। কিন্তু সেই সব অনুমানকে কেহই বেশী দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি। প্লেটোর আটলানটিসের বর্ণনা হঠাৎ আরম্ভ হয়েছে এবং হঠাৎই শেষ হয়ে গেছে। তাতে বলা হয়েছে, বর্তমান আটলানটিক মহাসাগরে এক বিশাল স্থলভাগ ছিল। সেখানে বিরাট এক উন্নত সভ্যতা ছিল। কোন অজ্ঞাত কারণে তা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে। পৌরাণিক দৈত্যের মেয়ে আটলাসের নামে তিনি এই দেশের নাম দেন আটলানটিস। এমন কোন বাস্তব বা তথ্যভিত্তিক বিষয়বস্তু প্লেটোর বর্ণনায় নেই, যা থেকে তার অস্তিত্বের সঠিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায়।

গবেষকরা অবশ্য চুপ ক'রে বসে নেই। তাঁরা সেই অস্তিত্বের নানা প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা ক'রে চলেছেন। আর সেই প্রমাণ হিসাবে, দানিকেন যে সমস্ত উদাহরণ তুলে ধরেছেন, এঁরাও সেগুলিই দেখিয়েছেন। তাঁদের যুক্তিগুলি দেখলেও মনে হতে পারে যে সত্যই তার অস্তিত্ব ছিল; আর মিশরীয়-মায়া-পলিনেশীয় প্রভৃতি সভ্যতা যে সমস্ত কীর্তি রেখে গেছে তা সেই আটলানটিস সভ্যতারই পরোক্ষ ফল।

কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে মনে হবে, পুরাকীর্তির স্রষ্টারা দানিকেন কথিত অন্তরীক্ষে ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন জলের তলে হারিয়ে যাওয়া মহাদেশে।

আয়ার্ল্যাণ্ড, ওয়েল্‌স্‌, স্পেন, পর্তুগাল, মরক্কো, ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল, দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার কোথাও কোথাও যে ধরনের নাম পাওয়া যায় তার সঙ্গে আটলানটিস নামের মিল রয়েছে। আজটেকদের কাছ থেকে স্পেনের বিজেতারা শুনেছিল যে তাদের পূর্বপুরুষেরা এসেছিল এক ডুবে যাওয়া দেশ থেকে। তার নাম ছিল আজ্‌টল্যান। আটলানটিক মহাসাগরের তীরে অনেক আদিবাসীর কাহিনীতে বলা হয়, অতীতে এক বৃহৎ পৃথিবী ছিল। তা হারিয়ে গেছে। সে ছিল এক স্বর্গের দেশ, যার নাম ছিল আট্‌লন। মায়াদের মধ্যে গল্প প্রচলিত আছে যে তাদের পূর্বপুরুষ বাস করত, আটলান নামক এক দেশে। মিশরের মৃত দেশ বলে পরিচিত জায়গার নাম ছিল আলুন্‌। ব্যাবিলনে স্বর্গকে বলা হ'ত, আরলুন।

প্লেটোর বর্ণনায় পাওয়া যায়, আটলানটিসে অনেক হাতী ছিল। হাতী আফ্রিকায় আছে। কিন্তু আমেরিকায় নেই। অথচ আমেরিকায় হাতীর প্রাচীন চিত্র পাওয়া যায়। এ থেকে বলা হয় যে আটলানটিসই স্থলভাগ হিসাবে সেতুর কাজ করেছে আফ্রিকা ও আমেরিকার মধ্যে। কাজেই আমেরিকায় হাতী এখন না থাকলেও, সেখানে হাতীর প্রাচীন ছবি পাওয়া যায়।

আটলানটিসের মত বিশাল মহাদেশ ডুবে যাবার ফলেই পৃথিবীর দেশে দেশে সমুদ্র-জল উঁচু হয়ে বন্যা সৃষ্টি হয়েছিল। তাই সারা পৃথিবীর পুরাণে প্লাবনের কাহিনী। প্রশান্ত মহাসাগরের বিরাট ভূভাগ ডুবে যাবার পর পলিনেশিয়া, মাইক্রনেশিয়া, মিলেনেশিয়া প্রভৃতি দ্বীপমালা মাথা তুলে রয়েছে। আমেরিকার ইঙ্কা সভ্যতা, নানমাদল, পেনাপ দ্বীপের জলের তলায় চলে যাওয়া প্রাসাদের সারি এই ভাবেই সৃষ্টি হয়েছে।

নিউফাউনল্যাণ্ড, উত্তর সাগর, ইংলিশ চ্যানেল, আয়ার্ল্যাণ্ডের উপকূলভাগের গভীরতা এত কম যে মনে করা যেতে পারে, তা একসময় স্থলভাগ ছিল। উত্তর সাগরের সমুদ্রতলদেশে পাথরের অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। জিব্রালটার প্রণালীতে পাওয়া গেছে বড় বড় পাথরের ব্লক। ভূমধ্য সাগরের তলভাগে টিলা, উপত্যকা, উঁচু পাহাড় দেখা যায় যা কেবল স্থলভাগেরই বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ম্যাপে গ্রীসকে বিরাটাকার দেখা যায়; যেগুলি সবই জলমগ্ন বলে মনে করা যেতে পারে। আইসল্যাণ্ড থেকে দক্ষিণ আমেরিকা মাঝ বরাবর সমুদ্রতল পর্বত শৃঙ্গে ভরা। ৩৮° উত্তর অক্ষাংশ ও ৩০°—৩৭° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ বরাবর এজরস্ দ্বীপ প্রকৃতপক্ষে পর্বতমালার জলমগ্ন শৃঙ্গ।

আটলানটিক মহাসাগরে কেব্‌ল পাততে গিয়ে একটি ট্র্যাকেলাইটের টুকরো পাওয়া যায়। ট্রাকেলাইট হ'ল চাপে গড়ে ওঠা একজাতীয় লাভা; যা কখনই জলের তলায় তৈরী হতে পারে না। এটির বয়স অনুমান করা হয়, ১২-১৩ হাজার বৎসর যা আটলানটিসের বয়স বলে অনুমিত।

এই সব কিছু থেকে অনুমান করা হয় যে আটলানটিস নামক কোন উন্নত সভ্য দেশ নৈসর্গিক কারণে সমুদ্রে তলিয়ে গেছে। সেই উন্নত সভ্যতারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপের ফল হ'ল, ইস্টার-মায়া-মিশরের স্থাপত্য কীর্তি, দেশে দেশে পুরাণে উন্নতমানের গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্য।

হিসাব ক'রে দেখা গেছে, সারা বছরে পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয় এক লক্ষের মতো—মৃদু ও বড় আকার মিলে। এই ভূমিকম্পের অধিকাংশই ঘটে সমুদ্র তলদেশে। তার মধ্যেও সবচেয়ে বেশী দেখা যায়, আটলানটিক মহাসাগরের

তলদেশে। আটলানটিকের তলদেশ সেই কারণে হামেশাই পরিবর্তিত হয়। সবচেয়ে অস্থির সমুদ্র হ'ল আটলানটিক।

আটলানটিসের গবেষকরা দানিকেন উত্থাপিত সমস্ত উদাহরণই আটলানটিসের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেখিয়েছেন। বলা বাহুল্য, সেই ব্যাখ্যা ও যুক্তিগুলিও পাঠকের কাছে দানিকেনের যুক্তির মতো সঠিক ব'লে আপাত মনে হ'তে পারে। এই কারণেই কেবল যুক্তি দিয়ে কোন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। ব্যাখ্যা ও যুক্তি যদি প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত না হয় তবে তা অনেক সময় কুহেলিকা সৃষ্টি ক'রে থাকে।

প্লেটো আটলানটিসের কথা হঠাৎ শুরু ক'রে হঠাৎ শেষ ক'রে দেন। অ্যারিস্টটল তাই তাঁর বাস্তব অস্তিত্বের সম্পর্কে মন্তব্য করেন, যিনি আটলানটিসের স্রষ্টা তিনিই আটলানটিসের সংহারক। তেমনি বলা যায়, পৃথিবীর আগন্তুক গ্রহান্তরের দেবতারাও দানিকেনের সৃষ্টি, কল্পনাতিশয্য আর এলোমেলো যুক্তি জালে তিনিই তাদের সংহার করেছেন।

দানিকেন অনুমান করেছেন, আমেরিকার উৎক্ষিপ্ত পাইওনিয়ার যে ফলক নিয়ে মহাকাশে যাত্রা করেছে, সেটি যখন কোন বুদ্ধিমান জীবের গ্রহে পড়বে তখন তারা যে ভাবে ফলকটি নিয়ে গবেষণা করবে, তেমনি গবেষণা করার মতো ফলক পৃথিবীতেও পড়েছে। নির্দিষ্ট ভাবে একটি ফলকের কথা তিনি উল্লেখও করেছেন, 'পাইওনিয়ার ছবির ফলকের পাশে ইকা স্বর্ণফলকটির ছবি রেখে বিবর্ধক কাঁচ দিয়ে দুটোকে দেখি আর ভাবি আমাদের কেউ কেন নভশ্চারণার যুগের চোখের আলোয় এই সব সরলরেখা, বৃত্ত, বিন্দুরেখা, আঁকা-বাঁকা রেখা, বর্গক্ষেত্র ইত্যাদি পরীক্ষা ক'রে দেখেন না? চেষ্টা করলে সেগুলোরও তো পাঠোদ্ধার করা যেতে পারে। এ কষ্টটুকু স্বীকার করলে যদি সফলতা আসে তা হ'লে কি সেইটিই বড় পুরস্কার হবে না?' ৩(১৪০) 'নভশ্চারণার যুগের চোখের আলোয়' দানিকেন তো নিজেকে সবচেয়ে বেশী আলোকিত ব'লে মনে করেন, তা হ'লে মন্তব্য আর কল্পনার জাল না বুনে, তিনিই সেই 'বড় পুরস্কারটির' চেষ্টা করুন না! নিছক অতিশয়োক্তি না ক'রে সেইটিই তো হ'তে পারে, বাস্তবের দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে, বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম।

তৃতীয় অধ্যায়

যুক্তির দারিদ্র

মানব-সমাজের অতীত ইতিহাসের অনেক রহস্যের কিনারা করতে গিয়ে দানিকেন গ্রহান্তরের জীবের হস্তক্ষেপ কল্পনা করেছেন। নিছক কল্পনা বলা ঠিক হবে না, কল্পনাকে কিছু বাস্তব ভিত্তির উপরও দাঁড় করাতে চেয়েছেন। তা করতে গিয়ে প্রমাণ হাতড়ে যখন ব্যর্থ হয়েছেন তখন যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন। কিন্তু তাঁর সমগ্র প্রকল্পটি যে সমস্ত যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে সেগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে শেষ পর্যন্ত অনুমানই তাঁর সম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিনি বলেছেন, 'ঈশ্বর বা দেবতাদের যদি দেখাই না যেত তা হলে মানুষ তাদের আঁকল কেমন ক'রে? দেখে নি এমন জিনিস কি আদিম মানুষ আঁকতে পারত? যা দেখে নি তাকে মূর্তিতে কেমন ক'রে প্রকাশ করত? সে কি অকল্পনীয়কে দেখার আকাঙ্ক্ষায় 'সমাধিতে দেখা' কল্পবস্তুর রূপদান প্রচেষ্টা? আমার তা মনে হয় না, কেন না আদিমতম চিত্রেও দেবতার মূর্তি প্রায় মানুষেরই মতো।'৪(৩৯) অতএব মানুষ নভশ্চরদের চাক্ষুষ দেখেই দেবতার ধারণা করেছে। আর এই কারণেই ঈশ্বর নিজেকে 'আমরা বললেন কেন?' ১(৪৪) তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই ঈশ্বর আমরা বললেন কেন আর 'প্রাচীন লেখায় একবচনাত্মক ঈশ্বর কোথাও নেই' ৪(৩৯) কেন, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

দৈবচিন্তার পিছনে মানুষের মনকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছে বিচিত্র প্রকৃতি। নিজ ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, প্রকৃতির নব নব রূপ, বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত শক্তির স্বরূপ থেকেই দেব চিন্তা দেখা দিয়েছে মানুষের মনে। তার প্রমাণ সমস্ত দেশের পুরাণ। পুরাণগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে পৃথিবী, সূর্য, ঝড়, আগুন প্রভৃতি বেশ কতকগুলির ক্ষেত্রে সমস্ত দেশের দৈব কল্পনা একই রকম। কাজেই দেবতাকে বহুবচনে দেখাই হ'ল সাধারণ ভাবে ধর্মীয় চিন্তার প্রাথমিক ফল। ধর্মীয় চিন্তাকে দার্শনিক পর্যায়ে তোলার পরই ভাববাদী দর্শন দেবতাকে একবচনে উত্তরণ ঘটিয়েছে। এ ক্ষেত্রে/রামকৃষ্ণের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি আছে। তিনি বলেছেন, স্থূল বোধের স্তরে যখন প্রাথমিক ঈশ্বর চিন্তা থাকে তখন তাকে বিরাট রূপে

দেখা যায়। দশভুজা দুর্গা বা মুণ্ডমালিনী কালী তেমনি দেব কল্পনা। তারপর যখন চিন্তা আরো পরিষ্কার হয়, তখন তার কাছে ঈশ্বর আর বিরাটাকারে দেখা দেবার প্রয়োজন হয় না। একটা শালগ্রাম-শিলা দেখেও তার ঈশ্বরবোধ আসতে পারে। মন যখন আরো উচ্চ মার্গে ওঠে তখন ঈশ্বরকে ভাবতে শালগ্রাম শিলারও দরকার হয় না। তার কাছে ঈশ্বর তখন নিরাকার। মানব-সমাজে ঈশ্বরের ধারণার বহুবচনাত্মক হওয়ার ক্রম বিকাশও একই পথে পরিচালিত হয়েছে।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বেদের বিভিন্ন দেবতাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে প্রতিটি উল্লেখযোগ্য জ্যোতিষ্কই বেদে দেবতারূপে বর্ণিত হয়েছে। দেবতা শব্দের অর্থ দীপ্তিমান বা জ্যোতিষ্মান। তাঁর মতে আকাশের নক্ষত্রও যেমন অসংখ্য, দেবতার সংখ্যাও তেমনি তেত্রিশ কোটি।

আদি সমাজে প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগকে দেব কল্পনা করা ও পরে নানা গুণের প্রতিনিধিত্বে দেবতা সৃষ্টি হতে থাকে। আর সব ক্ষেত্রেই দেবতার দৈহিক রূপ, মানুষের থেকে অন্য কোন অবয়বে চিন্তা করা সম্ভব ছিল না। এমন কি দেবতাদের জীবনযাত্রাতে পর্যন্ত মানুষী গুণের সমাবেশ ঘটেছে। আদিম সমাজে এটাই ছিল স্বাভাবিক। মানুষের জীবনের বৈচিত্র্য, আনন্দ, দুঃখ, দুর্দশা সমস্ত কিছুই প্রকৃতির সঙ্গে সেদিন ছিল ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। প্রকৃতি-নির্ভর অসহায় মানুষ সেদিন দেখেছিল সূর্যের প্রচণ্ড তেজ, চাঁদের মধুর জ্যোৎস্না, তারার রহস্যঘেরা রূপ, বজ্রের অতর্কিত আক্রমণ, বন্যার ভীষণ তাণ্ডব; দেখেছিল ঋতু পরিবর্তনের চক্রগতি, নদীর জীবনদায়ী প্রবাহ, পত্র-পল্লব-পুষ্পে শোভিত বিচিত্র প্রকৃতিকে। আর সর্বত্রই সেই মানুষেরা স্থাপন করেছিল, মনের রঙিন কল্পনা আর ভীরুতার মিশ্রণে সৃষ্ট দেবতাদের। তাই দেবতাদের তারা খুঁজছে আকাশে, পাহাড়ে, জলে, মৃত্তিকায়।

দানিকেন এসব জেনেও যুক্তি দিয়েছেন, 'মহাভারতের, বাইবেলের, গিলগামাস মহাকাব্যের, এস্কিমো, রেড ইণ্ডিয়ান, স্কানডেনেভিয়, তিব্বতী এবং আরো অনেক অনেক পুঁথির কাহিনীকারেরা সকলেই উড়ন্ত দেবতাদের কথা বলেছেন।...একসঙ্গে একই ধারণা পৃথিবীর সব কাহিনীকারদের মগজে খেলতে পারে না।'১(৬৮) গ্রহান্তরের প্রাণী যদি এসেও থাকে তবে কি তারা সারা পৃথিবীর সমস্ত স্থলভাগে পৃথক পৃথক ভাবে বারবার নেমেছিল? পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ছোট ছোট স্থলভাগে, এস্কিমোদের বরফের দেশে, আরবের

(রুভূমিতে, তিব্বতের মালভূমি আর পলিনেশিয়ার সমুদ্রঘেরা অঞ্চলে দেবতার বিমান অবতরণ করেছে এ ভাবনার সম্ভাব্যতা খুবই সুদূর। এত বড় পাঁচটি মহাদেশের বিশাল স্থলভাগ থাকতে দেবতারা একফালি কিংবা বিন্দুবৎ জায়গা খুঁজে খুঁজে নামলই বা কেন? পৃথিবীর সমাজ বিকাশের সঙ্গে নদী-সমুদ্র জলের একটা হৃদয়ের যোগ আছে। কিন্তু সবজান্তা দেবতারা পশু থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে গিয়ে এ পৃথিবীতে নামবার জন্য কি প্রশস্ত কোন জায়গা খুঁজে পায় নি? (৬৬ পৃষ্ঠার ম্যাপে নভশ্চরদের অবতরণ ক্ষেত্র দেখানো হল।)

দেবতারা উড়ে এসে এই জায়গাগুলোতেই বা নামল কেন? মধ্যস্থলভাগে নেমেই তো পৃথিবী চরে বেড়াতে পারত। আসলে সমাজ বিকাশের ধারা সারা পৃথিবীতে মূলগত একই ভাবে ঘটেছে, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। নানা দেশের কাহিনীতে দেবতাদের সম্পর্কে ভাবনার প্রাকৃতিক ও বাস্তব পরিস্থিতি একইভাবে দেখা দেওয়াই ছিল স্বাভাবিক। এই জন্যই সব দেশের পুরাণে দেবতাদের রূপ একই রকম।

দেবতাদের রূপ এবং আকাশ ভ্রমণ সম্পর্কে মন্তব্যের পর তাদের আগমন, স্থিতি ও প্রস্থানের সম্পর্কে লেখক দানিকেনের যুক্তি লক্ষ্য করা যাক। অজ্ঞাত সেই মহাকাশচারীরা (১) কী উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীতে এসেছিল? (২) কোথা থেকে তারা এসেছিল? (৩) কবেই বা এসেছিল? আর (৪) এসেই বা তারা কী করেছিল?

নভশ্চরদের আগমনের উদ্দেশ্য

সুদূর কোন গ্রহ থেকে নভশ্চরেরা যদি পৃথিবীতে এসেও থাকে তবে তারা কী উদ্দেশ্যে এসেছিল, সেটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। দানিকেন কোন ব্যাপারেই সোজা পথে অগ্রসর না হওয়ায় এ সম্পর্কেও যখন যেমন মনে এসেছে তেমন যুক্তিকে সাজিয়েছেন; উদ্দেশ্যের সঙ্গে যে কার্যকলাপের মিল থাকাটা আবশ্যক এই সরল সত্যকেও তিনি কোন আমল দেন নি। পৃথিবীর যাবতীয় উদাহরণকে এলোপাতাড়ি উদ্ধৃত ক'রে গিয়েছেন। দেবতাদের আগমনের উদ্দেশ্যের সাথে কোন সঙ্গতি রাখার চেষ্টাও করেন নি। এই না-করার একটিই কারণ থাকতে পারে তা হ'ল, নির্দিষ্টভাবে অনুসন্ধানের অনিবার্য পরিণামকে, তা অভিপ্রায়ের অনুকূলেই হোক আর প্রতিকূলেই হোক, এড়িয়ে চলা।

দানিকেন দেবতাদের আসার তিনটি কারণ দেখিয়েছেন। প্রথম, কোন

গ্রীনল্যান্ড
[এস্কিমোর দেশ]
মধ্য আমেরিকা
[মায়া / আজটেক]
পেরু
[ইনকা]
মিশর
জেরুসালেম
মেসপটেমিয়া
তিব্বত
ইস্টার দ্বীপ
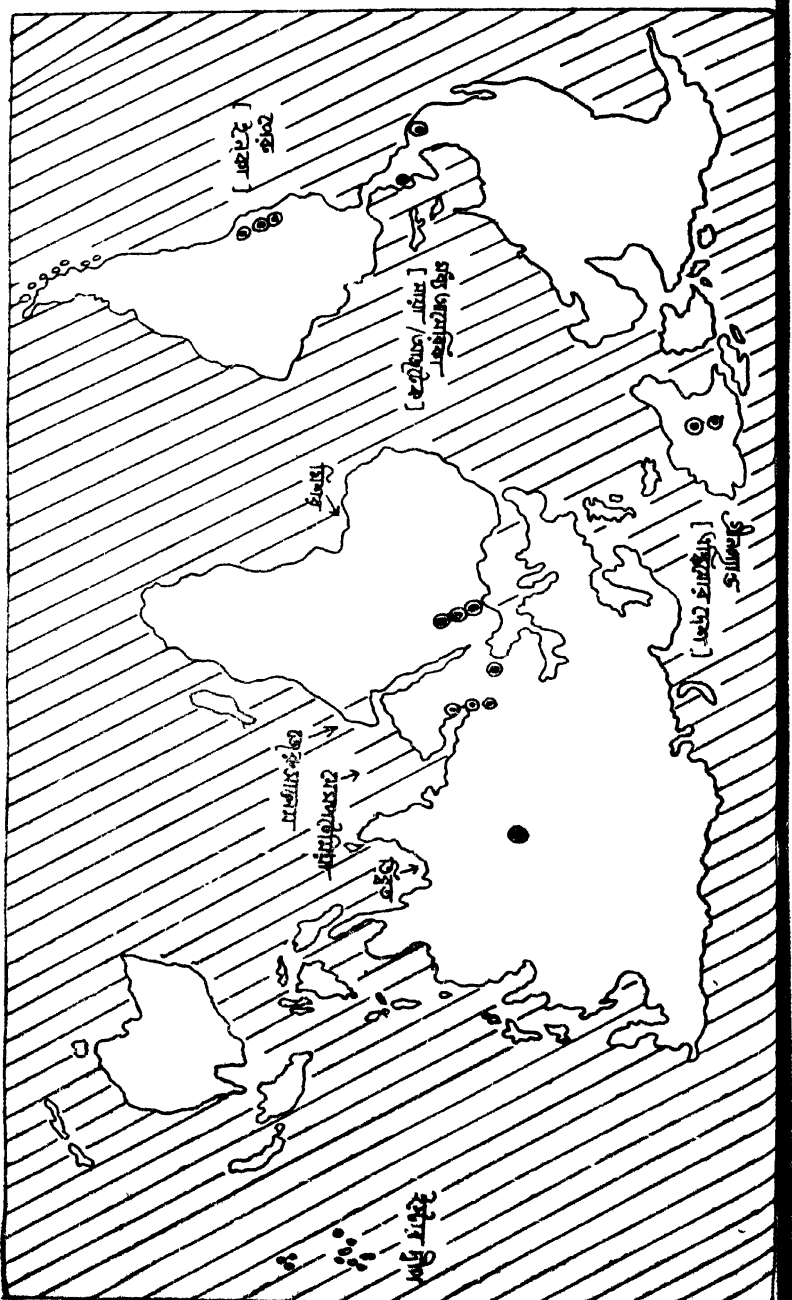
গ্রহের পরিবেশ বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ায় সেই গ্রহবাসীরা এই পৃথিবীতে চলে আসে। দ্বিতীয়, কোন অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ চিরদিনের জন্ম ভিন্ন গ্রহবাসীকে পৃথিবীতে চলে আসতে হয়। তৃতীয়, গবেষণার কার্যে উন্নত কোন গ্রহবাসী এই পৃথিবীতে পদার্পণ করেছিল এক বা একাধিকবার।

সুদূর কোন গ্রহের পরিবেশ বসবাসের অনুকূলতা হারিয়ে ফেললে সেই গ্রহের প্রাণী যদি অত্যুন্নত একটা অবস্থায় পৌছে থাকে, তবে তারা ক্রমশ বহির্বিশ্বে বসবাসের অনুকূল গ্রহ খুঁজে বেড়াবে। তারাই হয়ত পৃথিবীকে একটি বাসস্থান ব'লে বেছে নিয়েছিল। দানিকেন সেই অবস্থা বোঝাতেই বলেছেন, 'সভ্যতা যতো উন্নত হবে তার সূর্যের পরিবর্তন সে লক্ষ্য করবে ততো নিখুঁত ভাবে। সে সভ্যতা চাইবে অনিবার্য মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে। এতযুগ ধরে হাজার হাজার পুরুষের হাতে গড়া জ্ঞানকে সে এক নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দিতে চায় না। সে নিশ্চয়ই চাইবে তার গতি থাক অব্যাহত। সেই বাঁচবার কামনাতেই নিহিত রয়েছে মহাকাশ যাত্রার উদ্দেশ্য এবং বিধেয়। মহাকাশ যাত্রায় বেরোবার উপযুক্ত প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিকে আমি আশ্রয়বাক্য হিসাবে ধরে নিচ্ছি। কেউ জানে না বহির্জাগতিক সে নভশ্চরেরা কতকাল ধরে সে কাজে ব্যাপৃত ছিল, কেউ জানে না কতকাল কেটেছিল তাদের আপন গ্রহে, কোথা থেকে তারা এসেছিল তাও কারুর জানা নেই, জানা নেই কত জোরে কিসের গতিতে তাদের ইঞ্জিন তাদের মহাকাশযানকে চালিয়ে তাদের অভীষ্ট গ্রহের দেখা পেয়েছিল। তবু অনেক পণ্ডিতই আজ দৃঢ় প্রত্যয় যে অতি দূর অতীতে একদিন তারা আমাদের গ্রহের ঘন বাতাবরণ ভেদ করে ঢুকেছিল।' ৪(৮৬) এরকম ঘটনা ঘটে থাকলে একথা নিশ্চিত যে সেই গ্রহবাসীরা পৃথিবীকে নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করেই এই গ্রহে এসেছিল বসতি স্থাপন করতে। আর সেইভাবে এসে থাকলে তারা এসেছিল চিরকালের জন্ম এবং এসেছিল একটা বিরাট সংখ্যক। সেক্ষেত্রে পৃথিবীর উপর যে ধরনের ব্যাপক কার্যকলাপের স্বাক্ষর থাকা দরকার, দানিকেনের তুলে ধরা উদাহরণগুলি তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তেমন হয়ে থাকলে বংশ-পরম্পরায় সেই আগন্তুকদের ধারাই বা কোথায় গেল?

দ্বিতীয় সম্ভাবনা অনুসারে, হঠাৎ কোন কারণে ভিন্ন গ্রহবাসীরা পৃথিবীতে আসতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রেও সেই প্রাণীদের বাসস্থান হিসাবে পৃথিবী ছাড়ার কোন প্রশ্ন ছিল না। অর্থাৎ তাদের কার্যকলাপের ধরন হওয়ার কথা স্থায়ী। দানিকেন এই ধরনের সম্ভাবনার দুটি দিক নির্দেশ করেছেন। একটি হল,

'...মহাজাগতিক বিপর্যয়ের ফলেই যদি মঙ্গল গ্রহের সভ্যতা ধ্বংস হয়ে থাকে, তা হ'লে তো আমার সিদ্ধান্ত ঠিক, অর্থাৎ অতিদূর অতীতে মহাকাশ থেকে অতিথিরা পদার্পণ করেছিল এ পৃথিবীতে।' ১(১১৩) মঙ্গলগ্রহবাসীরা এ পৃথিবীতে এসে কী জাতীয় কাজ ক'রে থাকতে পারে, সে আলোচনার আগে এ কথা স্মরণ করা ভাল যে আমেরিকান মহাকাশযান সর্বশেষ মঙ্গলে নেমে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিল তাতে সেখানে উচ্চতর প্রাণীর অস্তিত্বের সম্ভাবনা প্রমাণিত হয় নি। মঙ্গলের ভূপৃষ্ঠে জলের অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু তা জমাট বরফের আকারে। এ ছাড়া চাঁদের ভূপৃষ্ঠের সঙ্গেই মঙ্গলের মিল বেশী। উল্কার আঘাত আর আগ্নেয়গিরি-মুখে মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশ ছেয়ে আছে। সমুদ্রের কোন চিহ্ন নেই। অতীত থেকে জেনে আসা মঙ্গলের পৃষ্ঠে যে খালের কল্পনা ক'রে আসা হয়েছিল, তা ছায়া বলে সনাক্ত হয়েছে। মঙ্গলের অভিকর্ষ খুবই কম। পৃথিবীর দশভাগের একভাগ। তাই অনুমান করা হয়, মঙ্গলের আবহমণ্ডল গড়ে ওঠার মতো মাধ্যাকর্ষণ নেই। প্রাণীর অনস্তিত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হ'ল, মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশের চিহ্নগুলি অপরিবর্তিত থেকে যাওয়া। সৃষ্টিকালে যেমন ক্ষতগুলি, ফাটলগুলি আর জলহীন বিরাট গহ্বরগুলি তৈরি হয়েছে, সেগুলি তেমনি রয়ে গেছে। এই গ্রহে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দিনে ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং রাতে ৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। বিশেষ বিশেষ জীববিজ্ঞান বিষয়ক পরীক্ষা থেকেও জানা যায় যে মঙ্গলে নিম্নতম প্রাণীর বর্তমানে বা আতীতেও কোন অস্তিত্ব ছিল না।

হঠাৎ ক'রে চলে আসা ভিন্নগ্রহের প্রাণীর সম্পর্কে দানিকেন একেবারে রীতিমতো একটি কাহিনী উপস্থিত করেছেন, 'তার সমর্থনে কিছু যুক্তিও' জুগিয়েছেন।

'১। সুদূর অজানা অতীতে ছায়াপথের মাঝে কোথাও মানুষের মতো জীববিশিষ্ট অত্যুন্নত দু'টি সভ্যতার ভেতর একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। ২। পরাজিত পক্ষ একটা মহাকাশযানে ক'রে পালিয়ে গেল যুদ্ধের শেষে। ৩। বিজয়ীদের মতিগতির কথা তাদের অজানা ছিল। তাই তারা এক চাতুর্যের আশ্রয় নিল। বাঁচার পক্ষে আদর্শ গ্রহে তারা নামলো না।... ৬। প্রতিপক্ষকে পুরোপুরি ভুলপথে চালিত করার উদ্দেশ্যে তারা আমাদের সূর্যের পঞ্চম গ্রহে বসাল একটা প্রাযুক্তিক স্টেশন এবং বার্তাপ্রেরক যন্ত্র। সে যন্ত্র নিক্ষেপ করত সঙ্কেতবার্তা। ৭। বিজয়ীপক্ষ তাদের ধোঁকাকে সত্যি ব'লে ধরে নিল। পরাজিত পক্ষকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে তারা পঞ্চম গ্রহকে ধ্বংস

ক'রে ফেললে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। সেই গ্রহের টুকরোগুলোই সৃষ্টি করেছে গ্রহাণুবলয়।... ৯। পঞ্চম গ্রহের বিলয়ের পর আমাদের সূর্যমণ্ডলের ভারসাম্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল সাময়িক ভাবে, পৃথিবীর মেরুরেখা অল্প কয়েক ডিগ্রি সরে গেল।' ৩(১৫৭)

সুদূর কোন গ্রহের অধিবাসীদের ভিতর যুদ্ধ হ'লে পরাজিত পক্ষের, মহাকাশ-যানে ক'রে, কতজন হারা উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতে পারে সে একটা প্রশ্ন। দ্বিতীয়তঃ সেই সামান্য কয়েকজন শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য একটা গ্রহকেই ধ্বংস ক'রে দেবার কল্পনাটাও রীতিমত কল্পকথা। সে সব প্রশ্ন নিয়ে অবশ্য বিতর্ক করা যায়, কিন্তু সিদ্ধান্তে আসা যায় না। কারণ, সম্পূর্ণ জিনিসটাই কল্পনার ব্যাপার।

কিন্তু এই বক্তব্যের ভিতর যেটুকু বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য আছে সেটা পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

পঞ্চম গ্রহটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধ্বংস করার ফলেই নাকি গ্রহাণুপুঞ্জের সৃষ্টি। এর ফলেই ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটে ও পৃথিবীর অক্ষরেখা কয়েক ডিগ্রি কাত হয়ে গেছে। এটা একটা অঙ্কের ব্যাপার। জটিল সে সমাধানের পথে দানিকেন যান নি। যদি গাণিতিক ভাবে এটা দেখান যেত যে গ্রহাণুপুঞ্জ একটা পিণ্ডাকারে থাকলে তার ফলে গোটা সৌরজগতে পরস্পর আকর্ষণ বিকর্ষণের হেরফের সম্ভব ছিল, তা হলেও বা কল্পনার একটা বাস্তব ভিত্তি পাওয়া যেত। কিন্তু তা যথারীতি হয় নি।

গ্রহাণুপুঞ্জটি কী? মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে টুকরো টুকরো অনেক-গুলি বস্তুপিণ্ড একটি বলয়ের মতো একত্রে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। নব-গ্রহের মধ্যে এই গ্রহাণু হঠাৎ বিশেষ রূপ কী ক'রে গ্রহণ করল? বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, এটি একটি ক্ষুদ্র গ্রহাকারে অতীত ছিল, কোন নৈসর্গিক কারণে তা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। অথবা সৃষ্টির শুরু থেকেই গ্রহাণু এমনি আকারে বিচ্ছিন্ন ভাবে রয়ে গেছে।

গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি সম্বন্ধে কোন সর্বসম্মত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নেই। তবে সূর্যের বলয়াকারে ঘুরতে ঘুরতেই গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, এমন একটি তত্ত্ব অনেক প্রশ্নের সমাধান করেছে। একটি চাকতির আকারে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যের ভিতরের অংশ ও বাহিরের অংশের ঘূর্ণনবেগের হেরফের ঘটে। এবং বাইরের অংশ বলয়কারে পৃথক হয়ে পড়ে। গ্রহাণুপুঞ্জের এমনি ছড়িয়ে পড়ার একটি ব্যাখ্যা এই তত্ত্বে পাওয়া যায়।

গ্রহসৃষ্টির প্রাক্কালে ভারী হাইড্রোজেন ঘনীভূত হয়ে তেলে পরিণত হয়। সেই তৈলাক্ত পদার্থ উচ্চতাপমাত্রায় অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে পিচ জাতীয় আঠালো পদার্থে পরিণত হয়, যা গ্রহকে বস্তুপিণ্ডে পরিণত হতে সাহায্য করে। উপাদান হিসাবে সূর্য থেকে দূরত্ব যতো বৃদ্ধি হতে থাকে জল, এমনিয়া, হাইড্রোকার্বণ প্রভৃতি ততো ঘনীভূত হ'তে লাগল। প্রধানতঃ এই সব উপাদানে বৃহস্পতি ও শনি গঠিত। মূল গ্যাসীয় উপাদানে এগুলিই বেশী থাকায় গ্রহদুটি বৃহৎ আকার লাভ করে।

বলয়ের আরো দূরের অংশে স্বভাবতই জল, এমনিয়া প্রভৃতির ভাগ কমে গেল। তাই পরের গ্রহগুলি হাইড্রোকার্বন, মিথেন, নিয়ন প্রভৃতি দিয়ে তৈরি।

গ্যাস বলয়টির দূরে সরে যাবার সময় সূর্যের নিকটবর্তী অংশে যে পদার্থগুলি ঘনীভূত হয়ে তরল, কঠিন পদার্থে পরিণত হতে থাকে তাতে নানা রকম সিলিকেট ও লৌহ থাকা সম্ভব। আর কার্যত বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল এই উপাদানগুলিতে তৈরি। এই সমস্ত উপাদানগুলির শেষাংশে অবস্থিত গ্রহাণুপুঞ্জ।

গ্রহাণুপুঞ্জতে অবস্থিত লৌহপ্রস্তরগুলি, ঘনীভূত ভারী হাইড্রোকার্বনের পিচ জাতীয় বস্তুর কমতির কারণেই একত্রিত হতে পারে নি। সেই উপাদান প্রথম চারটি গ্রহ সৃষ্টিতে নিঃশেষ হয়ে গিয়ে থাকবে।

এই তত্ত্ব গাণিতিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রমাণ কিছু দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং গ্রহাণুপুঞ্জের উৎপত্তির কারণ কৃত্রিম বিস্ফোরণ কিনা সে কথা এককথায় নাকচ করা যায় না। কিন্তু দানিকেন বলেছেন যে বিস্ফোরণের ফলেই ভারসাম্যের অসঙ্গতি ঘটে এবং পৃথিবী কাত হয়ে যায়। এ সিদ্ধান্তটি একটু বিচার ক'রে দেখা যেতে পারে।

গ্রহাণুতে মোট ৪৫,০০০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরো আছে। তার মধ্যে সর্ববৃহৎ যেটি তার ব্যাস হল, ৪৩০ মাইল। অধিকাংশের আয়তনই ১০০ মাইলের কম। সবগুলির একত্রিত আয়তন চাঁদের আয়তনের চেয়েও কম। একত্রিত ব্যাস ২০০০ মাইলও হবে না, ভর পৃথিবীর ভরের আটভাগের এক ভাগেরও কম। গ্রহাণু বলয়টি পৃথিবীর থেকে অন্তত ১২ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। চন্দ্র যেখানে পৃথিবীর টানে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে মাত্র ২$\frac{১}{২}$ লক্ষ মাইল দূর দিয়ে, সেখানে চাঁদের থেকে ছোট একটি বস্তুপিণ্ড ২২ কোটি মাইল দূরে থেকে পৃথিবীকে কাত ক'রে ফেলতে পারে কিনা সেটাই বিবেচ্য।

প্রসঙ্গক্রমে যে তথ্যটি স্মরণ করা দরকার তা হ'ল, পৃথিবীর ২৩'৫ ডিগ্রি কাত হয়ে থাকাটা কেবলমাত্র তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নয়। প্রায় সমস্ত গ্রহগুলিই আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে নিজ অক্ষের উপর কাত হয়ে। মঙ্গলের ক্ষেত্রে এই কোণের পরিমাণ ২৫'২ ডিগ্রি, বৃহস্পতির ৩'১ ডিগ্রি, শনির ২৬'৭ ডিগ্রি, ইউরেনাসের ৯৮ ডিগ্রি, নেপচুনের ক্ষেত্রে ২৯ ডিগ্রি। বুধ, শুক্র ও প্লুটোর ক্ষেত্রে এই হিসাব পাওয়া যায় না। প্রতিটি গ্রহের ক্ষেত্রেই যখন একটি নির্দিষ্ট কোণে কাত হয়ে ঘোরার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, সুতরাং এর কারণেরও একটা সাধারণ উৎস থাকা স্বাভাবিক। দানিকেনের অনুমান মতো গ্রহাণুপুঞ্জ ভেঙে যাবার ফলেই গ্রহগুলি যদি কাত হয়ে থাকে, তবে কিন্তু চাঁদের থেকে ছোট একটি জ্যোতিষ্কের বলবিস্তক প্রভাবকে অত্যধিক বাড়িয়ে দেখাই হবে। সাধারণ গাণিতিক জ্ঞান নিয়েই তার অসম্ভাব্যতা বুঝতে অসুবিধা হবে না, যদি তুলনামূলক ভাবে গ্রহগুলির দূরত্ব ও ভরগুলি লক্ষ্য করা যায়।

	ব্যাস মাইল	সূর্য থেকে দূরত্ব কোটি মাইল	কাত ডিগ্রিতে
গ্রহাণুপুঞ্জ :	১,৮০০	২১,৩০	—
পৃথিবী :	৭,৯২৬	৯,৩০	২৩'৫
মঙ্গল :	৩,২০০	১৪,১৭	২৫'২
বৃহস্পতি :	৮৮,৭০০	৪৮,৪০	৩ ১
শনি :	৭৫,০০০	৮৮,৭০	২৬'৭
ইউরেনাস :	২৯,০০০	১৭৮,৫০	৯৮'০
নেপচুন :	২৭,৭০০	২৭৯,৭০	২৯'০

দানিকেন উত্থাপিত যুক্তির অসারতার কথা বাদ দিলেও পৃথিবীর আপন অক্ষের উপর কাত হয়ে ঘোরার একটি জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যাও আছে।

আকাশের দিকে সোজা আলম্ব রেখার সঙ্গে পৃথিবীর আপন অক্ষরেখা ২৩½ ডিগ্রি কোণ ক'রে আবর্তন করছে এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। বর্তমানে পৃথিবীর অক্ষরেখা উত্তর তারকার দিকে মুখ ক'রে আছে। পৃথিবীর আপন অক্ষের উপর এই ঘূর্ণনকে লাটিমের ঘূর্ণনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। লাটিম নিজের আলোর উপরে ঘোরে আবার ঘুরতে ঘুরতে কাত হয়ে একটা চক্রপথও অতিক্রম করে।

তীর চিহ্নিত সোজা অক্ষের চারধারে লাটিম ঘুরে চলেছে, আবার বৃত্তাকার

পথে তীর চিহ্নিত দিকেও গোটা লাটিমটি চক্র দিচ্ছে। পৃথিবীও তদ্রূপ নিজ অক্ষরেখার উপর ঘুরতে ঘুরতে আবার সরন গতির জন্য একটি বৃত্তাকার পথও অতিক্রম করছে।
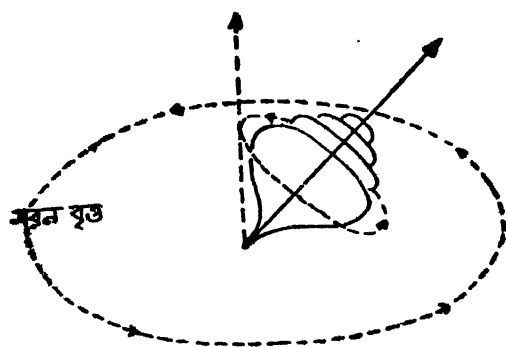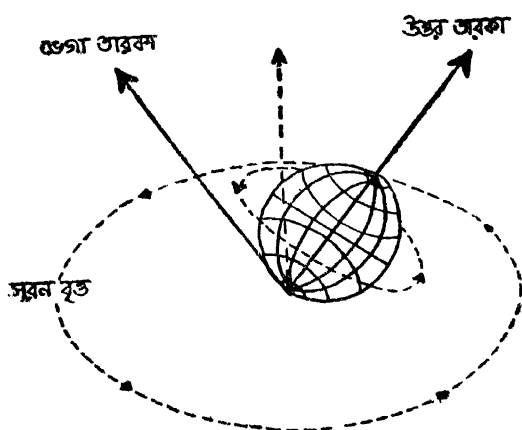
পৃথিবীর ঘূর্ণনের ওপর চাঁদ ও সূর্যের উভয়ের প্রভাব রয়েছে। আপন অক্ষরেখার চারধারে পৃথিবীর ঘুরতে লাগে ২৪ ঘণ্টা। আর তীর চিহ্নিত বৃত্তাকার সরন পথে সম্পূর্ণ ঘুরে আসতে লাগে ২৮ হাজার বছর। সেই হিসাবে এখন থেকে ১৪ হাজার বছর পর পৃথিবীর উত্তরাকাশের সোজা দেখা যাবে ভেগা নক্ষত্রকে। ২৮ হাজার বছর পর পৃথিবী আবার দিক মুখকে ঘুরিয়ে উত্তর তারকার দিকে আসবে। এই হিসাবে পৃথিবীর তিনটি গতি—আহ্নিক গতি, সরন গতি এবং বার্ষিক গতি।

এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে গ্রহানুপুঞ্জকে কৃত্রিম ভাবে ভেঙে

ফেলার ফল হিসাবে পৃথিবীর কাত হয়ে যাওয়া বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা নয়। আর তার সঙ্গে বন্যার যোগাযোগও কেবল অনুমান মাত্র।

এরপরে তৃতীয় সম্ভাবনা থাকে গবেষণার প্রয়োজনে উন্নত কোন গ্রহবাসীর পৃথিবীতে পদার্পণ করা। দানিকেন তেমন সম্ভাবনার কথাও বলেছেন, 'হাজার হাজার বছর পরে তারা ফিরে এসে দেখল এখানে ওখানে ছড়ান কিছু কিছু মানুষের নমুনা।'১(৬০) অন্যত্র বলা হয়েছে, 'অজ্ঞাত কোন প্রাযুক্তিক কারণেই তাদের ফিরে যাবার দিনটি ত্বরান্বিত হয়ে থাকবে।'৪(২৮) উন্নত গ্রহবাসীরা তাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য এখানে আসত। এই আসাটা দানিকেনের সুবিধামতো কখনও ঘন ঘন, কখনো বহু দিন পর পর। কিন্তু কী গবেষণার জন্য আসত, কেন আর আসে না, সে কথা বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু তারা এসেছিল এবং, 'হয়ত বহির্বিশ্ব থেকে আসা মানুষ আমাদের জন্য রেখে গেছে তাদের আগমনের কোন নজির।'৪(৯২)

পৃথিবীকে গবেষণার ক্ষেত্র কেন বানান হ'ল, কোন্ গ্রহ থেকেই বা এই গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে, কতদিন পর পর তারা পৃথিবীতে আসে বা যোগাযোগ করে ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান দানিকেন করেন নি। কেবল অনুমান নির্ভর গবেষণায় তা করাও সম্ভব নয়।

সব থেকে বড় প্রশ্ন হ'ল, আলোচ্য তিনরকম ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যের কোনো একটি উদ্দেশ্যেই কি গ্রহান্তরের প্রাণী এসেছিল? নাকি একই সঙ্গে তিনটি উদ্দেশ্যেই তাদের আগমন হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে ধরতে হয়, একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের প্রাণী পৃথিবীতে পদার্পণ করেছিল। এ প্রশ্নের সমাধান প্রয়োজন এই জন্য যে এর উপর নির্ভর করছে পার্থিব কীর্তির স্বাক্ষর হিসাবে তুলে ধরা উদাহরণ নির্বাচন। কোনো গবেষণাই একই সঙ্গে একাধিক সম্ভাবনার পথ ধরে চলতে পারে না। একাধিক অনুমান দিয়ে শুরু করেও ক্রমশ একটি ধারাপথেই তার উপসংহার টানতে হয়।

চিরকালের জন্য সুপরিকল্পিত ভাবে যদি ভিন্ গ্রহবাসী পৃথিবীতে এসে থাকে তবে তাদের কার্যকলাপের নমুনা যেমন ধরনের হবে, হঠাৎ পলাতকের আগমন ঘটলে তাদের কার্যকলাপের নমুনা তেমন হবে না। আবার দূর থেকে গবেষণার জন্য কারো পদার্পণ ঘটে থাকলে তার কার্যকলাপের নমুনা সম্পূর্ণই ভিন্নতর হবে। দানিকেন উত্থাপিত উদাহরণগুলি যে কোন্ লক্ষ্যের প্রতিফলন তা পরিষ্কার বোঝা যায় না।

শেষোক্ত ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান অসুবিধা হ'ল, সেই নভশ্চরদের বাসস্থান

অবশ্যই সৌরজগতের বাইরে মনে করতেই হবে। কারণ নবগ্রহে প্রাণীর অস্তিত্বের সম্ভাবনা ক্রমশই তিরোহিত হচ্ছে। সুতরাং গবেষণা চালিয়ে যাবার জন্য কাউকে সৌরজগতে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নভশ্চরদের বাসস্থান

কোথা থেকে এসেছিল সেই অজ্ঞাত অতিথিরা তার আলোচনা অপরিহার্য হ'লেও সমাধান এখন পর্যন্ত অসম্ভব। সৌরজগতের অন্য কোন গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণার বোধহয় আর অবকাশ নেই। সূর্যের গ্রহগুলির পরিবেশ পর্যালোচনা ক'রে দেখলে তা বুঝতে সুবিধা হবে।

বুধ : সূর্য থেকে গড় দূরত্ব ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল। ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত পৃথিবীর তাপের সঙ্গে তুলনা ক'রে বুধের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা অনুমান করা যেতে পারে। বুধের একটি দিক সব সময় সূর্যের দিকে মুখ ক'রে আছে। সেদিকের তাপমাত্রা ৪.৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। অপরদিকে হিমশীতল। বুধে কোন অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের প্রমাণ মেলে নি। বুধের পৃষ্ঠদেশ খাতও আগ্নেয় গহ্বরে পরিপূর্ণ। মাধ্যাকর্ষণ এত কম যে আবহমণ্ডল ব'লে কিছু নেই। এই অবস্থায় বুধে কোন প্রাণী থাকা অসম্ভব।

শুক্র : সূর্য থেকে দূরত্ব ৬ কোটি ৭২ লক্ষ মাইল। পৃষ্ঠদেশের উষ্ণতা ৩২৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আবহমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ শতকরা ৯৩-৯৭ ভাগ, নাইট্রোজেন ২.৫ ভাগ, অক্সিজেন শতকরা ০.৪ ভাগ। বায়ুর চাপ পৃথিবীর চাপের ৯০ গুণ। জল যে একেবারে নেই তা নয়। অতীতে বা বর্তমানে সেখানে কোন প্রাণী থাকা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে প্রাণী সৃষ্টির উপযুক্ত আবহাওয়া হতে পারে ব'লে অনুমান করা হয়।

মঙ্গল : একমাত্র সম্ভাব্য সৌরগ্রহ যেখানে পৃথিবীর মতো প্রাণীর অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু সর্বশেষ প্রেরিত মহাকাশযান সে সম্ভাবনার প্রতিকূলতার কথাই প্রমাণ করেছে।

বৃহস্পতি : সূর্য থেকে ৪৮ কোটি ৪০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। পৃষ্ঠদেশের উষ্ণতা শূন্য থেকে ১০৮ ডিগ্রি কম। আবহমণ্ডলে সর্ব-উপরিভাগে আছে এমনিয়া গ্যাস, তারপর আছে হাইড্রোজেন ও মিথেনের মিশ্রণ। এমনিয়া কেলাসাকারে ভেসে বেড়াচ্ছে।

নিম্নভাগে রয়েছে চিরকালীন বরফ।

শনি : সূর্য থেকে দূরত্ব ৮৮ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল। উপরিভাগের উষ্ণতা শূন্য থেকে ১৫৩ ডিগ্রি কম। আবহমণ্ডলে এমনিয়া, হিলিয়াম, মিথেন গ্যাসের প্রাধান্য। এর আবহমণ্ডলের উচ্চতা ১৬০০০ মাইল। ফলে তার চাপও অসম্ভব বেশী। মুক্ত অক্সিজেন নেই, কিন্তু জল বরফ হয়ে আছে সর্বনিম্নস্তরে।

ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো : প্রতিটিতেই হাইড্রোকার্বন, মিথেন, নিয়ন গ্যাসের প্রাধান্য। পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা যথাক্রমে শূন্য ডিগ্রির থেকে ১৮৫ ডিগ্রি ২০০ ডিগ্রি, এবং ২১৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কম। স্বভাবতই এমন অবস্থায় উন্নত প্রাণীর অস্তিত্বের চিন্তা এই সমস্ত গ্রহে অসম্ভব কল্পনা।

কান সৌরগ্রহ থেকে পৃথিবীতে প্রাণীর পদার্পণের সম্ভাবনা নিশ্চিতভাবে ক্রমশই কমে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের সর্বশেষ গবেষণা মঙ্গলে উন্নত প্রাণীর ভাবনাকেও প্রায় তিরোহিত ক'রে দিয়েছে। এখন দানিকেনের প্রকল্পকে ভাবতই তাকাতে হবে সূর্যের বাইরের কোন নক্ষত্রের অনাবিষ্কৃত গ্রহের কে। মানুষের জ্ঞান, সেই গ্রহাদির সম্পর্কে শূন্যের কাছাকাছি। সুতরাং ই অনুমানের কোন প্রমাণ বা বিরোধিতার জায়গা নেই। অবশ্য বৃহস্পতির াছাকাছি, উন্নত প্রাণীর অস্তিত্বসহ একটি গ্রহের আবিষ্কার হবে ব'লে, অন্যের য়ানে, দানিকেন উল্লেখ করেছেন। সে নিয়ে আলোচনা অনাবশ্যক।

প্রসঙ্গক্রমে সূর্যের বাইরে কোন নক্ষত্রের অবস্থান ও পৃথিবী থেকে তার রত্ব সম্পর্কে একটু ধারণা ক'রে দেখা যেতে পারে। তা হ'লে বোঝা যাবে ানুষের উড়ে উড়ে স্বর্গ পাতাল ঘুরে বেড়ানোর কল্পনার মতোই সেই সব ায়গা থেকে প্রাণীর আগমন কত অসম্ভব। অন্তত আজকের মানুষী জ্ঞানে দ সম্পূর্ণই কল্পনার ব্যাপার।

বর্ষাকালে সন্ধ্যারাতে দক্ষিণ দিকে তাকালে আকাশের নীচের দিকে একটি তারামণ্ডল দেখা যায়। সেই তারামণ্ডলের নাম সেণ্টরাস। এটি কালপুরুষের তোই জমকালো তারামণ্ডল। এখানেই রয়েছে আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা আলফা সেণ্টরাই। বিটা সেণ্টরাই এখানকার দ্বিতীয় উজ্জ্বল তারা। মগ্র আকাশে অবশ্য দ্বিতীয় উজ্জ্বল তারা হ'ল লুব্ধক ও অগস্ত্য। আলফা সেণ্টরাই-এর অনতিদূরে একটি অনুজ্জ্বল তারা রয়েছে, নাম "প্রক্সিমা সেণ্টরাই। পৃথিবী থেকে, সূর্য বাদ দিলে, এটিই হ'ল সর্বাপেক্ষা নিকটতম তারা, যার

দূরত্ব হ'ল ২৫০০,০০০,০০০,০০০০ মাইল [পঁচিশ লক্ষ কোটি মাইল]। এই তারকার যদি কোন গ্রহ থাকে, যা উন্নত প্রাণীর বাসোপযোগী, তবে সেখান থেকে সেই উন্নত প্রাণীকে পৃথিবীতে আসতে হবে এই বিশাল দূরত্ব পার হয়ে। আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান এই বিশাল দূরত্ব পার হবার কথা চিন্তাতেই আনতে পারে না। প্রাক্সিমা সেণ্টরাই থেকে আলো আসতে লাগে ৪.২ বৎসর। এমন তারাও এ পর্যন্ত জানা গিয়েছে, যেখান থেকে আলো আসতেই লাগে কোটি কোটি বৎসর। অর্থাৎ তার মাইলে দূরত্ব দাঁড়াবে ১৮৬,০০০ মাইল × ৬০ × ৬০ × ২৪ × ৩৬৫ × কোটি কোটি। গ্রহ হিসাবে পৃথিবীর আয়ুষ্কালেরও অনেক বেশী সময় লাগবে সেই সব তারা থেকে আলো আসতে।

সৌরমণ্ডলের বাইরের কোন তারকার গ্রহ থেকে প্রাণীকে পৃথিবীতে আসতে গেলে কী বেগে এবং কী পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে তার একটা কাল্পনিক চিত্র উপস্থিত করা যেতে পারে। ভ্রমণটিকে কাল্পনিক ধরলেও মাপজোগ, দূরত্ব কিন্তু হবে একেবারে বিজ্ঞানসম্মত। দানিকেন যখন বলছেন, সেই অজানা দূর মহাকাশচারীরা পৃথিবীতে গবেষণা করতে আসত এবং আবার ফিরে যেত, তখন ব্যাপারটা শুনতে কিছুমাত্র অবিশ্বাস্য মনে হয় না। কিন্তু কল্পনার মূলে যে বিন্দুমাত্র বাস্তব ভিত্তি নেই সেটা এই কাল্পনিক ভ্রমণের বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা থেকে পরিষ্কার হতে পারে।

কোন স্থিরভর সম্পন্ন বস্তুর পক্ষে আলোর গতিতে পৌছান আইনস্টাইনীয় বিজ্ঞানের ধারণায় অসম্ভব। সুতরাং তার চেয়ে অধিক গতি এই বস্তু জগতের ক্ষেত্রে কখনই সম্ভাপর নয়। তবুও ধরে নেওয়া গেল, আলোর সমান গতি সম্পন্ন মহাকাশযানে ক'রে পৃথিবী থেকে মহাকাশ ভ্রমণে বেরোন হ'ল—

এই মহাকাশযান চাঁদে পৌছাবে দেড় সেকেণ্ড পর। সেখানে স্টপেজ না দিয়ে সূর্যে পৌছাতে লাগবে আটমিনিট। এর মধ্যে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল পার হওয়া গিয়েছে। সৌরজগতের কেন্দ্র এক মুহূর্ত দেখে সোজা বেড়িয়ে গেলে পাঁচ ঘণ্টার কিছু বাদে প্লুটোতে পৌছান যাবে। এত দূরের গ্রহ একটু দেখবার লোভ আছে বৈকি? কিন্তু পথ অনন্ত সুতরাং এগিয়ে যেতেই হবে। তারপর বিরাট পথ জুড়ে কোন বস্তুপিণ্ডের সাক্ষাৎ মিলবে না, ৪ বৎসর ২$\frac{১}{২}$ মাস ধরে, যখন পৌছান যাবে প্রক্সিমা সেণ্টরাই-এ। আবার চলতে থাকলে লুব্ধকে যেতে গেলে যাবে আরো ৪$\frac{১}{২}$ বৎসর। পৃথিবী থেকে ইতিমধ্যে কেটে গেছে ৮ বছর ৭ মাসের মতো। এইভাবে ভ্রমণ পথে ধ্রুবতারায় যেতে লাগবে ৪৪ বৎসর,

কৃত্তিকায় যেতে লাগবে ১৩৫ বৎসর। আমরা যে ছায়াপথে আছি তার শেষপ্রান্তে পৌছাতে লাগবে ৬০,০০০ বছর।

এই ছায়াপথ ছেড়ে যদি অন্য ছায়াপথে পৌছাতে হয় তাহলে পার হতে হবে মাঝখানের অনন্ত বিস্তার এক মহাশূন্য পথ। প্রায় ১৫,০০,০০০ বছর চলার পর পৌছান যাবে পরের নিকটবর্তী নক্ষত্রমণ্ডল এণ্ড্রোমিডাতে। এণ্ড্রোমিডাতে পৌছে সেই নক্ষত্রমণ্ডলটি পার হতেই লাগবে ৮০,০০০ বৎসর। এমনি একের পর এক নক্ষত্রমণ্ডল পার হতে থাকলে, এমন নক্ষত্র জগতের সংখ্যাই দাঁড়াবে ১০,০০০ কোটি। এমনি একটি নক্ষত্রমণ্ডল হ'ল, এপসিলন বোওটিস। দানিকেনের অভিমত, এই নক্ষত্রমণ্ডল থেকেই কোন প্রাণী এ পৃথিবীতে এসেছিল এবং তাদের জ্ঞানভাণ্ডার সম্বলিত কৃত্রিম এক উপগ্রহ তারা রেখে গেছে পৃথিবী আর চাঁদের মাঝামাঝি কোথাও। 'এ ব্যাপারে আমার ব্যাখ্যা হ'ল এই রকম', দানিকেন বলেছেন, 'সঙ্কেতপ্রেরক সেই কৃত্রিম বস্তুটিকেও সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত উপায়ে আমাদের চাঁদের কক্ষপথে নিক্ষেপ করেছিল। আর সেই কেউ ১২,৬০০ বছর আগে নিশ্চয়ই এখানে এই পৃথিবীতে বাস করেছিল।'৪(৯০) মন্তব্য করতে বাধা নেই। ঈশ্বর ও ঐশ্বরিক কল্পনা যেমন কোন প্রমাণ ছাড়াই যেমন খুশী কথা বলা যেতে পারে, সম্ভাবতার ধারে কাছে না গেলেও দানিকেন তেমনি এপসিলন বোওটিস থেকে প্রাণী আগমনের কথা বলেছেন।

কোথা থেকে প্রাণী এসেছিল এ প্রশ্নের উত্তরেও কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত মন্তব্য ছাড়া গবেষণার মতো কোন বিজ্ঞান সম্মত রাস্তা তিনি চিহ্নিত করতে পারেন নি।

নভশ্চরদের আগমনকাল

মানুষের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের পুরানো। সেই সভ্যতার সঙ্গে দূর মহাকাশচারীদের সম্পর্ক স্থাপন করতে হ'লে অবশ্যই তাদের আগমনকালের একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারের মতো এ ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে দানিকেন যখন যেমন প্রয়োজন গ্রহান্তরের প্রাণীকে টেনে এনেছেন। কখনো স্থায়ী বাসিন্দার কাজের স্রষ্টা হিসাবে, কখনো বা হঠাৎ আসা উড়ন্ত প্রাণী হিসাবে।

সময়ের ব্যবধানে দেবতাদের আগমন কালকে বহুরকম ভাবে দেখান হয়েছে। অসংখ্য উদাহরণকে তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে অপ্রত্যক্ষভাবে উল্লিখিত

সময় ধরলে, বলা যেতে পারে ভিন্ন গ্রহবাসীর আগমনকাল প্রাগৈতিহাসিক এব বিরাট সময় জুড়ে ঘটেছিল বারবার। দেবতাদের আগমনের কালকে সুনির্দি ভাবেও বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে বেশ কয়েকবার।

৫৯২ খৃঃ পূর্বাব্দ : 'ওল্ড টেস্টামেণ্টের পণ্ডিতদের যদি বিশ্বাস করতে পারা যায় তাহ'লে বলা যায় ৫৯২ খৃষ্ট পূর্বাব্দে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছিল এবং পয়গম্বর ইজেকিয়েল তার একটা চমৎকার বর্ণনাও রেখে গেছেন।' ৪(.৫ ঘটনাটি হ'ল, 'পয়গম্বর ইজেকিয়েল একটি মহাকাশযানকে নামতে দেখেছিলে এবং তাঁর বর্ণনা দিয়েছিলেন।'৪(১৭)

৫৯২ খৃঃ পূর্বাব্দ কালের বিচারে খুবই নিকট অতীত। দানিকেন যে সমস্ত তথ্য উত্থাপন করেছেন তাকে ঐ সময়ে নামা কোন মহাকাশ যাত্রীর কাজ বলে ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব। বহুপুরাণ ও গ্রহচিত্র এই সময়ের অনেক পূর্বে রচিত হয়েছে—এমন কি অনেক স্থাপত্যের প্রতিষ্ঠাকালও এর অনেক আগের।

৭০০০ খৃঃ পূর্বাব্দ : মানুষ সৃষ্টির পরীক্ষায় 'দ্বিতীয় পরিব্যক্তি ঘটিয়েছিল আরো কাছাকাছি কোন সময়ে, সম্ভবতঃ খৃঃ পূর্ব ৭০০০ থেকে ৩৫০০ বছর নাগাদ।' ২(৩৫)

১২,৫০০ খৃঃ পূর্বাব্দ : 'সঙ্কেতপ্রেরক সেই কৃত্রিম বস্তুটিকে কেউ সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত উপায়ে আমাদের চাঁদের কক্ষপথে নিক্ষেপ করেছিল. আর সেই 'কেউ' ১২৬০০ বছর আগে নিশ্চয়ই এখানে এই পৃথিবীতে বাস করেছিল।' ৪(৯৫)

৪০,০০০ খৃঃ পূর্বাব্দ : 'অজানা বুদ্ধিমান জীবদের দ্বারা সুপরিকল্পিতভাবে আদিম মানুষের কৃত্রিম পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল, তা হ'লে দেবতা জেনেটিক কোডকে কাজে লাগিয়ে প্রথম কৃত্রিম পরিব্যক্তি ঘটিয়েছিল খৃঃ পূর্বাব্দ ৪০,০০০ থেকে ২০,০০০ বছর আগে।' ২(৩৫)

১৫০,০০,০০০ খৃঃ পূর্বাব্দ : 'নেভেডার ফিসার ক্যানিয়নে কয়লার একটা স্তরে জুতোর একটা ছাপ পাওয়া গেছে।...সে ছাপ এত পরিষ্কার যে জুতোর তলায় শক্ত সুতোর ছাপও পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। হিসাব করে বলা হয়েছে জুতোর সে ছাপের বয়স ১,০০,০০,০০০ বছর।...তা হ'লে সে ছাপ কার জুতোর?...যে জীবেরা জানতো পদযুগলকে রক্ষে করার পক্ষে পাদুকাই শ্রেষ্ঠ উপযোগী আবরণ সেই জীবেরাই পৃথিবীর মাটি মাড়িয়েছিল লক্ষ লক্ষ বছর আগে।' ৩(১৪৭)

৩৫০,০০,০০০ খৃঃ পূর্বাব্দ : 'পৃথিবীতে (আর সেই সঙ্গে সম্ভবতঃ অন্য সৌরজগতের গ্রহেও) নানা মহাকাশযানে আগত অতিথিরা জীবনের বীজ ছড়িয়ে গেছে সুচিন্তিতভাবে।' (৬-২১৫)

আধুনিক মানুষ অর্থাৎ হোমো সাপিয়েন আবির্ভাবের আগেই মানে অনেক আগেই দেবতার আবির্ভাবের কথা এখানে বলা হয়েছে। কিন্তু একথা বলা হয়নি, দেবতারা কতদিন ধরে ছিল। কিংবা বিভিন্ন কারণে কতবার কোন কোন সময় দেবতারা এসে থাকবে?

সাল তারিখ ঠিকমতো যখন দেওয়া সম্ভব হয় নি তখন বলা হয়েছে, 'এ সাল তারিখকে ঠিক বলে মেনে নিলে বলতে হয়, দেবতাদের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল সেই যখন প্রথম চিত্রকলা এবং পাথরে খোদাই নারীমূর্তির আবির্ভাব হয় তার কিছু আগেই।' ২(৩৫)

সাল তারিখের এই বহর থেকে দানিকেনের গবেষণার কোন দিক-নির্দেশ পাওয়া সম্ভব কি? কী উদ্দেশ্যে, কি ভাবে কোথা থেকে এবং কবে নাগাদ সেই রহস্যময় প্রাণীদের আগমন ঘটেছিল তার যদি মোটামুটি ধারণাও না করা সম্ভব হয় তবে কী ভাবে উদাহরণ ও তথ্যকে মেলান যেতে পারে? মানুষের আবির্ভাবের আগে যার আগমন তার পক্ষে পিরামিডের প্রাযুক্তিক কৌশল প্রয়োগ করার কথাই আসে না। আবার ইজেকিয়েল যাদের দেখেছে তারা জেনেটিক কোড পরিবর্তন ক'রে বানর থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না। সময়ের এই গরমিল দিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক কীর্তির ব্যাখ্যা আবার মানুষ সৃষ্টিরও ব্যাখ্যা একইভাবে কী করে দেওয়া সম্ভব? যে প্রাণী একবারই পৃথিবীতে আসবে এবং এখানেই বসবাস করবে তার সম্পর্কে মানুষের যেমন ধারণা হবে, তাদের সাহচর্যে যা সৃষ্টি করা হবে তার সঙ্গে গবেষণার স্বার্থে হঠাৎ আসা প্রাণীর কার্যকলাপের মিল থাকা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে দু'টি ব্যাপারকে পাশাপাশি নানা সময়ে নানাভাবে তুলে ধরা শেষ বিচারে গোজামিলেরই নামান্তরও হয়ে দাঁড়ায়।

নভশ্চরদের পার্থিব কীর্তি

ইতিপূর্বে আলোচিত তিনটি বিষয় অর্থাৎ কী উদ্দেশ্যে এসেছিল সেই নভশ্চরেরা—পালিয়ে, বসবাসের জন্য পরিকল্পনা মাফিক, না নিছক গবেষণার উদ্দেশ্যে; কোথা থেকে এসেছিল তারা—সৌরমণ্ডলের কোন গ্রহ থেকে, না অন্য কোন তারকা বা ছায়াপথ থেকে; কবে ঘটেছিল তাদের আবির্ভাব;

মানব সভ্যতার প্রত্যূষে, এই সমস্ত বিষয় ঠিকমতো আলোচিত না হ'লে, এসে তারা কী জাতীয় কীর্তি করেছিল তার বিচার সম্ভব নয়। দানিকেনের যুক্তি তাই এলোমেলোভাবে পথ হাতড়ে বেড়িয়েছে। পথ হাতড়ে বেড়িয়ে চলতে চলতে একটা দিক-নির্দেশ পাওয়া যেতে পারে অনেক সময়। কিন্তু সেই দিক-নির্দেশ মতো চলার পরেই কেবল সভ্যতা দাবি করা যেতে পারে। দানিকেন তা করেন নি। হাতড়ে বেড়িয়ে চলতে চলতে দিক-নির্দেশ কিছু খুঁজে পান নি সে পথ ধরে চলা তো দূরস্থান। আলোচ্য তিনটি বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করে উঠতে না পারার ফলে নভশ্চরদের কার্যকলাপ বলে যে সব বক্তব্য তুলে ধরেছেন সেগুলিও এলোমেলো পথে যুক্তি হারিয়ে ফেলেছে। যেহেতু ঐ বিষয়গুলিকে সমাধানের চেষ্টা করা হয় নি, সেই হেতু একই কার্যকলাপের ব্যাখ্যাও কোথাও কোথাও পরস্পর-বিরোধী, অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিমূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রসঙ্গে নভশ্চরদের কয়েকটি কাজের আলোচনা করা যেতে পারে।

প্লাবন ঃ গ্রহান্তরের উন্নত জীবদের গবেগণার কাজ হিসেবে প্লাবনকে দেখে দানিকেন মন্তব্য করেছেন, 'মহাপ্লাবন সেই অজ্ঞাত জীবদের পূর্ব-পরিকল্পিত এবং কয়েকটি বাছা বাছা ভাল মানুষ বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত মানব জাতিকে নির্মূল করে দেয়া। মহাপ্লাবনের গতিপথ ইতিহাস সম্মত বলে স্বীকৃত হয়েছে এবং তা সুনিশ্চিত সুপরিকল্পিত এবং সুগঠিত আর সেই শত শত বছর আগে প্লাবনের অনতিপূর্বে নোয়াকে দেওয়া নির্দেশ থেকে কিছুতেই জানতে পারছি না, এ আমাদের শাস্ত্র সম্মত ঈশ্বরের নির্দেশ।' ১(৫২) এখানে তিনি প্লাবনের মধ্যে সুপরিকল্পনার সন্ধান পেয়েছেন। অন্যত্র আবার বলেছেন, 'পঞ্চম গ্রহের বিলয়ের পর আমাদের সূর্যমণ্ডলের ভারসাম্য বিস্রস্ত হয়ে পড়ল সাময়িকভাবে, পৃথিবীর মেরুরেখা অল্প কয়েক ডিগ্রি সরে গেল। তারই ফলে ঘটল প্লাবন (সারা পৃথিবীর কাহিনী কিংবদন্তী পুরাণে গাঁথা রয়েছে সে মহাপ্লাবনের কত কথা, কত বিবরণ।)' ৩(১৫৮) এখানে ব্যক্ত হয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের নিতান্তই আকস্মিক ফল হিসাবে বন্যার প্রাদুর্ভাবের কথা। কাহিনী কিংবদন্তীর কোন ব্যাখ্যাটা ধরে তা হ'লে এগোতে হবে? ইতিহাস কিন্তু বন্যার প্রাদুর্ভাবের প্রাকৃতিক কারণের অনেক স্বাক্ষরই রেখেছে।

প্রাচীন প্রায় সমস্ত সভ্যতাই নদীতীরে বা সমুদ্র থেকে অনতিদূরে অবস্থিত। টাইগ্রিস ইউফ্রেটিসের অনতিদূরে গড়ে ওঠা মেসোপটেমিয়া সভ্যতা

নদীর সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। টাইগ্রিস, ইউক্রেটিস এর জলো-চ্ছ্বাসের ফলে জমে যাওয়া পলিমাটির নীচে ও ওপরে খনন কার্যের ফলে ঐতিহাসিকেরা আবিষ্কার করেছেন ভিন্ন ভিন্ন সময় জুড়ে সভ্যতার নিদর্শন। বাইবেলের প্লাবনের কাহিনীর উৎস এই অঞ্চল। ফোনেসিয়ান ও হিব্রুদের অঞ্চলের একদিকে টাইগ্রিস ইউক্রেটিস অন্যদিকে ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণ পশ্চিমে নীল নদী।

বাইবেলভূমি

মিশরের সভ্যতার পুরো অঞ্চলটাই তো ভয়ঙ্কর নীল নদীর দুই তীর জুড়ে
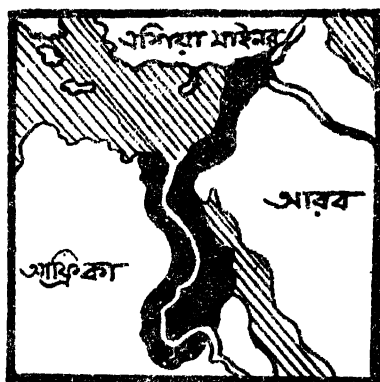
মিশর

পারস্যের বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল টাইগ্রিস-ইউক্রেটিস-ভূমধ্যসাগর-কৃষ্ণসাগর-কাস্পিয়ান সাগর-পারস্য উপসাগরের বিস্তীর্ণ মধ্যবর্তী অঞ্চল নিয়ে। মেসোপটেমিয়া তো দুই নদীরই অবদান।

মেসোপটেমিয়া

ক্রিট দ্বীপ ও প্রাচীন গ্রীস যে সভ্যতা গড়ে তুলেছিল তা ছিল ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল জুড়ে।
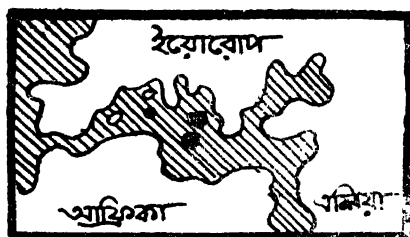
ইন্‌কাদের সভ্যতা ছিল দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম সমুদ্র তীর

ইন্‌কারাজ্য

আজটেক ও মায়াদের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল আমেরিকার এক সরু স্থলভাগের উপর যার একপাশে প্রশান্ত মহাসাগর আর অন্যদিকে আটলান্টিক মহাসাগর। সর্বপ্রাচীন মানব বসতি ছিল আফ্রিকার বুডলফ এবং ভিক্টোরিয়া

মায়া আজটেক রাজ্য

হ্রদের তীরে। সিন্ধুসভ্যতা সিন্ধু নদীর তীরে। এ সব কিছু থেকে প্রাকৃতিক কারণে বন্যাকে এই সমস্ত অঞ্চলে ঘটতে দেখার সম্ভাব্যতা নিয়ে কোন সংশয় থাকে না। সমুদ্র জলোচ্ছ্বাস এবং নদীর জলস্রোত যে কী ভয়ানক প্লাবন সৃষ্টি করতে পারে তা প্রতিটি দেশের মানুষদের অভিজ্ঞতায় অতীতে দেখা দেওয়া ছিল অতি সাধারণ কথা। এই সেদিন বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি দ্বীপে ২০।২৫ ফুট উঁচু সমুদ্র জলোচ্ছ্বাস সমস্ত অঞ্চলকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়—অন্ধ্রের বন্যার অভিজ্ঞতা বিংশ শতাব্দীর শেষেও ছিল কী মারাত্মক। পুরাণ কাহিনীতে বন্যার উল্লেখের এই ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে বর্জন করে দানিকেন হাতড়ে বেড়িয়েছেন গ্রহান্তরের কারণ।

নাজকার চিত্র ঃ পেরুর নাজকাতে আঁকা আছে বিচিত্র ধরনের ছবি। 'নাজকার ঐ রেখাগুলি কী কাজে লাগত?' ১(২৭) প্রশ্ন তুলে লেখক দানিকেনই আবার উত্তর দিয়েছেন, 'আমার ধারণা ওগুলো বোধ হয় ছোট ছোট একটা নকশা থেকে একটা বিশেষ স্থানাঙ্ক পদ্ধতিতে টানা হয়েছে কোন বিমান থেকে দেওয়া নির্দেশ মতো।'১(২৮) একই ধারণা ব্যক্ত করে বলা হয়েছে, 'তাদের কি খুব একটা উঁচুদরের জরিপ কৌশল আয়ত্ত ছিল? তারই সাহায্যে তারা একটা ছোট আদরা থেকে অমন বিরাট নকশা এঁকেছে অমন নিঁখুত নিপুণ করে।'২(৯৪) লক্ষ্য করবার বিষয় হ'ল দানিকেনের ধারণা মতো যদি ওগুলো স্থানাঙ্ক পদ্ধতিতে ছোটকে বড় করে আঁকা হয়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই ঐ ছবিগুলির মান খুব উঁচু স্তরের। অথচ একই ছবি সম্পর্কে তিনি অন্যত্র বলেছেন, 'একটা যোগানদার বিমান, কক্ষে পরিভ্রমণরত নিয়ন্ত্রক মূল যান ছেড়ে নেবে এল আমাদের গ্রহে। নাবল নাজকার এই সমতল ভূমির উপর। তার অবতরণের একটা দীর্ঘ পথরেখার ছাপ অঙ্কিত হয়ে গেল সেখানে যেমন ছাপ পড়ে 'স্কী' খেলোয়াড়দের খেলার খেলার সময়

বরফের ওপরে। সে বিমান যখন ফিরে গেল তখন আরো একটা পথরেখা অঙ্কিত হ'ল সে সমতলভূমিতে। তারপরেই এল কৌতূহলী আদিবাসীর দল। দেখতে লাগল, দেবতারা যেখানে নেবেছিল কী চিহ্ন রেখে গেছে তারা সেখানে। রেখা দেখে নতুন রেখা টানতে লাগল তারা স্বর্গীয় দূতদের ফিরে আসার আশায়। গভীরতর করতে লাগল পুরানো রেখাবলীকে। আমার ধারণা নাজকার রেখাপুঞ্জের জন্ম এমনিভাবেই। দেবতারা তবু দেখা দিলেন না। প্রধান পুরোহিতের মগজে আরো ভালো একটা মতলব খেলে গেল।...তিনি ভাবলেন, বলির কিছু চিহ্ন দেখাতে হবে। তার লোকদের বললেন পাখি, মাছ, বাঁদর মাকড়সা ইত্যাদি উৎকীর্ণ করতে খুব বৃহৎ আকারে, যাতে দূর মহাকাশ থেকেও দেখা যায়। নাজকার বিমান বন্দরের উৎপত্তি আমার মতে, এমনি করে।'৪(৮৩) একই সঙ্গে একটি জিনিসকে দেখছেন নির্ভুল জ্যামিতিক অঙ্কন হিসাবে, আবার আদিম মানুষের অদক্ষ হাতের কাজ হিসাবে। কেবল ধারণার উপর দাঁড়িয়ে মন্তব্য করার এই হ'ল পরিণাম।

যন্ত্র কৌশল : ইন্দ্রজালিক ক্ষমতাসম্পন্ন দানিকেনের দেবতারা পৃথিবীতে এসে যে স্বাক্ষর রেখে গেছে তা সবই পাথরের স্থাপত্য বলে মনে না করে উপায় নেই। কোন উন্নত জ্যামিতিক অঙ্কন, ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং, গাণিতিক ফর্মুলা, রাসায়নিক সঙ্কেত বা অত্যাশ্চর্য যন্ত্রপাতির ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়নি দানিকেনের সংগ্রহতে। বর্তমান মানব সভ্যতার চোখ দিয়ে দেখেছেন ব'লে প্রাগৈতিহাসিক ছবিগুলি থেকে তিনি সেই অতিথিদের রথ ও তাদের কার্যকলাপের স্বাক্ষর সব কিছু বর্তমান মানব প্রাযুক্তিক গঠনের সঙ্গে মেলাতে চেয়েছেন। ছায়াপথ অতিক্রম করার প্রাযুক্তিক কৌশলকে বর্তমানের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সঙ্গে তুলনা করা আর বেলুনের সঙ্গে কৃত্রিম উপগ্রহের তুলনা করা একই কথা। কার্যতঃ তেমন কোন উন্নত যন্ত্রাংশ, তার বর্ণনা, ছবি আমাদের জ্ঞানে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। দানিকেন তেমন অত্যুন্নত কোন কিছু কল্পনায় আনতে না পেরে বর্তমানের বৈজ্ঞানিক ধারণার মানেই সব কিছু বিচার করতে গিয়েছেন। সেই ধরনের উন্নতিকে দানিকেন যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বালসুলভ যুক্তি উপস্থিত করেছেন, 'আমি বলতে চাইছি প্রয়োগবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবস্তুর কাঠামো সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর হয়ে আসে। অত্যুন্নত শিল্প সমৃদ্ধ বহির্জাগতিক জীবদের যন্ত্রপাতিকে যে কোদাল, গাঁইতি, বুলডোজারের যা সইবার মতো বড় এবং দড় হতেই হবে এমন কোন কথা

নেই। তা হ'লে কি মূঢ়ের মতো বেখেয়ালে অমূল্য সব শিল্প সম্পদ মাড়িয়ে গুড়িয়ে নষ্ট করে চলেছি?' ৪(৪৭) অত্যুন্নত প্রাযুক্তিক কৌশল যন্ত্রকে সূক্ষ্ম করতে পারে, কিন্তু আকারে ছোট করতে পারে কি? দুই একটি নির্দিষ্ট ইউনিটের পক্ষে আকার হ্রাস ঘটনা হলেও জটিলতা ও প্রয়োজন বোধে গবেষণার জন্য যন্ত্রপাতি উৎপাদনের যন্ত্রপাতি বিরাট থেকে বিরাটতর হওয়াই তো শিল্পবিকাশের পরিণাম হিসাবে সর্বত্র দেখা যাচ্ছে।

অনেক যন্ত্রই আকারে ছোট হয়েছে—গ্রামোফোন, রেডিও, টেলিফোন, এয়ারকুলার, পাম্পসেট প্রভৃতি। কিন্তু প্রাযুক্তিক জ্ঞানকে এই পর্যায়ে আনতে, এগুলি তৈরীর জন্য বিরাট বিরাট যান্ত্রিক কৌশল স্থাপন করতে হয়েছে। বিজ্ঞানের সর্বাত্মক উন্নতি কি ছোট ছোট যন্ত্রপাতির কারখানাই সৃষ্টি করে চলেছে? দানিকেন নাসার কার্যকলাপের প্রচুর বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু নাসার কাণ্ডকারখানার বিরাটত্ব কি তাঁর চোখে পড়ে নি? যন্ত্রপাতির এই বিরাটত্ব কি বিজ্ঞানের উন্নতির ধাপে ধাপে ক্রমাগত বেড়েই চলছে না? কোদাল গাঁইতি দিয়ে কিছু যন্ত্রাংশ নষ্ট করে ফেলা সম্ভব, কিন্তু মহাজাগতিক প্রাযুক্তিক কার্যকলাপ চালানোর মতো বিরাট কাণ্ডকারখানার অবশেষও কোদাল গাঁইতিতে কীভাবে নষ্ট করা সম্ভব?

এ কথা মনে হতেই পারে যে মহাজাগতিক সেই রহস্যময় প্রাণী মূল যন্ত্রপাতির উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করেছিল নিজেদের গ্রহে আর এখানে বয়ে এনেছিল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্র। কিন্তু মানুষকে নিয়ে গবেষণা করা, বন্যা সৃষ্টি করা, আণবিক বিস্ফোরণ ঘটান প্রভৃতি সবই পৃথিবীতে করা হয়েছে বলে দানিকেন দাবি করেছেন। তা করতে গেলে তো সঙ্গে আনা একটি দুটি সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে সম্ভব নয়। আর যারা চিরকালের জন্য এখানে এসে গবেষণা চালিয়েছে তাদের তো ওগুলো উৎপাদনও করতে হয়েছে পৃথিবীতে। তেমন কাজের প্রমাণও তিনি দিয়েছেন তিআহুআনাকোর জলনিকাশী পাইপকে কেব্‌ল বহনকারী অপরিবাহী মোড়ক বলে। 'ওগুলো কি উচ্চশক্তিবাহী তার নিয়ে যাবার প্রয়োজনে গড়া।' একথা বলার দ্বারা এটাই প্রতিপন্ন হয় যে কোদাল গাঁইতির আঘাতে নষ্ট হবার মতো যন্ত্রের জন্য অত বিরাটাকার কেব্‌ল ব্যবহৃত হয় নি। সেই জন্যই তিনিও মন্তব্য করেছেন, 'বহির্বিশ্বে তৈরি কোন যন্ত্রপাতি যে আজো কোথাও পাওয়া যায় নি একথা আমার অজ্ঞাত নয়।'৪(৪৬)

বৈজ্ঞানিক যন্ত্র যে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিরাটত্বের দিকেই এগিয়ে

চলে তার দুটি উদাহরণ প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দু'টি যন্ত্রই মহাকাশ গবেষণা ও শক্তির রাজ্যে অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। সেই পথে এগোতে গেলে এই যন্ত্রদুটির ক্রমোন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

প্রথমটি হ'ল দূরবীন। গ্যালিলিও যে দূরবীন আবিষ্কার করেন তার আকার আয়তন ওজন এর সঙ্গে আজকের ব্যবহৃত দূরবীনের কোন তুলনাই চলে না। নিউটন দূরবীনের যে উন্নতি ঘটান তার থেকে বিংশ শতাব্দীর উন্নতি বিরাটত্বে ও জটিলতার প্রশ্নে বহুদূর এগিয়ে এসেছে।

কালিফোর্নিয়ার প্যালোমার পর্বতের মানমন্দিরে স্থাপিত দূরবীনের নাম, 'হেলে রিফ্লেক্টর'। তার ওজন ১৪.৫ টন। এর দর্পণটির ব্যাস ২০০ ইঞ্চি। এটি জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানকার ছবি তোলার জন্য ব্যবহৃত ক্যামেরাটির নাম স্মিড ক্যামেরা। তার ওজন ৩৬ টন। ২৪ ফুট লম্বা তার নল। এর দর্পণটির ব্যাস ৭২ ইঞ্চি। মোটরের সাহায্যে তাকে ঘোরান হয়।

ইংলণ্ডে আছে একটি বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র। এর এ্যাণ্টেনার মুখের ব্যাস ২৫০ ফুট। ১০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের তারকার বেতার তরঙ্গ এতে ধরা পড়ে। কোনো ধরনের উন্নতিই এই সমস্ত ক্ষেত্রে ছোটর দিকে গতি চিহ্নিত করে না।

দ্বিতীয়টি হ'ল সাইক্লোট্রন যন্ত্র। ১৯৩২ সনে বৈজ্ঞানিক লরেন্স যখন এটি আবিষ্কার করেন তখন তা ছিল গবেষণাগারের ভিতরের একটি যন্ত্র মাত্র। তারপর এর উন্নতি হয়ে নানা নামে পরিচিতি ঘটে, যেমন এ. ভি. এফ. সাইক্লোট্রোন, ভেরিএবল এনার্জি সাইক্লোট্রন, স্পাইরাল রিজ সাইক্লোট্রোন। সাধারণভাবে সবগুলিকে একসিলারেটর বলে। বিভিন্ন দেশে সেই গবেষণার যন্ত্র নিজেই এক একটি গবেষণাগারে পরিণত হয়েছে।

মস্কোর সারপুকভে যে ৭০ জি. ই. ভি একসিলরেটর আছে তার তড়িৎ চুম্বকের ওজন ২০,০০০ টন। যে বৃত্তাকার পথে প্রোটন ত্বরিত হয় তার ব্যাস ৫০০ মিটার। আমেরিকায় যে ২০০ জি. ই. ভি যন্ত্র তৈরি হচ্ছে তার ব্যাস হবে ৩ কিলোমিটার। রাশিয়ায় ১০০০ জি. ই. ভি একটি একসিলরেটর তৈরি হচ্ছে। তার ব্যাস হবে ৬ কিলোমিটার। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে বিজ্ঞানের উন্নতি যান্ত্রিক বিকাশকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে।

রহস্যময় উন্নত জীবেরা পৃথিবীতে এসে বহু কাজ করেছে। দানিকেনের মতে, মানব ইতিহাসের প্রায় সব কিছুরই সূত্রপাত তাদের হাতে। মানুষ নিজে কিছুই শেখে নি। দানিকেনের প্রশ্ন, 'কিন্তু আদিম মানুষ তার সম্প্রদায়ের ভেতর কবে চালু করেছিল নৈতিক মান, সেই কথাটাই আমার প্রধান জিজ্ঞাস্য। কর্তব্য, প্রেম, প্রীতি, সৌহার্দ ইত্যাদি হৃদয়বৃত্তি কিসের প্রভাবে আদিম মানুষ শিখেছিল? কে সঞ্চার করল তার মনে ভক্তিভাব? যৌনমিলনে লজ্জা সে কেন পেল? কে ঢোকাল তার মনে সে লজ্জা? বর্বর পশু হঠাৎ কেন তার দেহ আবরিত করল, তারই বা ভাল ব্যাখ্যা কোথায়?' দানিকেনই উত্তর দিয়েছেন, 'আমার অনুমান এ ঘটনা সম্ভব হয়েছে অজানা বুদ্ধিমান জীবের দ্বারা আদিম মানুষের জেনেটিক কোডের কৃত্রিমভাবে পরিবর্তন ঘটিয়ে।'২(২৪) এমনি করেই নতুন মানুষ হঠাৎ পেয়েছে কর্মশক্তি, পেয়েছে বোধ, বুদ্ধি, স্মৃতি; আর সেই সঙ্গে জেগেছে কারুশিল্পে আর প্রযুক্তিবিদ্যায় তার আগ্রহ।'২(৩৩) এ সবই সম্ভব হয়েছে তাঁর মতে, 'দেবতারা তাদের পড়তে শিখিয়েছিলেন, শিখিয়েছিলেন লিখতে চাষ-আবাদ করতে।'৩(১০৩) দেবতারা যে আদিম মানুষকে লেখাপড়া শিখিয়েছিল সে কথা নানাভাবে বহু জায়গায় বলা হয়েছে পাঁচটি গ্রন্থ জুড়ে। কখনো সরাসরিও, 'বিমানের অধিনায়কের আদেশে এ সব তথ্য হুবহু লিখে নিয়েছিলেন পিতা এনক দূর উত্তর পুরুষের প্রয়োজনে।'৪(২৬) প্রশ্নটা হ'ল সেই ভাষা তা হ'লে কেমন ছিল?

ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে তেমন কোন ভাষার সন্ধান পাওয়া যায় কি যা অপঠিত হ'লেও আজকের থেকেও উন্নত কোন ভাষার গতি প্রকৃতির ধারক বলে মনে করা যেতে পারে? পেরুর অধিবাসী ও রেড ইণ্ডিয়ানদের মাঝে দানিকেনের দেবতারা এসেছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সেই সমস্ত জায়গার অধিবাসীদের মধ্যে দড়িতে গিঁট বেঁধে ঘটনা বা কোন বিষয়কে ধরে রাখার গ্রন্থিলিখন পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়। ইজেকিয়েলের সাথে ভাব বিনিময় হয়েছিল যে অঞ্চলে সেই মেসোপটেমিয়ার লিপি সর্বপ্রাচীন লিপির নিদর্শন হ'লেও তার ভাষা ছিল অনুন্নত ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন।

লিপি বিকাশের ইতিহাস, দেখা যায়, দু'ভাবে ঘটেছে। চিত্রলিপি (Pictogram) ও ভাবলিপি (Ideogram) দিয়ে। কোন বস্তুকে বোঝাতে

হ'লে তার সম্পূর্ণ ছবি না দিয়ে রেখাচিত্র দেওয়া হ'ত। রেখাচিত্র দিয়ে ভাবও বোঝান হ'ত। যেমন রাত্রি বোঝাতে অর্ধবৃত্তের নীচে তারার ব্যবহার। মেক্সিকোতে এই লিপির প্রচলন ছিল। মায়াদের লিপিও এই জাতীয়। তারপর এল শব্দ লিপি (Phonogram) অর্থাৎ রেখালিপি দিয়ে একটি শব্দকে বোঝান। চীনালিপিতে ক্রমশ চিত্রলিপি, ভাবলিপি ও শব্দলিপির মিশ্রণ ঘটেছে। মিশরের চিত্র—প্রতীকলিপিও (Hieroglyph) এই পর্যায়ের। যেমন মিশরীয় ভাষায় খেস অর্থ আটকান, তেব অর্থ শূকর। খেসতেব অর্থ হ'ল নীলা। নীলাকে বোঝাতে হ'লে লিপি আঁকা হ'ত শূকরের লেজ ধরে টানারত ছবি। এরপর লিপির প্রশ্নে দেখা দেয় শব্দের সমগ্র ধ্বনিটি না বুঝিয়ে আস্ত ধ্বনিটির নির্দেশক। এ থেকেই দেখা দেয় অক্ষরলিপি (Syllabic Script)। অক্ষরলিপির থেকেই সর্বাধুনিক বিবর্তিত সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞান সম্মত ধ্বনির্লিপির উদ্ভব (Alphabetic Script)।

দানিকেনের দেবতাদের গড়া প্রাচীন সভ্যতার কোন অঞ্চলেই উন্নত লিপি বা ভাষার সন্ধান পাওয়া যায় নি। সেই উন্নত প্রাণীর ভাষা মানবীয় ভাষা থেকে আরো উন্নত হয়ে কী দাঁড়িয়েছিল তা কল্পনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু তা যে আদিম কোন মানবীয় ভাষা হ'তে পারে না, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

ভাষার বিকাশ বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে এক বিশেষ ধারা গ্রহণ করতে বাধ্য। বই ছাপার অক্ষরে দেখতে আমরা যতোই অভ্যস্ত হই না কেন ক্রমশ মাইক্রোফিল্মে বই লিখনকে পরিবর্তিত করতেই হবে। নচেৎ বই-এর বাহুল্য আকার নিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে ভবিষ্যতের মানুষকে। আজ যে ডিক্‌সেনারি বিশাল আকার ধারণ করেছে হয়ত তাকে কম্পুটারে ভরে রাখলে বোতাম টিপে উত্তর জানা যেতে পারবে। সে চেষ্টা এখনও হয় নি। কিন্তু সে পথে যেতেই হবে। ইতিহাসের কোন ঘটনা কবে ঘটল, বা বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কার কি ভাবে হয়েছে অথবা কোন দার্শনিকের কি মতবাদ ছিল তাকে যন্ত্রে রেখে দিয়ে সময়মতো বের করে আনলেই চলতে পারবে। সে পথে গেলে লিপি ও ভাষা দুইয়েরই কিঞ্চিৎ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সেই উন্নতির স্তর এখন কেবল ভাবা যেতে পারে মাত্র।

সংখ্যালিপির ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে পারে।

I II III IV V VI VII VIII XI X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

উপরে—রোমান সংখ্যা, দ্বিতীয়—কম্প্যুটার সংখ্যা, তৃতীয়—মায়া সংখ্যা,
নীচে—ইংরাজী সংখ্যা। রোমান ও মায়া সংখ্যাতে শূন্য নেই।

দানিকেনের দেবতারা বহুদিন আগে এসেছে। তাঁর দেওয়া হিসাব মতো অনেকবারও এসেছে। কিন্তু মানুষের ইতিহাসে লিপির আবির্ভাব ৫।৬ হাজার বছর আগে। পূর্ণাঙ্গ ধ্বনি লিপির আবির্ভাব আরো পরে। ভাষা যেমন মানুষে মানুষে যোগাযোগের মাধ্যম, ভাষাকে লিপিবদ্ধ করাতেই ভাব-ভাবনা পুরুষ থেকে পুরুষে সঞ্চারিত হতে পেরেছে। বলা বাহুল্য যে সুউন্নত বৈজ্ঞানিক চিন্তা উন্নত ভাষার মধ্যে দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব আর সে ভাষা উন্নত বর্ণমালার ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হতে বাধ্য। গ্রহান্তরের দেবতারা বহু বিস্ময়কর কীর্তির স্বাক্ষর রেখে গেছে বলে বলা হয়েছে, কিন্তু যোগাযোগের ভাষার কোন চিহ্ন রেখে যায় নি। ইকোয়েডরের সোনার পাতের অজস্র সংকেত পাঠোদ্ধার হলে কী তথ্য প্রকাশ করবে জানা নেই তবে তা কোন উন্নত ভাষার স্বাক্ষর বলে মনে হয় না।

পৃথিবীর দেশে দেশে ভাষাবিকাশের ক্ষেত্রে দেখা যায় মানুষ চিত্রাঙ্কনের মধ্যে দিয়েই বাণীর লেখরূপ লিপি আবিষ্কারের সূচনা করেছে। প্রাগৈতিহাসিক

লিপির প্রথম পর্যায়

চিত্রাঙ্কন থেকেই লিপির আবির্ভাব। এই চিত্রাঙ্কনের মধ্যে ছিল নানা ছবি, জ্যামিতিক চিত্র, বিভিন্ন জন্তুর ছবি এবং রৈখিক চিত্র বিশেষ। স্পেনে, প্যালেস্টাইনে কালিফোনিয়া, ক্রিটে এই ধরনের অঙ্কনের সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়।

চিত্রাঙ্কন ও লিখনের এই অবিমিশ্র পর্যায়ের পর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য দড়িতে গিঁট দেওয়া, লাঠিতে দাগকাটা চিত্রের প্রচলন হয়। অতি সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত এই ধরনের প্রচলন দেখতে পাওয়া গিয়েছে অনেক আদিবাসী সমাজে। পেরু, পলিনেশিয়া, আসাম, চীন, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে এইভাবে পত্র লেখা দেখতে পাওয়া যায়। পুঁতি গেঁথেও এই ভাবে ভাষাকে প্রয়োগ করা হ'ত।

চিত্রলিপি থেকে ধ্বনিলিপিতে পৌঁছানোর পথে বিবর্তনের ধারাও খুঁজে পাওয়া যায় যা থেকে একথা বলা যেতে পারে যে লৈখিক ধারা ক্রম-উন্নত হয়েছে। দেবতাদের দেখে যাওয়া হঠাৎ পাওয়া সূত্র ধরে মানুষ কোন লিপির উত্তরাধিকারী হয় নি।

চিত্রলিপির পরবর্তী স্তরে দেখা দেয় কিউনিফর্ম লিপি, হায়রোগ্লিফিক হায়রেটিক, ডিমোটিক লিপি। সিন্ধু সভ্যতার লিপিও এই মধ্যবর্তী পর্যায়ের লিপি। পৃথিবীর সমস্ত দেশ জুড়েই এই ধরনের লিপির বিকাশ ঘটেছে। দানিকেনের দেবতাদের স্পর্শে সুসভ্য হয়ে ওঠা নানা প্রাচীন সভ্যজাতিও এ থেকে বাদ যায় নি।

সুমের, মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন, এ্যাসিরিয়া, এলাম, পারস্য প্রভৃতি দেশে কিউনিফর্ম লিপির প্রচলন ছিল। মাটির চাকতির উপর সরু কাঠি দিয়ে লেখা হ'ত বিভিন্ন সংকেত বস্তু বা প্রাণীর চিত্র ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়ে ভাবব্যঞ্জক হয়ে উঠেছে।
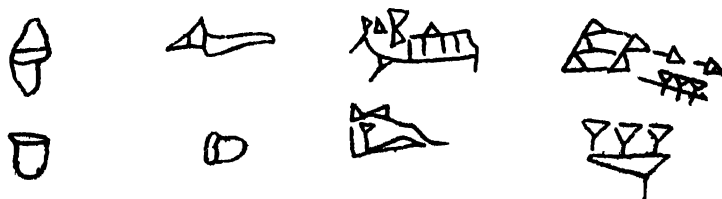
লিপির ভাবব্যঞ্জনা

প্রাচীন মিশরের লিপিকে বলা হয় হায়রোগ্লিফিক লিপি। এও চিত্র ও অক্ষরলিপির এক মধ্যবর্তী স্তর। হায়রেটিক ও ডিমোটিক লিপি হায়রোগ্লিফিক লিপির অপভ্রংশ বলে মনে করা হয়। বলা যেতে পারে এগুলো মিশরীয় সাধারণ মানুষের লিপি।

হরাপ্পা মহেঞ্জোদারোতেও চিত্রলিপির পরবর্তী অবস্থার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

প্রায় ৩০০ মতো বিভিন্ন প্রতীক হরাপ্পা লিপিতে পাওয়া যায়। এগুলি চিত্র ও অক্ষর-লিপির মধ্যবর্তী স্তর বলেই অনুমিত।

লিপি বিকাশের এই পথে অগ্রসর হ'লে দেখা যাবে, ক্রমশঃ একই ধারাপথের ক্রমবিকাশিত ও বিচিত্রময় বিস্তৃতিই নানা লিপির জন্ম দিয়েছে।

দানিকেন উল্লিখিত ইজেকিয়েলের দেখা দেবতারা যে অঞ্চলে এসেছিল এবং তাদের বাণী লিপিবদ্ধ করিয়েছিল সেই প্যালেস্টাইন-সিরিয়াতেই লিপির যুগান্তকারী বর্ণমালার আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু সেও ছিল চিত্র থেকে বিবর্তিত লিপির এক ধারাপথ। বিভিন্নপ্রকার লিপি পৃথিবী জুড়ে নানা স্থানে স্বতন্ত্রভাবে দেখা দিয়েছিল। কিছু তার বিকাশলাভের পথে অবলুপ্ত হয়ে যায়। কিছু কিছু খানিকটা অগ্রসর হয়ে অবলুপ্ত হয়। কিন্তু বর্ণমালা মানব ইতিহাসে একবার আবিষ্কৃত হয়ে ক্রমবিকাশলাভ করতে শুরু করে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছায়।

বর্ণমালার সেই ধারাটি নিম্নরূপ—
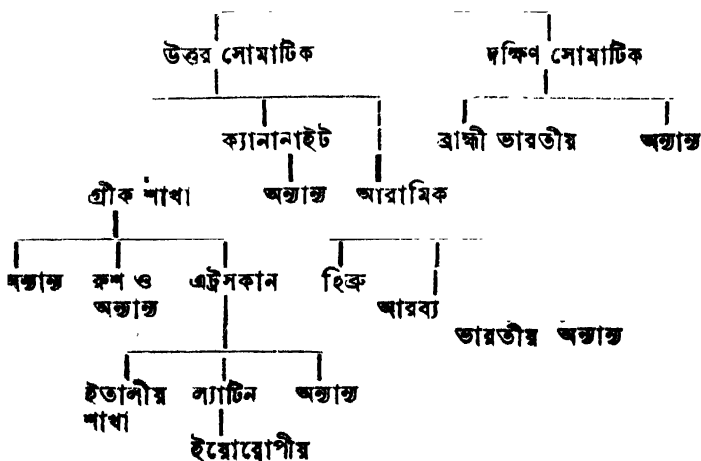
লিপির ক্রমবিকাশ

এর মধ্যে মহাজাগতিক অতিথিদের অসামান্য উন্নত ভাষার স্থান কোথায়? বানর থেকে শল্য চিকিৎসার দ্বারা তারাই যদি মানুষ সৃষ্টি করে থাকে, এই মানুষদের ভাষা শিক্ষা দিয়ে থাকে, সেই মানুষদের কাছে তাদের বাণী লিপিবদ্ধ করিয়ে থাকে তবে তা তো অবশ্যই তাদের উন্নত ভাষার মাধ্যমেই হওয়া স্বাভাবিক। সে বর্ণমালার স্থান এখানে কোথায়?

বর্ণমালার মতো ভাষা বিকাশেরও সেই একই ইতিহাস। ভাষার শ্রেণী বিভাগ ব্যাকরণ, ভোগৌলিক অবস্থান এবং বংশানুক্রমিক—এই তিনভাবেই কর যেতে পারে। এই তিন পদ্ধতির ভিতর বংশানুক্রমিক বিভাগই সর্বাপেক্ষ বিজ্ঞানসম্মত। কারণ এ থেকে ভাষার উৎপত্তি যেমন একদিক থেকে বুঝতে পারা যায়, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর পরস্পর সম্পর্কের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে অসুবিধা হল কতকগুলি ভাষা অবলুপ্ত হয়ে গেছে এবং কতকগুলি মধ্যবর্তী পর্যায়ের ভাষা খুঁজে না পাওয়ার ফলে কোন কোন ভাষাকে বংশানুক্রমিক ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে সেই ভাষাগুলি এত উন্নত যে কোন ধারাতেই ধরা যায় নি। সুমেরিয়ান ভাষা তেমনি একটি। মেসোপটেমিয়ার 'মিটান্নি', জাপানী, কোরিয়ান আদিম অস্ট্রেলিয়ান ভাষাও তেমনি।

সারা পৃথিবীতে ৩০০০টি উল্লেখযোগ্য ভাষা আছে। এই সমস্ত ভাষাকে ২৬টি ভাষাগোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয়। তাদের মধ্যে নানা উপবিভাগে প্রায় সমস্ত ভাষাকেই খুঁজে পাওয়া যাবে। ২৬টি ভাষাবিভাগের নাম হ'ল :— ১। দ্রাবিড় ২। আন্দামান ৩। খাজুনা [ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশের পার্বত্য ভাষা] ৪। ইন্দো-ইউরোপীয় ৫। চীনা-তিব্বতীয় ৬। অস্ট্রো-এশিয়াটিক ৭। অস্ট্রেলীয় ৮। মালয়ী-পলিনেশীয় ৯। লা-তি [উত্তর ভিয়েৎনামের একাংশের ভাষা] ১০। তাসমানীয় ১১। পপুয়ান [নিউগিনির একাংশের ভাষা] ১২। প্রত্নএশীয় ১৩। উরালীয় ১৪। জাপানী-কোরীয় ১৫। আলতাইক, ১৬। বাস্ক [পিরেনীজ পার্বত্য অঞ্চলের ভাষা] ১৭ ককেশীয় ১৮। নিকট প্রাচ্য, ১৯। সেমীয়-হামীয় ২০। সুদানী-গিনীয় ২১। হটেনটট্-বুশমান [পিগমিদের ভাষা] ২২। বান্টু [দক্ষিণ আফ্রিকার ভাষা] ২৩। এস্কিমো এ্যালেউট, ২৪। উত্তর আমেরিকান ২৫। মধ্য আমেরিক্যান বা মেক্সীয় এবং ২৬। দক্ষিণ আমেরিকান।

এর ভিতর কয়েকটি সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে যেগুলি অত্যুন্নত প্রাযুক্তিক জ্ঞানের স্বাক্ষর বহনকারী প্রাচীন সভ্যতার দেশগুলিতে প্রচলিত।

সেমীয়-হামীয় ঃ আসিরিয়া বা ব্যাবিলনের ভাষা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বানমুখ লিপি এই ভাষার। আরবী এই ভাষাগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ ভাষা। আবিসিনিয়া, সিরিয়া, সোমালিয়ার কিছু ভাষা এই গোষ্ঠীর এবং সেগুলি অধুনা প্রচলিত।

দক্ষিণ আমেরিকান ঃ ইকোয়েডর, চিলি, পেরু, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা

প্রভৃতি স্থানের ভাষা এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। এর মধ্যে সর্বপ্রধান হ'ল আরওয়াক ভাষাবর্গ। পেরুর ইন্‌কাদের ভাষা ছিল কিছুয়া। আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের ৮টি ভাষা ছিল। তার মধ্যে নাহুয়াটলান উল্লেখযোগ্য। এই ভাষা আজটেক্‌রা ব্যবহার করত।

মালয়ী-পলিনেশীয় ঃ এই শাখার ভাষাগুলি ইস্টার দ্বীপ থেকে মাদাগাস্কার, ফরমোজা, নিউজিল্যাণ্ড পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এই ভাষাগোষ্ঠীকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। (১) মেলানেশীয়—ফিজি, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, নিউ হেব্রাইড প্রভৃতি স্থানের প্রায় ৩৫টি ভাষা এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। (২) মাইক্রনেশীয়—প্রশান্ত মহাসাগরের ক্যারলিন দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় ৮টি ভাষা এই শ্রেণীর। (৩) ইন্দোনেশীয়—জাভা-বোর্নিও মালয়ী প্রভৃতি স্থানের ২০০টি ভাষা এই বিভাগীয়। (৪) পলিনেশীয়—পলিনেশীয়া, হাওয়াই, টাইটি প্রভৃতি স্থানের ২০টি ভাষা এই গোষ্ঠীর।

এর মধ্যে গ্রহান্তরের অতিথির ভাষা কোনটি বা কোনটি তাদের রেখে যাওয়া ভাষার অপভ্রংশ রূপ তা দানিকেন বলেননি। ভাষার ইতিহাসের তেমন কোন অত্যুন্নত ভাষার সন্ধান মেলেনি।

প্রাচীন কাল থেকে দুর্বলভাষা ক্রমশঃই শক্তিশালী হয়েছে মানুষের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা, প্রয়োজনবোধ এবং সেই সঙ্গে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে। প্রাচীন সভ্যজাতির মধ্যে প্রচলিত ভাষার মাধ্যমে মনোভাব প্রকাশের যে ক্ষমতা ছিল বর্তমানের উন্নত ভাষাগুলি যে তার থেকে বহুগুণ অধিক ক্ষমতার অধিকারী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

দানিকেনের দেবতাদের শেখানো ভাষার স্বাক্ষর আজ পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি। এত লিপি, ছবি, প্রস্তর ফলকের কোথাও না। দানিকেন অবশ্য দাবি করেছেন কুয়েঙ্কার স্বর্ণফলকের ভাষা দেবতাদের প্রবুদ্ধ দূতদের ভাষা। 'কিন্তু তবু বলবো মাটির গভীরে পাওয়া স্বর্ণফলক সমূহে যে বর্ণমালা চিত্রিত রয়েছে, সেই বর্ণমালাই পৃথিবীর প্রাচীনতম লিপি। এবং দেবতাদের প্রবুদ্ধ দূতেরাই সে ফলকে উৎকীর্ণ করে রেখে গেছেন প্রাযুক্তিক তথ্যাদি সহ নানা উপদেশ বাণী, ভবিষ্যৎ বংশধরদের কল্যাণে।'৩(২৬) এত নিশ্চিত একটি প্রমাণ হাতের কাছে থাকতে তিনি কেন যে তার পাঠ উদ্ধারের জন্য লেগে না গিয়ে পাঁচখণ্ড মন্তব্যের পাহাড় খাড়া করেছেন তা বোঝা যায় না। তবে সে লিপির পাঠোদ্ধার হলে নিশ্চয়ই তুলনা করার সুবিধা হবে যে সত্যই আজকের মানুষের ভাষা থেকেও উন্নত ভাষার সাক্ষাৎ এ পৃথিবীতে অতীতে হয়েছিল কিনা।

অসীম ক্ষমতাশালী দেবতারা সুমের অঞ্চলে নেমেছিল এবং তাদের ভাষা-জ্ঞান দিয়েছিল। ইজেকিয়েলের দেখা দেবতারা তো এই অঞ্চলেই নেমেছিল। দানিকেন বলেছেন, 'আমি বুঝতে পারি না, লোকে এ কথা কেন জানতে পারছে না যে সে মহাকাশযানের যাত্রীরা পৃথিবীর মানুষকে শিক্ষিত করেছিল, তাদের হাতে অত্যুন্নত পর্যায়ের যন্ত্রপাতিও তুলে দিয়েছিল।'৪(৫৫) অথচ শিক্ষিত সে অঞ্চলের আদিবাসীদের ভাষা ছিল যথেষ্টই প্রাচীন এবং অনুন্নত। কোনো উন্নত-প্রাণী অক্ষরজ্ঞানহীনকে ভাষাজ্ঞান দিলে অবশ্যই তারা ভাষার বিবর্তনের গোড়ার ধাপ থেকে শেখাতে শুরু করবে না। সে ক্ষেত্রে তারা তাদের সুউন্নত ভাষাতেই শিক্ষিত করে তুলবে।

দানিকেনের দেবতারা অশিক্ষিত মানুষ থেকে লেখক পর্যন্ত তৈরী করেছেন। তাদের ভাষাজ্ঞানও দেওয়ার কথা অতি উন্নত কোন ভাষাতে। দেবতাদের দেওয়া নৈতিক মান, প্রেম, প্রীতি সৌহার্দ, ভক্তিভাব প্রভৃতি ক্রম-বিকশিত হ'ল কিন্তু ভাষার চাকাকে হঠাৎ সেই উন্নত প্রাণীর বংশধরেরা উল্টোদিকে ঘোরাতে লাগল কেন? দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার অনেক আদিম ভাষাই উন্নত ইউরোপীয় ভাষার সংস্পর্শে আজ অবলুপ্তের পথে। আধুনিক বিশ্বে প্রচলিত সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত ভাষাগুলি এসেছে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠী থেকে। এর বিকাশ দেবতাদের আসা যে সমস্ত পীঠস্থানের কথা দানিকেন উল্লেখ করেছেন তার কোন জায়গা থেকেই নয়।

পলাতক মহাকাশচারীরা তো বছরের পর বছর এই পৃথিবীতে কাটিয়েছে, মানুষের সাথে যৌনমিলন ঘটিয়েছে অথচ ভাষার কোন স্বাক্ষরই তারা রেখে গেল না। তাদের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আবার ভাষার প্রাথমিক স্তর থেকে যাত্রা শুরু করল মিশর মেসোপটেমিয়া-পলিনেশিয়া-পেরু সর্বত্র। দেবতাদের রেখে যাওয়া বিশ্বরাষ্ট্রভাষা কোথায় গেল?

নরনভশ্চরদের দেহমিলন

দানিকেনের মতে অজানা বুদ্ধিমান জীবেরা এ পৃথিবীতে এসেছিল শুধু নয় তারা মানুষের সঙ্গে দৈহিকভাবেও মিলিত হয়েছিল। হয়ত বা তাদের ঔরসে উন্নততর প্রজাতির জন্ম হবে এই ছিল আকাঙ্ক্ষা। মোজেসের জন্ম বৃত্তান্ত ও কর্ণের কাহিনী সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'দেবতাদের দ্বারা মানবীর গর্ভ সঞ্চারের' ৭(৬৫) নিদর্শন। প্রথমতঃ প্রশ্ন দেখা দেয় মহাকাশচারীরা যে কেবল পুরুষ ছিল এমন নিশ্চয়তা কিছু আছে কী? দ্বিতীয়তঃ তারা কতজনই বা এসেছিল যে এই

ভাবে গর্ভসঞ্চার করে মানব প্রজাতি সৃষ্টি করবে? দানিকেন অবশ্য আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিচারে সেই সুদূর গ্রহবাসীরাও যে পুরুষশাসিত সমাজে বাস করত এমন ধরেই নিয়েছিলেন। না হ'লে যৌনমিলনে কেবলমাত্র পার্থিব মানবীর কথাই কেন আসবে? সেই যাত্রীরা তো মহিলা হওয়াও সম্ভব ছিল।

সমাজ সুউন্নত পর্যায়ে পৌছালে পুরুষের একক প্রাধান্যের অবসান ঘটার কথা। সে ক্ষেত্রে মহাকাশচারীরা কেবল পুরুষই হবে এমন ভাবা যায় কি? আর পালিয়ে আসা প্রাণীদের ক্ষেত্রে তো নারী-পুরুষ উভয়ের আগমন ছিল অনিবার্য। তাহ'লে দেবীর সঙ্গে নরের মিলনের কাহিনী তেমন শোনা যায় না কেন? দানিকেন উল্লেখ করেছেন, 'পৃথিবীতে নেবে আসা অগ্নিনিঃসারী দেবতারা যাঁরা পার্থিব রমণীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হ'তেন, তাঁদের কথা, তাঁদের ওড়ার কথা লিখতে গেলে বইএর পাহাড় জমে উঠবে।' ৪(৯) এ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে দেবতারা কেবল পার্থিব রমণীর সঙ্গেই যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে। গ্রহান্তরের নারী আর পার্থিব পুরুষের মিলনের কাহিনী নেই কেন? আর গ্রহান্তরের সেই জীবেরা বর্তমান মানুষের পর্যায়ে থেকেও অনেক উন্নত অবস্থায় পৌছে গিয়েছিল। সেই সুউন্নত, মার্জিত, রুচিশীল প্রাণীর সঙ্গে বর্বর পশুবৎ নরাকার বানরের যৌন মিলন কীভাবে সম্ভব! যৌন-বিকৃতি ছাড়া এটা কখনই স্বাভাবিক ঘটনা হতে পারে না। আফ্রিকার জঙ্গলে বর্তমান যুগের কয়েকজন মানুষ যদি বছরের পর বছর নারী সংসর্গ রহিত ভাবে বাসও করে তবুও তাদের পক্ষে কি যৌন-সহকর্মী হিসাবে শিম্পাঞ্জী বা বানরকে নির্বাচন করা সম্ভব? দানিকেন তো বলেছেন যে নরাকার পশুকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়েই সলজ্জ ব্রীড়াবনতা রমণীর সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং সেই দেবতাদের তো বর্তমান যুগের কোন আদিম অধিবাসী রমণীর সন্ধান পাওয়াও সম্ভব ছিল না।

দূর গ্রহজগতের সামাজিক বিকাশের স্তর প্রাণীগত উন্নতির পর্যায়, যৌন-জীবনের ধরন-ধারণ প্রভৃতি বর্তমান পার্থিব মানব সমাজ থেকে কতদূর এগিয়ে গিয়ে কী বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছিল তা কল্পনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমান স্তরের মানুষের পক্ষেই যে নিয়াণ্ডারথাল এর পূর্বেকার কোন নরাকার পশুর সঙ্গে যৌনমিলনের কথা ভাবা সম্ভব নয়—এ কথা অনস্বীকার্য। বিবর্তনের কোন পর্যায় সেদিনের মানুষ অতিক্রম করেছিল তা দানিকেন বলেননি ঠিকই, কিন্তু তারা যে হোমো সাপিয়েন হয়ে ওঠেনি তখনো পর্যন্ত এ তো তারই তত্ত্ব। সে সময়ের মানুষের অবস্থার বর্ণনাও দিয়েছেন তিনি, 'গুহাকন্দরে বাস করত সেই

মানবাকৃতি জীবকুল দলবদ্ধভাবে। রুক্ষ, পিঙ্গল লোমে ঢাকা সেই দেহ নিয়ে সে ঘুরে বেড়াত আজ এ ঠাঁই, কাল সে ঠাঁই করে, আহারের অন্বেষণে।'৪(৮৬) এই অবস্থাটা কিন্তু বর্তমান কোন আদিবাসীর পিছিয়ে থাকা জীবনের কাছাকাছিও নয়। নিকোবর দ্বীপ বা আফ্রিকার জঙ্গলের কাছাকাছি সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা রমণীকেও আধুনিক জীবনে অভ্যস্ত করে তুললে সে আধুনিক মানুষের আকাঙ্ক্ষা কামনার উৎস হয়ে উঠতে পারে। সেদিনের সেই মানবকৃতি জীব-কুলের লোম চেঁছে ফেললেও কিন্তু তারা মানবাকৃতিই থাকত—মানব হ'ত না।

দানিকেন অবশ্য সুবিধামতো দেবতাদের সঙ্গে রমণীর যৌন-মিলনের সময় সীমাকে এগিয়ে নিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু একই সঙ্গে পশুবৎ প্রাণী থেকে মানুষ সৃষ্টির পরীক্ষা আবার সেই মনুষ্যেতর প্রাণীর সঙ্গে মনুষ্য-উর্ধ্ব প্রাণীর যৌন-মিলনের কল্পনা করা নিতান্তই বাতুলতা।

এমনি দেবতা রমণীর মিলনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত সমস্যা এসে পড়াও অস্বাভাবিক নয়। বিবর্তনের ধারায় দেখা যায় একই শাখা থেকে উদ্ভব হয়ে থাকলেও দুটি প্রজাতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য হয়ে যায় কালের সঙ্গে সঙ্গে। তখন উভয়ের ক্রোমসোমের সংখ্যার ভিতর আর মিল থাকে না। এ ক্ষেত্রে নরাকার পশু ও অতি মানবের ক্রোমসোমের অমিল ঘটাই ছিল স্বাভাবিক। তা হয়ে থাকলে দেবতারা যতোই মানবাকৃতি রমণীর সঙ্গে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হোক কোন প্রজাতিই তারা সৃষ্টি করতে পারে না। অবশ্য সবজান্তা দেবতাদের নিয়ে দানিকনের সমস্যা কম। কারণ তারা ক্রোমসোমও বদলিয়ে দিতে পারে। সেই অর্থেই তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, 'আমাদের পূর্বপুরুষ মানবাকৃতি বানরের ছিল ৪৮টি x y ক্রোমসোম। আমাদের আছে ৪৬টি x y ক্রোমসোম। প্রজনন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতকুলের কাছে (এবং নৃবিজ্ঞানীদের কাছেও বটে।) আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা আমায় বুঝিয়ে দিন, কেমন করে ৪৮টি y ক্রোমসোম ৪৬টি x y ক্রোমসোমে পরিবর্তিত হ'ল এবং সেই ভিন্ন সংখ্যা ও আকৃতির ক্রোমসোম-বিশিষ্ট জীবের প্রজননে সার্থক বংশবৃদ্ধিই বা ঘটলো কেমন করে?'৫(২৮৪) এই রকম অনেক কিছু হওয়াকেই কেমন ক'রে হ'ল বলে প্রশ্ন করা যায়, আর কেমন ক'রে ঘটলো জাতীয় প্রশ্নের সরাসরি উত্তর বহু ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়ও না। ক্রোমসোমের ক্ষেত্রেও এমন অনেক কিছু ঘটে। সে ক্ষেত্রে দেখা দরকার সেই ঘটার ব্যাপারটি পার্থিব ঘটনা না দৈব হস্তক্ষেপের ফল।

ক্রোমসোম হ'ল কোষের অভ্যন্তরস্থ অন্যতম উল্লেখযোগ্য অংশ। যদিও

ক্রোমসোম কোষের একটি স্থায়ী অংশ তথাপি কোষ বিভাজনের সময় বিভিন্ন পর্যায়ে এর নানারূপ পরিবর্তন ঘটে থাকে।

সাধারণতঃ প্রত্যেক জীবের জার্মকোষ ব্যতীত দেহের সমস্ত সোমাটিক কোষে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমসোম থাকে। আবার কোন জীবের ক্ষেত্রে দেখা যায় সমুদয় সোমাটিক কোষে ক্রোমসোমের সংখ্যা একই রকম হয় না। এমন কি একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত কোন কোন প্রাণীর ক্রোমসোম সংখ্যা সেই প্রজাতির অন্য প্রাণীর ক্রোমসোম সংখ্যা থেকে পৃথক হয়ে থাকে।

সোমাটিক কোষের ক্রোমসোমগুলিকে কয়েকটি জোড়ায় ভাগ করা যায়। এই রকম যুগলবদ্ধ ক্রোমসোমকে ডিপ্লয়েড ক্রোমসোম বলে। অধিকাংশ উচ্চ-স্তরের প্রাণীর ক্রোমসোম যুগলবদ্ধ।

অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে একই রকম ক্রোমসোম তিনটি ক'রে, কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে চারটি ক'রে এমনি বাড়তে বাড়তে একই রকম আটটি ক'রে জোটবদ্ধ ক্রোমসোমবিশিষ্ট প্রাণীও দেখা যায়।

ডিপ্লয়েড ক্রোমসোম সংখ্যা যে এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণী, এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে বিরাট পার্থক্য হয় তা কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে।

	ডিপ্লয়েড ক্রোমসোম সংখ্যা		ডিপ্লয়েড ক্রোমসোম সংখ্যা
মটর—	১৪	গম—	২৮
চা—	৩০	ব্যাঙ—	২২
ফলের মাছি—	৮	কুকুর—	৭৮
ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা	১১৪	মানুষ—	৪৬

এখানে দানিকেনের মতো প্রশ্ন করাই যেতে পারে যে কেমন করে বিভিন্ন প্রাণীতে ৮টি ক্রোমসোম থেকে ২৮টি বা ৭৮টি ক্রোমসোম হ'ল? কিন্তু কেমন ক'রে হ'ল কথাটার সহজ উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। বিবর্তনের ধাপে ধাপে এমন পরিবর্তন ঘটেছে, এটাই হ'ল এক কথায় উত্তর। এ প্রশ্নও তোলা যায় যে কি করে নানা প্রাণীতে ক্রোমসোম সংখ্যায় পার্থক্য ঘটল? কী করেই বা যুগল ক্রোমসোমের বদলে তিনটি, চারটি, পাঁচটি, ছয়টি এমন কি সাতটি আটটি ক'রে গুচ্ছক্রোমসোম বিশিষ্ট প্রাণী সম্ভব হ'ল? কিন্তু তা হয়েছে। পলিপ্লয়েড আর ডিপ্লয়েড জীব এই পৃথিবীরই জীব বিবর্তনের পরিণাম গ্রহান্তরের প্রাণীর শল্য চিকিৎসার ফল নয়।

ডিপ্লয়েড কোষে ক্রোমসোমগুলি সবসময় জোড়ায় থাকে। মানুষের ক্ষেত্রেও

তার ব্যতিক্রম নেই বিশেষ করে নারীর ক্ষেত্রে। মানুষের ক্ষেত্রে মোট ২৩ জোড়া ক্রোমসোম আছে। তার মধ্যে ২২ জোড়াকে বলে অটোসোম আর ১ জোড়াকে বলে যৌন ক্রোমসোম। ২২ জোড়ার ক্রোমসোমের প্রত্যেকটি যুগল পরস্পর একই রকম। যৌন ক্রোমসোম জোড়াও নারীর ক্ষেত্রে একই রকম। যৌন ক্রোমসোমকে চিহ্নিত করা হয় এক্স ক্রোমসোম বলে। নারীর ক্ষেত্রে সুতরাং রয়েছে ২২ জোড়া অটোসোম + x x ক্রোমসোম; পুরুষের ক্ষেত্রে রয়েছে ২২ জোড়া অটোসোম + x y ক্রোমসোম অর্থাৎ ত্রিবিংশতি জোড়া ভিন্ন ধরনের দুটি ক্রোমসোমে গঠিত?

দানিকেনের প্রশ্ন, কেমন করে x y ক্রোমসোম সৃষ্টি হ'ল? প্রশ্নটা উত্তরাকারে উপস্থিত। গ্রহান্তরের প্রাণীর হস্তক্ষেপই যেন এমন সম্ভব হ'ল। অভিব্যক্তি-বাদের নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করলে পরিবর্তনগুলির অনেক কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। পরিবর্তনগুলির জন্য যে মহাকাশের কোন দূতের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই তা কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে।

মানুষের ক্ষেত্রে কিছু জন্মগত রোগ দেখা যায়। ক্রোমসোম সংক্রান্ত পুরুষের এই রোগকে বলে ক্লাইনফেলটারের সিনড্রোম। সে রোগে, যারা আক্রান্ত হয় তাদের ক্রোমসোমে নানা ব্যতিক্রম দেখা যায়। বিশেষ ক'রে x ক্রোমসোম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। যেমন কোন ক্ষেত্রে ২২ জোড়া অটোসোম + xxy ক্রোমসোম। এখানে মোট ক্রোমসোম হয় ৪৭টি। কারো কারো ক্ষেত্রে এই বিন্যাস দাঁড়ায় ২২ জোড়া অটোসোম + xxxy ক্রোমসোম অর্থাৎ মোট ৪৮টি। কোন কোন ক্ষেত্রে x না বেড়ে y বেড়ে যায়। যেমন ২২ জোড়া অটোসোম + xx yy ক্রোমসোম।

টারনারের সিনড্রোম রুগীর ক্ষেত্রে ক্রোমসোম বিন্যাস দেখা যায় এই রকম ৪৫ = ৪৪ + x ; ৪৭ = ৪৪ + x x x অর্থাৎ y থাকে না। ডাউন-এর সিনড্রোম রুগীর বেলায় এই বিন্যাস ঘটে অন্যভাবে। যেমন—৪৭ = ৪৫ + xy এখানে একবিংশতি অটোসোম সংখ্যায় একটি বেশী থাকে। কখনো এমনো হয় ৪৭ = ৪৫ + x x।

এই সমস্ত পরিবর্তনগুলো বলা বাহুল্য কোন দেবতার শল্য চিকিৎসা বা হস্তক্ষেপ ছাড়াই ঘটছে। আর এমন কেবল মানুষের ক্ষেত্রেই ঘটছে না। তা হ'লে হয়ত দানিকেন বলতেন যে সেই আদিম কালের দেবতাদের শল্য-চিকিৎসার ফলেই এখনও এমন ঘটছে।

ড্রসফিলা নামে একরকম মাছির যৌননির্ধারণে মানুষের মতো একই প্রক্রিয়া

দেখা যায়। এদের চারজোড়া ক্রোমসোম থাকে। তার মধ্যে দ্বিতীয় তৃতীয় জোড়া ভি আকৃতির আর চতুর্থ জোড়া বিন্দুর মতো। প্রথম জোড়া স্ত্রী-মাছির ক্ষেত্রে দুটিই দণ্ডের মতো অর্থাৎ x x। আর পুরুষ মাছির ক্ষেত্রে একটি দণ্ডের মতো অন্যটি বাঁকানো অর্থাৎ x y।

স্ত্রী মাছি— চার জোড়া—॥ vv vv ••

পুরুষ মাছি—চার জোড়া—।) vv vv ••

x y ক্রোমসোম উপস্থিতির ব্যাপারটি আদৌ কোন উন্নততর প্রাণীর একক বৈশিষ্ট্য নয়। পাখি, প্রজাপতি প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এই সংকেতে পার্থক্যটুকু হ'ল যে অটসোম বাদ দিলে যৌন ক্রোমসোম যুগলে পুরুষেরা বহন করে xx ক্রোমসোম আর স্ত্রীরা বহন করে x y ক্রোমসোম। কোন কোন পতঙ্গ y ক্রোমসোমটি আদৌ থাকে না। তখন বিন্যাসটি দাঁড়ায় স্ত্রীর ক্ষেত্রে x x এবং পুরুষের ক্ষেত্রে x o.

এটা পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে ক্রোমসোম সংক্রান্ত পরিবর্তন ঘটানোর জন্য মহাকাশের কোন প্রাণীর আগমনের পথ চেয়ে থাকতে হয়নি। এটি প্রাকৃতিক ঘটনা। বিবর্তনের ধাপে ধাপেই তা ঘটেছে। আর বিভিন্ন ধাপের ভিতর যৌনসংসর্গ কোন ফল লাভে অসমর্থ। কাজেই সেই দূরান্তরের জীবেরা যখন এসেছিল ব'লে মনে করা হয়েছে, তখন মানুষের আবির্ভাব না ঘটে থাকলে, রুচিগত প্রশ্ন ছাড়াও, তাদের সঙ্গে দেহরসায়নগত কারণে দেবতাদের যৌনসংসর্গে কোন ফল লাভ ঘটতে পারে না।

নভশ্চরদের মহাকাশ যান :

যন্ত্র প্রসঙ্গে ভিনগ্রহবাসীদের মহাকাশযানের একটি নির্দিষ্ট বর্ণনা রেখেছেন লেখক দানিকেন। মহাকাশ পরিভ্রমণের স্বাক্ষর হিসাবে তাঁর মতে সেই আগন্তুকেরা গোলকের ধারণা ও গোলকের আকৃতির ছড়াছড়ি ঘটিয়েছিল। 'সেই বুদ্ধিমান জীবেরা আমাদের এ গ্রহে এসেছিলেন এমনিতরো গোলকে চড়ে।' ২(৭৪) কাজেই সেই বুদ্ধিমান জীবদের গোলাকৃতি মহাকাশযানের ছবির ছড়াছড়ি অতীতের পৃষ্ঠা জুড়ে। মহাকাশযানের গোলাকৃতির সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে পাওয়া গোলাকৃতি পাথরের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? কেনই বা সেই বর্তুলাকার পাথর রাশি রাশি সৃষ্টি করা হয়েছিল পৃথিবীর অনেক স্থানেই, বিশেষতঃ কোস্টারিকায়? দানিকেন উত্তর দিয়েছেন, 'সত্যি কথা বলতে কি কে বা কারা ওই রাশি রাশি গোলক তৈরি করেছিল তা আমরা

জানি না। কী যন্ত্র দিয়ে ওগুলো তৈরি তাও জানি না। জানি না, কোন প্রয়োজনে গ্র্যানিট কেটে ওগুলো তৈরি করেছিল, আর কবেই বা করেছিল। ···একটা কথা পরিষ্কার। নিখুঁত করে গোল করা আর মসৃণ করে পালিশ করা পাথরের ও বলগুলো যে যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া শুধু হাতে তৈরি হয়নি, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।'২(৭২) এখানেও অবশ্য বোঝা গেল না মহাকাশ-যাত্রীদের গোলকে চড়ে আসার সঙ্গে পাথরের গোলাকৃতি হওয়ার কী সম্পর্ক থাকতে পারে। তবু তিনি বলেছেন, 'ওই সব প্রাগৈতিহাসিক গোলকের রিলিফ আর গুহাপ্রাচীরে অঙ্কিত চিত্র অজানা জীবদের মর্তে আগমনের সঙ্গে নিশ্চয়ই সম্পর্কযুক্ত। সেই বুদ্ধিমান জীবেরা আমাদের এ গ্রহে এসেছিল এমনিতরো গোলকে চড়ে।' ২(৭৪) এই সব ধারণার উপর দাঁড়িয়ে তিনি মহাকাশযানের আকৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করেছেন, 'প্রথম যে মহাকাশ-যান পৃথিবীতে নেমেছিল তার আকার ছিল গোল আর ভবিষ্যতে যে যান তৈরি হবে তারও আকার হবে গোল।'২(৫৮)

মহাকাশ পথে পাড়ি জমাতে গেলে সেই যানের গঠন কেমন হ'লে সুবিধা হবে তা অবশ্যই পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর নির্ভর করছে। তবে এখন পর্যন্ত মহাকাশযানকে উৎক্ষেপণ করবার জন্য ব্যবহৃত রকেটগুলি সবই দীর্ঘাকৃতি লম্বা। চাঁদের চারদিকে ভ্রমণরত রুশযান তৃতীয় লুনিকের আকৃতি অনেকটা খেলাধুলার পুরস্কার প্রদত্ত কাপের উপরিভাগের মতো। চাঁদের রাজ্যে প্রবেশকারী মার্কিন মহাকাশযান অ্যাপলো—১১ এর আকৃতি বহুপরিচিত। চাঁদের পৃষ্ঠে অবতরণ-কারী ভেলার আকৃতি চারপায়া এক চৌকোণের উপর পাম্পসেটের একটি যন্ত্রের মতো। অবশ্য এ সব কিছু থেকে সুদূর ভবিষ্যতে ছায়াপথ ভ্রমণকারী মহাকাশযানের আকৃতি যে কেমন হ'তে পারে তার কোন ধারণা দেওয়া সম্ভব নয়। দানিকেন সেই ধারণা দিয়েছেন 'গোল' রূপে। সেই সম্ভাব্যতা নিয়ে অবশ্য কোন বিতর্ক তুলে লাভ নেই। বরং দানিকেন কথিত চাক্ষুষ মহাকাশ-যান দর্শনকারী ইজেকিয়েলের বর্ণনা লক্ষ্য করা যেতে পারে।

'পয়গম্বর ইজেকিয়েল একটি মহাকাশযানকে নাবতে দেখেছিলেন এবং তার বর্ণনাও দিয়েছিলেন।'৪(১৭) দানিকেনের সাক্ষ্য-প্রমাণের ঝাঁপিতে এই উদাহরণ একটি অমূল্য রত্ন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি আগেই বলেছি যে ইজেকিয়েলের পুঁথির যে ব্যাখ্যা আমি দিয়েছি তা আমার সাক্ষীপ্রমাণের ঝাঁপিতে একটা বিশেষ দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হয়ে গেছে। আলাবামার হান্টসভিলে নাসার নিদর্শন গবেষণা সংস্থার প্রধান যন্ত্রবিৎ যোসেফ এফ ব্লুমরিশ

রকেট নির্মাণের অনেকগুলি পেটেন্টের অধিকারী এবং নাসার এক্সপেরিমেন্টাল সার্ভিস স্বর্ণপদকের অধিকারী। তার 'তখন স্বর্গ খুলিয়া গেল' গ্রন্থে বলেছেন, ইজেকিয়েল বর্ণিত মহাকাশযানের অস্তিত্ব ছিল এবং সে সর্বাধুনিক প্রাযুক্তিক উন্নতির জ্ঞান এবং তার যন্ত্রবিদ্যার অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রমাণও করেছেন।'৪(১৮)

দানিকেনের সেই 'বিশেষ দর্শনীয় বস্তুর' প্রাযুক্তিক আকারটি ব্লুমরিশ বর্ণনা করেছেন। আদিম মানুষেরা যে মহাকাশযান দেখে গোলের বর্ণনার ছড়াছড়ি ঘটিয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেটি স্বভাবতই মর্তে অবতীর্ণ মহাকাশ হবার কথা। হয় সেই সুউন্নত প্রাণীরা সরাসরি মহাকাশযান নিয়ে পৃথিবীতে নেমেছিল, নয়ত পৃথিবীর পৃষ্ঠ স্পর্শ করেছিল এমন একটি যান যা পৃথিবীর চারদিকে ঘূর্ণায়মান কোন মূলযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল।
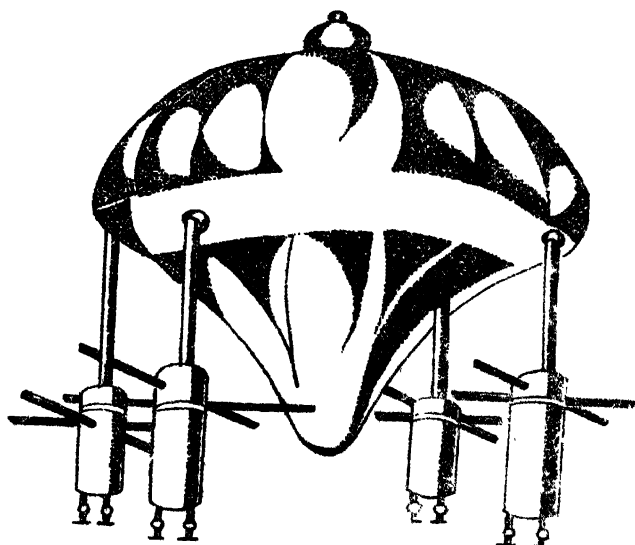
ব্লুমরিশের মহাকাশযান

ব্লুমরিশের বর্ণনা মতো ইজেকিয়েলের দৃষ্ট মহাকাশযানের আকৃতি ছিল লাট্টুর মতো। সেই লাটিমের লোহার ফলাটির বদলে চারদিক থেকে দণ্ডাকারে নেমেছিল চারটি পাখা। সেই পাখার সর্বনিম্নে ছিল দুটি করে বল-বিয়ারিংএর খুড়া। মোট আটটি খুড়া। চারপায়ার প্রত্যেকটির উপরাংশে ছিল চারপাখার হেলিকপ্টার। সব মিলিয়ে আর যাই হোক সেই নভশ্চরদের

নামবার যন্ত্রটি গোলাকৃতি কিন্তু ছিল না। 'তখন স্বর্গ খুলিয়া গেল' গ্রন্থে ব্লুমরিশ তেমনি ছবিই দেখিয়েছেন।

ব্লুমরিশ এই মহাকাশযানকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে অত্যন্ত উন্নত ধরনের বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'বর্তমানে মহাকাশযানের বহিরঙ্গে এমন আর কোনরকম গঠন বিন্যাসের কথা জানি না যা প্রচালন ও গঠনপ্রণালীর নানাতরো বিরুদ্ধ ব্যবস্থার মাঝে সমন্বয় সাধন করতে পারবে।'

মহাকাশযানের অন্যতম প্রধান সমস্যা হল তার ওজন ও আয়তন কমান। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অসুবিধা ঘটায় জ্বালানি বহন করার সমস্যা। কম জ্বালানি খরচ ক'রে বেশি ঘাত সৃষ্টি করতে পারলে মহাকাশযানের আকৃতি ও ওজন কমিয়ে আনা যায়। সেই জন্য আপেক্ষিক ঘাত [Isp] অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে প্রতি পাউণ্ড জ্বালানি খরচ ক'রে যে ঘাত সৃষ্টি করা যায়, তার মান যতো বেশি হবে মহাকাশযানের গঠন ততো উন্নত বলে বিবেচিত হবে। আপেক্ষিক ঘাতের পরিমাণকে সেকেণ্ডে প্রকাশ ক'রে উল্লেখ করলে দেখা যায় আজকের ব্যবহৃত পার্থিব মহাকাশযানের আপেক্ষিক ঘাতের [Isp] কিঞ্চিদধিক ৪০০ সেকেণ্ড। ব্লুমরিশের মতে ইজেকিয়েলের দেখা মহাকাশযানের Ispর মান ছিল অন্ততঃ ১০০০ সেকেণ্ড। আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে এ অভাবনীয়। মার্কারী, জেমিনি বা এ্যাপলোর গঠনে তা সম্ভব নয়। পৃথিবীর মানুষের দেখা একমাত্র মহাকাশযান বলে উল্লিখিত ইজেকিয়েলের এই যানের গঠন আর যাই বলা যাক, দানিকেনের একমাত্র সমর্থকের কথায়, গোলাকার বলা যাবে না। দানিকেন অবশ্য জোড়ের সঙ্গে বলেছেন, 'মহাকাশযান বা মহাকাশ স্টেশনের পক্ষে গোলকই কেন উপযুক্ত সে কথা আমার নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন গ্রন্থে বলেছি। সে কথার প্রতিবাদ কেউ করেননি।'৩(৩২) ব্লুমরিশের মহাকাশ যানের নক্সা কার্যতঃ তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দানিকেনের জোগান যুক্তির দারিদ্র্য সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়েছে দিব্যদর্শন সংক্রান্ত আলোচনাতে। সেখানে তিনি খোলাখুলিই বলে ফেলেছেন, 'আমি শুধু একটা উদ্ভট সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিতে পারি। কিন্তু একথা জানতেই হবে যে আমাদের তথাকথিত জানা ব্যাপারগুলোর সঙ্গে এটা ঠিক খাপ খাবে না। তবে আমার মনে হয় কাপুরুষের মতো মুখ লুকিয়ে বসে থাকার চেয়ে পারলে একটা তত্ত্ব যোগান অনেক ভাল।' এই 'অনেক ভালো' কাজ করতে গিয়েই তিনি তত্ত্ব জুগিয়েছেন এবং যুক্তিজালও বিস্তার করেছেন। তবে তা সত্যই 'একটা উদ্ভট সম্ভাবনার ইঙ্গিত' হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বৈজ্ঞানিক বিশৃঙ্খলা

মানবজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ অংশ হ'ল বিজ্ঞান। মানব সভ্যতাকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে আসতে বিজ্ঞান যে ভূমিকা পালন করেছে তা ছিল অপরিহার্য। বিজ্ঞান একদিকে চিন্তাকে দিয়েছে পূর্ণতা আর অপরদিকে মানুষের সীমাবদ্ধ ক্ষমতাকে করেছে উন্নীত। এই ভূমিকাগুলির ভিত্তি এত বাস্তব এবং ফলপ্রসূ যে যুক্তি তর্ক ক'রে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়নি। মানব বোধের মধ্যেই তা মিশে গিয়েছে। বর্তমান দুনিয়ায় তাই অবৈজ্ঞানিক কোন চিন্তা ভাবনা গ্রহণযোগ্য ব'লে বিবেচিত হতে পারে না।

বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়েছিল বস্তুকে চেনার মধ্যে দিয়ে। বস্তুর ধর্ম ও তার অন্তর্নিহিত শক্তি এবং বস্তুর বিকাশকে আবিষ্কারের মধ্যে দিয়েই বিজ্ঞানের অগ্রগতি সূচিত হয়। তাই বিজ্ঞানের আরেক নাম হল বস্তুবাদ। স্বাভাবিক কারণেই বাস্তবভিত্তিক চিন্তাভাবনার বিপরীতে অবৈজ্ঞানিক ভাব-প্রধান দর্শনেরও একটা স্থান আছে। বিজ্ঞানের সার্বজনীন গ্রাহ্যতাকে ভাব-প্রধান চিন্তা সবল বিরোধিতা করার চেষ্টা করেছে দীর্ঘকাল। সে পথের অসাফল্যই ভাববাদী দর্শনকে টেনে নিয়ে গেছে প্রথমতঃ নিজেকে বিজ্ঞানসম্মত এবং দ্বিতীয়তঃ বাস্তবভিত্তিক ব'লে প্রতিষ্ঠিত করবার দিকে। বিজ্ঞানকে বিকৃত করার চেষ্টা এরই ফলশ্রুতি।

কল্পনা আর মনোগত ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে দানিকেন যখনই কঠোর বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছেন তখন হয় বিজ্ঞানকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন, নয়ত বিজ্ঞানকে আংশিক উন্মোচনের মধ্যে দিয়ে কুহেলিকাময় ক'রে তুলেছেন এবং অবশেষে বিজ্ঞানকে বিশৃঙ্খলার রাজ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। বস্তুকে ভাবে আর ভাবকে বস্তুতে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন নানা ভাবে। সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত পথে অগ্রসর হবার অক্ষমতা থেকেই এর জন্ম। প্রথম দিকে হয়ত তিনি এই পর্যায়ে পৌঁছাবার কথা ভাবতে পারেননি। তার চমকে সকলে চমকে যাবেন এই হয়ত ছিল আশা। তাই তখন তিনিই শ্লেষের সঙ্গে বলেছিলেন, 'যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী হতে আমাদের আত্মসম্মানে বাধে।'১(১৬) অথচ তিনিই যুক্তি ছেড়ে অনুমানকে অবলম্বন করেছেন, আর বৈজ্ঞানিক বাস্তবতাকে শূন্যে ভাসিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা করেননি।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি রিলে রেসের মতো। আজকের অবস্থানকেই আরেকটু এগিয়ে নিয়ে আগামীকে সামনে ঠেলে দেওয়া হয়। নিউটনের আগে তাই আইনস্টাইনের জন্ম সম্ভব নয়, ডালটনের পূর্বে নিলস্ বোরের আবির্ভাব ছিল অসম্ভব। রকেটের আবিষ্কারের পূর্বে চাঁদে ভ্রমণের ভাবনা ছিল গল্পকল্প। আইনস্টাইনের যুগকে অতিক্রম না করে আলোর চেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন মহাকাশ-যানের চিন্তা হ'ল বৈজ্ঞানিক রোমাঞ্চ কথা। আলোর গতি কেন সর্বোচ্চ গতি সেই তত্ত্বের আলোচনা ও কেন তা সর্বোচ্চ গতি হওয়া সঠিক নয় তার প্রমাণের চেষ্টা ছাড়া আলোর চেয়ে অধিক গতির কথা বলার দুটি লক্ষ্য থাকতে পারে—হয় বিজ্ঞানকে বিশৃঙ্খলায় টেনে নেওয়া নয়ত বৈজ্ঞানিক গল্পকল্প সৃষ্টি করা। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে দানিকেন যেভাবে নাড়াচাড়া করেছেন তাকে আর যাই বলা যাক বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা বলা যায় না। শত শত বিজ্ঞানীর সারা জীবনের সাধনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকে এমন হেঁয়ালীর মতো উত্থাপন করেছেন যে সাধারণ পাঠক তা থেকে মর্মবস্তু উপলব্ধি করতে পারে না। আইনস্টাইনীয় গতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সন্দেহবাদী বলেন, সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইলের চেয়ে কোন গতির কল্পনা করা আর আকাশ কুসুম রচনা করা এক কথা। কারণ আইনস্টাইনই প্রমাণ করেছেন গতির চরম সীমাই হচ্ছে আলোর গতি। এ যুক্তি তখনই সঙ্গত যখন ধরে নেই যে ভবিষ্যতের মহাকাশযানকে উৎক্ষিপ্ত করা হবে লক্ষ লক্ষ গ্যালন জ্বালানির শক্তি দিয়ে, আর সেই শক্তিই তাকে ঠেলে নিয়ে চলবে মহাবিশ্বে। কিন্তু আজ তো 'রেডার' সেটই চালান হয় সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল গতি বিশিষ্ট তরঙ্গ দিয়ে।'২(১৯) এর দ্বারা একথাই সাধারণ পাঠকের কাছে মনে হ'তে পারে যে রাডার সেটের ক্ষেত্রে যখন ১৮৬,০০০ মাইল পর্যন্ত পৌছান গেছে তখন আরো গবেষণা করলে বোধহয় এই গতিবেগ অতিক্রম করা যাবে। অথচ তেমন ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা বিজ্ঞানের বিকৃতি সাধন ছাড়া কিছুই বলা যায় না। আইনস্টাইনের সর্বোচ্চ গতির তত্ত্ব কোন 'সন্দেহবাদের' ব্যাপার নয় এটি সম্পূর্ণ প্রমাণ সম্মত গাণিতিক সত্য।

বিকিরণের নানা ধরন আছে—যেমন তাপ, আলো, রাডার, বেতার প্রভৃতি। আপাতঃ পার্থক্য বোধ হলেও প্রকৃতিতে সমস্তই একই বস্তু—পার্থক্য কেবল তরঙ্গদৈর্ঘ্যে। এদের মহাশূন্যে চলার গতি এক এবং একই গাণিতিক তত্ত্বের সাহায্যে তা ব্যাখ্যাসম্ভব। সব তরঙ্গগুলির সাধারণ অভিব্যক্তি হল বিদ্যুৎ-চুম্বক বিকিরণ হিসাবে। রাডার-এর ক্ষেত্রে সুতরাং আজই ১৮৬০০০ মাইল

গতিতে চালান হচ্ছে, কথাটা বললে কাল-এর চেয়ে বেশী গতিসম্পন্ন হবার কোন বাধা নেই ব'লে মনে হতে পারে। বিদ্যুৎ-চুম্বক বিকিরণের নানা তরঙ্গদৈর্ঘ্য লক্ষ্য করলে একথা বোঝা অসুবিধাজনক হয় না যে রেডিও তরঙ্গ ও আলোর তরঙ্গ কার্যতঃ একই। তাদের গতির ভিতর পার্থক্য ঘটানোর চেষ্টা নিরর্থক।

বিদ্যুৎ চুম্বক তরঙ্গের বিভিন্ন নাম

'সন্দেহবাদীদের' কথার যৌক্তিকতা আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুসরণ ক'রে একটু বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। দানিকেন রাশিয়ার এক গবেষণার উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, 'তাঁরা একটা উড্ডীন-বাতি তৈরি করবেন যা উড়ে চলবে অত্যুত্তপ্ত গ্যাস নির্গমনের পরিবর্তে আলো বিকিরণের সাহায্যে। এভাবে যে গতিশক্তি লাভ করা যাবে তা হবে প্রচণ্ড।' ২ (২০) গ্যাসের সাহায্যে চালিত ইঞ্জিনের গতি নির্ভর করে নির্গত গ্যাসের ভরবেগের উপর। ভরবেগ বলতে বোঝায় কোন বস্তুর স্থির ভর (M) এবং তার বেগ (V) এই দুটির গুণফলকে। আলোর ক্ষেত্রে অর্থাৎ আলো-কণিকা ফোটনের গতি যতো বেশীই হোক ফোটনের স্থিরভর (M_0) হল শূন্য। গতিশীল অবস্থায়ও ফোটনের ভর শূন্যের কাছাকাছি। সুতরাং প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে MV-তে V-কে

বৃদ্ধি করলে যে গতিশক্তি লাভ করা যাবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে M_0C-তে C যতোই বিশাল হোক M_0 শূন্যতার জন্য কিংবা চলমান ফোটনের ভর M প্রায় শূন্যের কাছাকাছি হওয়ার ফলে ভরবেগের পরিমাণ প্রচণ্ড হওয়া কি সম্ভব ?

এর চেয়েও বিশৃঙ্খল জায়গায় বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যখন দানিকেন গতির সমাধানে মন্তব্য করেছেন, 'তা হলে ধরে নিতে পারি ফোটন চালিত ইঞ্জিন দিয়ে তৈরি একটা মহাকাশ যানকেও আলোর গতিতে তোলা সম্ভব হবে। তারপর আলোর গতি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই 'টাকিয়ন' চালিত ইঞ্জিনটিকে চালু করবে একটা কম্পুটার। বলুন তো কত জোরে, তখন মহাকাশযানটা ছুটবে ? আলোর চেয়ে একশ গুণ হাজার গুণ জোরে ? সে হিসাব আজ কেউ দিতে পারবে না।' ২ (২১) কথাগুলির ভিতর আপাতবিরোধিতা কিছু নেই বলে মনে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের আলোতে বিচার করলে দেখা যাবে সমগ্র বিষয়টি অবাস্তব কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে বিজ্ঞানের কাঠামোর ভিতরই তা করা দরকার। তা না হলে তাকে বিজ্ঞান না বলে তখন অন্য কিছু বলতে হয়।

আলোর চেয়ে একশকেগুণ হাজার গুণ জোরে ফোটন চালিত ইঞ্জিনের চলা আর মনের পাখা মেতির ঢঙে চলা—এই কথা দুটির ভিতর কোন পার্থক্য নেই। কেউ হয়ত প্রশ্ন তুলতে পারেন, ফোটন চালিত ইঞ্জিন আজ না হয় সম্ভব নয়, ভবিষ্যতে তো তৈরী হতে পারে ? তার কাছেই যদি বলা যায়, আজ না হয় মনের পাখা মেলা সম্ভব নয়, কাল তো হতে পারে ? তাহলে তিনিই হয়ত উত্তর দেবেন, আজের বিচারে তা হলে মনের পাখা মেলাকে বিজ্ঞান না বলে কল্পনাই বলতে হবে।

আইনস্টাইন প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছেন যে কোন বস্তুর যদি স্থির ভর হয় M_0 এবং গতি ভর হয় M, তা হলে সেই বস্তুকে v গতিতে তুললে সম্পর্ক দাঁড়াবে এই রকম, যখন আলোর গতি হল c।

$$M = \frac{M_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c}}}$$

স্বভাবতই বস্তুটির গতি যখন হবে আলোর গতির সমান অর্থাৎ $v = c$ তখন বর্গমূলের অন্তর্গত অংশটি হবে শূন্য। ফল দাঁড়াবে $M = \infty$ এ থেকে প্রমাণ হয়, কোন স্থিরভরসম্পন্ন বস্তুর গতি যদি আলোর গতির সমান হয় তবে ঐ গতিশীল অবস্থায় তার ভর হবে অসীম।

কোন বস্তুর গতিবেগ বাড়তে থাকলে সে তার নিজের গতি বিবর্ধক শক্তি বা বলকে ক্রমাগত বাধা দিতে চায় বলেই বস্তুটিকে অধিকতর বেগসম্পন্ন করতে হ'লে তার উপর অধিকতর বাইরের বল প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। $E/M = c^2 = K$ অর্থাৎ ধ্রুবক এই সমীকরণ অনুসারে সেই জন্য E যতো বাড়বে M ততোই বৃদ্ধি পাবে যেহেতু উভয়ের অনুপাত ধ্রুবক। E অর্থাৎ শক্তি বা বল ক্রমাগত বৃদ্ধি ক'রে গেলেও তার একটা সীমা আছে। M যখন অসীম হয়ে যাবে তার উপর প্রযোজ্য শক্তিও তখন অসীম হয়ে পড়া দরকার।

বিশ্বে বস্তু অসংখ্য। অসংখ্য বস্তু একত্র করেই অসীমের ধারণা সম্ভব। সুতরাং অসংখ্য বস্তুকে পৃথক পৃথক ভাবে আলোর গতিতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলে অসংখ্য এক একটি বস্তু থেকে এক একটি পৃথক পৃথক অসীম আকারের বস্তুতে পৌঁছান দরকার। সে এক অসম্ভব কল্পনা।

আবার অন্যভাবে দেখলে অসীম আকারের বস্তুর ভিতর অসীম শক্তি থাকা আবশ্যক। না হ'লে তাদের অনুপাত ধ্রুবক হতে পারে না। অসীম শক্তি প্রয়োগ ক'রে একটি বস্তুকে অসীমে পৌঁছে দিয়ে তার ভিতর অসীম শক্তি সঞ্চার করা এক অবাস্তব ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। বিশ্বের সামগ্রিক শক্তির মাঝখানে একটি বস্তুর ভিতর অসীম শক্তির সঞ্চার করা কোন মানব বুদ্ধিতেই সম্ভব নয়।

দানিকেন এ সব জেনেও বলেছেন, 'আপেক্ষিকতার তত্ত্ব চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে যে, যে-বস্তু আলোর গতির চেয়ে কম জোরে ছোটে, সে বস্তু সীমিত শক্তির প্রয়োগে আলোর গতির গণ্ডি কখনই ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। কিন্তু যদি অসীম শক্তি প্রয়োগ করা হয় তা হলে ?'৩(১৪১) তা হলে অনেক কিছুই হতো। কিন্তু তাতো হবার নয়। সসীম কোন প্রাণী অসীম শক্তি প্রয়োগ করতে পারে কি ? অসীম থেকে কোন কিছু বিচ্ছিন্ন হলেই আর অসীমকে পাওয়া সম্ভব নয়। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই একমাত্র অসীম শক্তি ও অসীম ভর সম্পন্ন হতে পারে।

আইনস্টাইন যখন দেখিয়েছেন যে কোন বস্তুর ক্ষেত্রে আলোর গতি লাভ করা সম্ভব নয়, তখন তিনি দুটি বিষয়কে শর্ত হিসাবে ধরেছেন। প্রথমতঃ সেটি একটি বস্তু, তরঙ্গ নয়। দ্বিতীয়তঃ তার একটি স্থির ভর রয়েছে। আলো যদিও কণার সমষ্টি। কিন্তু আলোক কণিকা অর্থাৎ ফোটন-এর কোন স্থির ভর নাই। ফোটন স্থির হয়ে যাওয়ার অর্থই হ'ল তার ভর শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া, অর্থাৎ ফোটন হিসাবে তার অস্তিত্বের অবসান। সুতরাং যারই স্থির-ভর আছে তার পক্ষে স্থির-ভরহীন ফোটনের গতি লাভ করা সম্ভব নয়। এখানেই বস্তুজগৎ ও ফোটনের গুণগত মূল পার্থক্য।

আলোর গতির উর্ধ্বে কোন বস্তুর গতিকে নিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ স্বভাবতই কাল্পনিক। দানিকেন টাকিয়নের প্রসঙ্গ তুলে তাকে এমনভাবে যুক্ত করেছেন যেন আলোর গতিতে একবার পৌছান গেলে তাকে ছাড়িয়ে যাওয়া খুবই সহজ ব্যাপার।

টাকিয়ন সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা এখনও ভ্রূণাবস্থায়। তত্ত্বগতভাবে একে কোন কোন বৈজ্ঞানিক তুলে ধরেছেন। তার প্রমাণ কিছু মেলেনি এখনো। তাঁদের মতে টাকিয়ন হ'ল এক কণার ধারণা যা আলো অপেক্ষা দ্রুতগামী। ইলেকট্রনের ভর যখন ৯·১০৯১ × ১০ ^{২৮} গ্রাম টাকিয়নের ভর তখন ধরা হয় তার ১০^{১৪} ভাগের একভাগ। অনুমান করা হয়ে থাকে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদি মুহূর্তে এই ধরনের কণিকার সৃষ্টি হয়েছিল। টাকিয়ন ও বিপরীত টাকিয়ন তখন থেকেই বিক্রিয়া ঘটিয়ে চলেছে পরস্পরকে ধ্বংস করার মধ্যে দিয়ে এবং বর্তমানে ব্রহ্মাণ্ডে কোন টাকিয়নের অস্তিত্ব সম্ভবত নেই।

তত্ত্বগতভাবে টাকিয়নের অস্তিত্ব মেনে নিলেও মনে রাখা দরকার যে ফোটনকে যেমন স্থির ভরে নিয়ে আসা সম্ভব নয়, তেমনি টাকিয়নকেও ফোটনের গতিতে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। এ যেন পরস্পর একত্র বসবাসকারী, অথচ একে অন্যের হাত ধরতে পারছে না। টাকিয়ন আলোর চেয়ে অধিক গতির অধিকারী হয়েও আলোর চেয়ে কমগতির জড়বস্তুকে সে আলোর গতিতে পৌছে দিতে পারে না। কারণ আলোর চেয়ে অধিক গতি হলেও তা সীমাবদ্ধ গতি—সসীম গতি। সসীম গতি যতো বেশীই হোক জড়বস্তুকে আলোর গতিতে পৌছে দিতে পারে না।

দানিকেন অতি সরলীকরণের ভিতর দিয়ে বিজ্ঞানের সত্যকে ঘুলিয়ে দিতে চেয়েছেন, 'উপপারমাণবিক কণা টার্ডিয়ন, লাকসন এবং টাকিয়নের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন এক উপপারমাণবিক জগৎও ঢুকে পড়েছে পদার্থবিদের 'খোঁয়াড়ে'। ওইসব কণার প্রত্যেকটি আলোর গতির চেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন তাদের আপন 'জাড্যিক ধর্মের' গণ্ডির ভেতরে।'৩(১৪১) এ তথ্য তিনি কোথা থেকে পেলেন আমাদের জানা নেই। তবে টাকিয়ন, টার্ডিয়ন প্রভৃতি কণাকে আলোর চেয়ে অধিক গতি সম্পন্ন বলে তিনি নানা সময় বলেছেন।

গতির সঙ্গে সম্পর্কিত ক'রে কণাকে তিনভাবে দেখা হয়—আলোর গতি সম্পন্ন, আলোর চেয়ে কম গতিসম্পন্ন এবং আলোর চেয়ে অধিক গতিসম্পন্ন। ফোটন হ'ল আলোর গতি সম্পন্ন কণা, টার্ডিয়ন হ'ল আলোর থেকে কম গতিসম্পন্ন কণা আর টাকিয়ন হ'ল আলোর থেকে অধিকগতি সম্পন্ন কণা। টার্ডি

কথাটার অর্থই হ'ল স্বল্পগতি, টাকি কথার অর্থ হ'ল দ্রুত। ফোটনের তুলনায় ধীর ও দ্রুত গতি বোঝাতে টার্ডিয়ন ও টাকিয়ন কথা দু'টি ব্যবহার হয়ে থাকে। সেই বিচারে পার্থিব বস্তুজগৎ টার্ডিয়ন কথার সৃষ্টি। তাদের সর্বোচ্চ গতি আলোর থেকে কম।

দেহ উপাদানে বিস্ময় :

এমনিতরো অনেক উদ্ভট বক্তব্যকে বৈজ্ঞানিক ভাবে উপস্থাপনার চেষ্টা হয়েছে নানাভাবে। তেমনি একটি ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলা হয়েছে, 'পৃথিবীতে প্রতিটি জৈবিক সত্তা মলিবডেনাম ধাতুর উপর নির্ভরশীল। অথচ সে ধাতুর প্রাচুর্য পৃথিবীতে নেই।' মানবদেহেও মলিবডেনাম স্বল্প হলেও আবশ্যকীয় উপাদান। অপ্রচুর হলেও তা যে পার্থিব এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ নেই। মানবদেহে কেবল মলিবডেনামই স্বল্প অবস্থিত নয়। স্বল্প উপস্থিত আবশ্যকীয় উপাদান রাসায়নিক গতিধারারই ফল। মানবদেহের উপাদানগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে মলিবডেনাম একই বিশেষ স্থান দখল করে নেই।

পদার্থ	শরীরে এগুলির পরিমাণ/শতকরা	কোথায় আছে
অক্সিজেন	৬৫ ভাগ	রক্ত, ফুসফুস, কোষ, জল, কার্বো-হাইড্রেট প্রোটিন, ফ্যাট প্রভৃতিতে
কার্বন	১৮.৫	কার্বহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট প্রভৃতিতে
হাইড্রোজেন	৯.৫ "	" "
নাইট্রোজেন	৩.৩ "	প্রোটিনে
ক্যালসিয়াম	১.৫ "	হাড় ও দাঁতে
ফসফরাস	১.০ "	হাড়, দাঁত ও কোষে
পটাসিয়াম	৩.৩৫ "	রক্ত ও অন্যান্য তরল পদার্থে
সালফার	০.২৫ "	কোন কোন প্রোটিনে
ক্লোরিন	০.২০ "	কোন কোন তরলে
সোডিয়াম	০.১৫ "	" ও রক্তে
ম্যাগনেসিয়াম	০.০৫ "	হাড়, দাঁত, মস্তিষ্কে

পদার্থ	শরীরে এগুলির পরিমাণ/শতকরা	কোথায় আছে
লৌহ	খুবই সামান্য	রক্তের হিমগ্লোবিনে
আয়ডিন	"	থাইরয়েড রসে
কোবাল্ট	"	ভিটামিন B-12-এ
ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা	"	এনজাইমে
তামা	"	রক্ত কোষে
সেলেনিয়াম	"	লিভার কোষে
ফ্লোরিন	"	দাঁতে
ব্রোমিয়াম	"	কোথায় ঠিক জানা যায় না
মলিবডেনাম	"	এনজাইমে।

এমনি খুব সামান্য উপাদানের উপস্থিতির সঙ্গে বিরাট কোন রহস্য জড়িত থাকার কোন কারণ নেই। মলিবডেনাম যেমন কম পাওয়া যায় কমই দেহতে আছে, আবার লৌহ তেমনি বেশী পাওয়া যায় অথচ খুব কম আছে। উদ্ভিদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ ক্লোরফিলের বৃহৎ অণুটিতে ম্যাগনেসিয়াম রয়েছে খুবই সামান্য, কিন্তু তা অত্যাবশ্যক। ক্লোরফিল অণু গঠিত হয় ক্লোরফিল-এ এবং ক্লোরফিল-বি এই দুটির সমন্বয়ে। ক্লোরফিল-এ তে ম্যাগনেসিয়াম আছে একটি, ক্লোরফিল-বিতেও তদ্রূপ। রাসায়নিক ফর্মুলা দেখলে বোঝা যাবে আনুপাতিকভাবে ম্যাগনেসিয়াম কত কম।

ক্লোরফিল-এ $= C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$

ক্লোরফিল-বি $= C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$
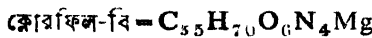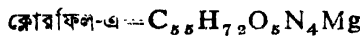
এখানে C = কার্বন, H = হাইড্রোজেন, O = অক্সিজেন, N = নাইট্রোজেন এবং Mg = ম্যাগনেসিয়াম।

এ সব থেকে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সামান্য কোন উপাদানের অপরিহার্য অস্তিত্বের জন্য মহাকাশের দিকে মুখ চেয়ে থাকবার কোন দরকার হয় না। প্রাকৃতিক গতির ধারাপথেই এমন হয়েছে।

এইভাবে দেখা যায় বৈজ্ঞানিক ধারণাকে দানিকেন কুহেলিকাময় ক'রে তুলেছেন।

বৈজ্ঞানিক ধারা বলতে আমরা বুঝি অনুমান, প্রমাণ ও সিদ্ধান্তের পথ ধরে এগিয়ে চলা। অনুমান ও কল্পনা মানুষকে পথের নিশানা দেখায়, প্রমাণ সেই পথকে নিশ্চিতভাবে গড়ে তোলে আর সিদ্ধান্ত হ'ল সেই পথের লভ্যবস্তু।

দানিকেন একদিকে লভ্যবস্তুকে আহরণ করতে গিয়ে প্রমাণের কষ্টকর পথকে পরিহার করেছেন। আর তা করতে গিয়ে প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে পর্যন্ত নাকচ করে দিয়েছেন। যদিও তিনিই মন্তব্য করেছেন তাঙ্গুস্কার উল্কাপাত প্রসঙ্গে, 'যতদিন না সে সবের নির্ভুল সন্দেহাতীত কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কেউ উপস্থিত করছেন ততদিন বিশ্বাসযোগ্য যে কোন ব্যাখ্যাকে কোন কারণ না দর্শে উড়িয়ে দেবার অধিকার কারো নেই।'১(১২৯) বিশ্বাসযোগ্য 'ব্যাখ্যা'কেই কোন কারণ না দর্শে উড়িয়ে দিতে দানিকেনের আপত্তি, অথচ প্রমাণিত বহু তত্ত্বকে তিনি নির্বিবাদে উড়িয়ে দিয়েছেন যেমন তেমন ভাবে।

পৃথিবীতে প্রাণীর উৎপত্তি, প্রাণীর বিবর্তনের পরিণামে মানুষের উদ্ভব, মানুষের বুদ্ধি ও চৈতন্যে জীন-এর প্রভাব, মানব মস্তিষ্কের বিশিষ্টতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে দানিকেন নির্বিচারে মন্তব্য করেছেন; যখন যেটুকু খুশী গ্রহণ করেছেন, কাটছাঁট করেছেন এবং মনগড়াভাবে তাকে বদলিয়েছেন। তাঁর মনগড়া প্রকল্পের স্বার্থে ছুঁড়ে দেওয়া মন্তব্যের সঠিক সমালোচনা হ'তে পারে সঠিক বৈজ্ঞানিক বিষয় বস্তুটুকু তুলে ধরার ভিতর দিয়েই।

জড় থেকে প্রাণ সৃষ্টিতে সন্দেহ :

জড় থেকেই চেতনের প্রাদুর্ভাব। জড় ধর্মের মধ্যেই চেতনের আবির্ভাবের মূলগুণ নিহিত রয়েছে। প্রাকৃতিক সমস্ত ঘটনাই অন্তর্বস্তুর বিকাশে নতুনের প্রাদুর্ভাবের ধারা পথে এগিয়ে চলে। জড় পদার্থে যদি প্রাণের কোন মূল অবস্থান না থাকত তা হ'লে জড় থেকে জীবের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ছিল না। প্রাকৃতিক সমস্ত বস্তু ও ঘটনার পারস্পরিক এই সম্পর্ক নির্ণয় করতে না পারার জন্যই প্রাণীজগতকে এক পৃথক ধারা ব'লে দেখার ভাববাদী প্রয়াস ঘটে। দানিকেনের প্রশ্নও তেমনি মনোভাবের পরিচয় দেয়, 'জীবন কি তা হ'লে প্রকৃতির লটারীতে কোন টিকিট ওঠার মতো ব্যাপার নাকি।'৩(১৬৬) জীবন যে লটারীর টিকিট নয় তা অনুসন্ধান ক'রে দেখা যাক।

জীবনের ধর্ম প্রধানতঃ চারটি। এই গুণগুলি পদার্থিক ধর্মেরই গুণগত উত্তোরণ।

এক : জীবের নির্দিষ্ট অবয়ব ও গঠন রয়েছে। জীবের সর্বাপেক্ষা মৌলিক একক হ'ল তার কোষ, যার সুনির্দিষ্ট গঠন আছে। পদার্থের একক হ'ল তার পরমাণু। পদার্থের ভৌত গঠন আর প্রাণীর কোষ গঠন পরস্পর তুলনীয়। ভৌত পদার্থের তেজ হ'ল তার শক্তি, কোষযুক্ত প্রাণীর জীবন হ'ল তার শক্তি।

রাসায়নিক ক্রিয়া হ'ল বস্তুর পরিবর্তনের গতি। বিপাক ক্রিয়া হ'ল প্রাণীর পরিবর্তনের সূত্র। প্রাণীকোষে যখন ক্রোমসোম ও জীনের পরিবর্তন ঘটে চলেছে, পদার্থের পারমাণবিক গঠনের মধ্যেও তেমনি প্রতিনিয়ত পরিবর্তমানতা কাজ ক'রে চলেছে মৌলিক বস্তুকণার ক্রিয়ার ফলে। তাছাড়া মৃত কোষের গঠনে তো জড়বস্তুই খুঁজে পাওয়া যায়।

স্থূলভাবে কেলাসের মধ্যেও আমরা দেখি অবয়ব। এই অবয়ব নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই গড়ে ওঠে। একটি দ্রবণে দ্রবর কণাগুলির কোন ক্রম বা সুনির্দিষ্ট অবয়ব নেই। কিন্তু কেলাস গঠিত হ'লে তার নির্দিষ্ট অবয়ব দেখা যায়। কোয়াগুলেটের তেমনি নির্দিষ্ট অবয়ব রয়েছে।

দুই : বিপাক ক্রিয়া প্রাণীর বৈশিষ্ট্য। প্রাণী খাদ্য গ্রহণ করে। তা থেকে প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ ক'রে অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় অংশ বর্জন করে। প্রাণীর প্রাণধারণ সম্ভব হয়—গ্রহণ, আত্মীকরণ ও বর্জনের প্রক্রিয়ার ফলে। জড় বস্তু-ধর্মেও এই গুণের অত্যন্ত আদিম এক রূপ দেখতে পাওয়া যায়।

লবণের কেলাসকে যদি অতিসংপৃক্ত দ্রবণে রাখা যায় তবে দেখা যাবে পার্শ্ববর্তী দ্রবের কণা গ্রহণ করে সে নিজ দেহ বৃদ্ধি করছে। এ হ'ল এক তরফা গ্রহণ ও বৃদ্ধি।

স্পনজি প্লাটিনামকে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড দ্রবণে ডুবিয়ে দিলে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ধাতুর গায়ে শোষিত হয়ে প্লাটিনাম পার-অক্সাইড ও হাইড্রেট তৈরি হবে। হাইড্রেট তারপর বিশ্লিষ্ট হয়ে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, জল ও স্পনজি প্লাটিনামে পরিণত হবে। গ্রহণ ও বর্জনের এ হ'ল এক অতি সরল উদাহরণ।

তিন : জীব নিজেকে পুনরুৎপাদন করে। আদিম ধরনের প্রাণী দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে প্রতিটি অংশ আবার ক্রমশঃ বড় হয়ে পূর্ণাঙ্গ আকার ধারণ করে। যে কোন প্রাণীদেহের বৃদ্ধি ও কোষবিভাজন এই পথেই ঘটে চলে।

বস্তুজগতে ফিটকিরি দু'টি টুকরো হয়ে গেলে তাকে যদি অতি সংপৃক্ত দ্রবণে ডুবিয়ে দেওয়া হয় তবে দেখা যাবে টুকরো দু'টির ভেঙে যাওয়া অংশ পূরণ হয়ে গেছে এবং পূর্বের আকার ধারণ করেছে। একটি ফিটকিরি ভেঙে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দুটোতে পরিণত হয়েছে।

চার : প্রাণী নানা ধরনের উত্তেজনায় সাড়া দেয়। তার মধ্যে সর্বপ্রধান হ'ল উষ্ণতা বা শৈত্যে সাড়া দেওয়া এবং যে কোন চাপে সাড়া দেওয়া। কোন

প্রাণী উত্তেজিত হ'লে কিছু শক্তি ব্যয় করে। নড়াচড়া করে। অর্থাৎ তার মধ্যে কিছু গতি লক্ষিত হয়।

বহু জড়পদার্থের ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা দেখা যায়। সাপ-বাজীতে আগুন দিলে বা উষ্ণতা বৃদ্ধি করলে রাসায়নিক ক্রিয়া তার দেহকে অপরিমিত বৃদ্ধি করে। গরম বা ঠাণ্ডায় বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া উত্তেজনায় সাড়া দেবার উদাহরণ। চাপের ফলে আয়তন হ্রাস পাওয়া আবার চাপ কমিয়ে নিলে তার বৃদ্ধি বায়বীয় পদার্থে প্রত্যক্ষ করা যায়। উপরিভাগের চাপ তুলে নিলে জল বাষ্পে পরিণত হয় অর্থাৎ স্থির জল বিশেষ ভঙ্গিতে নড়াচড়া করে ওঠে।

খুব সংক্ষেপে বললে প্রাণী-বৈশিষ্ট্যকে বলা যায় রাসায়নিক ও বস্তুগত প্রবাহের অধিকারী ও পুনরুৎপাদনের গুণসম্পন্ন। প্রাণী বাইরে থেকে পদার্থ ও শক্তি গ্রহণ ক'রে এবং প্রয়োজনমত আত্মসাৎ ক'রে বাকি অংশ বের ক'রে দেয় রাসায়নিক প্রবাহের ভেতর দিয়ে। এই কার্য-পরিচালনার সঙ্কেত প্রাণী দেহে অবস্থান করছে ডি. এন. এ.-র মাধ্যমে। ডি. এন. এ. যোগায় এনজাইম; এনজাইম ঘটিয়ে চলে সহস্র ধারায় পরিবর্তনের স্রোত। প্রাণী এরই মধ্যে দিয়ে নিজেকে করে বিকশিত ও পুনরুৎপাদন। আভ্যন্তরিণ সঙ্কেত আর বহির্জাগতিক বস্তু ও শক্তি রাজ্যের এক পারস্পরিক সংশ্লিষ্ট গতির ফলই হল প্রাণী।

ওপারিন ও হালডেনের গবেষণার পর প্রাণী সৃষ্টি নিয়ে আধিবিদ্যক কোন ধারণার আর স্থান নেই। জড় থেকে প্রাণী সৃষ্টির সেই ইতিবৃত্ত অনুধাবনের পরও দানিকেন দেহ থেকে চেতনাকে পৃথক করে দেখেছেন, 'সব শক্তিই যদি একে অন্যে রূপান্তরিত হতে পারে (অল্প সংখ্যক সম্পূর্ণ স্বীকৃত মতবাদের একটা) মৃত ব্যক্তিদের চিৎ শক্তির রূপান্তরও তা হ'লে নিশ্চয়ই সম্ভব।......আধুনিক গবেষণা নাকি অব্যাখ্যাত রহস্যের কৃষ্ণ যবনিকা উত্তোলন করলেন ব'লে, আর ইতিমধ্যেই যা সে আবিষ্কার করেছে তাতে মনে হচ্ছেন মৃত ব্যক্তির চেতনা (অহং চিৎশক্তি) মরে যায় না।'৫(২৩৭)

শক্তি আর পদার্থকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় পৃথক ভাবা গেলেও তা যে একই বস্তুর ভিন্ন দশা সে সম্পর্কে আজ আর কোন অস্পষ্টতা নেই। শক্তিতরঙ্গ বিদ্যুৎচুম্বক এক বিশাল অফুরন্ত ভাণ্ডার। সেখানে ফোটনের গতি ভঙ্গিমা কখনো তরঙ্গের কখনো কণিকার। তাই ব'লে একগুচ্ছ শক্তি একটা আত্মার অবয়বে প্রাণী জীবনের রূপ নিয়ে ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান করছে, এমন চিন্তা ভাববিলাসী কল্পনা মাত্র। প্রাণী আসলে বস্তুর-ই জটিল বিকাশ। প্রাণ হ'ল সেই জটিল পদার্থিক একটি বিশেষ অবস্থায় গুণগত উত্তোরণের প্রকাশ। সেই

সুজটিল অবস্থার ভারসাম্য ও বিক্রিয়া যতক্ষণ রক্ষিত হয় ততক্ষণই জীবন অস্তিত্ব রক্ষা ক'রে থাকে। আর জটিল বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে তার প্রকাশ প্রাণও অন্তর্হিত হয়ে যায়। প্রাণ দেহ ত্যাগ ক'রে একগুচ্ছ শক্তি বা আত্মার রূপ ধরে ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরে বেড়ায় না।

সরল থেকে জটিলতার পথে পদার্থের বিকাশের পিছনে দার্শনিকেরা অদৃশ্য ক্রীড়নকের হাত দেখতে পেয়েছেন। তাই প্রশ্ন করেছেন 'কোন্ আদি শক্তি রাসায়নিক বস্তু সমূহকে জীবন গঠনের উপযুক্ত উপাদানে গড়ে তুলেছিল ?'৩(১৬৬) কিন্তু আমরা জানি জীবন গঠনের উপাদান প্রকৃতির স্বাভাবিক গতির মধ্যে থেকেই গড়ে উঠেছে। কোন চালককে তার জন্য খুঁজে বের করতে হয়নি।

গ্যাসীয় অবস্থা থেকে পৃথিবী তরল এবং ক্রমশঃ জমে কঠিন পদার্থে পরিণত হবার প্রাক্কালে প্রচণ্ড তাপে সুদৃঢ় কার্বাইড তৈরি হয়। এই কার্বাইড পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ থেকে বাইরে চলে এসে জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিশে তৈরি করে হাইড্রোকার্বন। তখন পৃথিবীতে প্রাণ ব'লে কিছু ছিল না। একগুচ্ছ শক্তির সমন্বয়ে গড়া আত্মাও ভেসে বেড়াত ব'লে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

রাসায়নিক ভাবে পদার্থই ক্রমশঃ জটিল রূপ ধারণ করেছে এবং মহাজটিল প্রাণীদেহ সৃষ্টি করেছে।

হাইড্রোকার্বন হ'ল হাইড্রোজেন আর কার্বনের সবচেয়ে সরল যৌগ। এর সাধারণ নাম প্যারাফিন। রাসায়নিক ফর্মূলা C_nH_{2n+2} এখানে n=1 হ'লে তার নাম মিথেন, n=2 হ'লে তার নাম ইথেন, n=3 হ'লে তার নাম প্রপেন প্রভৃতি। অন্যরকম হাইড্রোকার্বনও অবশ্য আছে। C অর্থ কার্বন পরমাণু আর H অর্থ হাইড্রোজেন পরমাণু ধরলে মিথেন, ইথেন, প্রপেনের গঠন হবে নিম্নরূপ :—

```
      H              H    H              H    H    H
      |              |    |              |    |    |
    — C — H      H — C  — C — H      H — C  — C  — C — H
      |              |    |              |    |    |
      H              H    H              H    H    H
```

মিথেন ইথেন প্রপেন
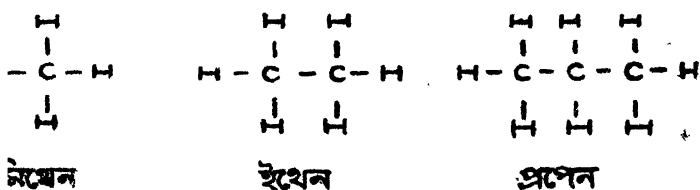
এখানে H পরমাণুর জায়গায় যখন একটি OH যুক্ত হবে অর্থাৎ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সমন্বিত হাইড্রক্সিল গ্রুপ যুক্ত হবে তখন সাধারণভাবে বলা হয়
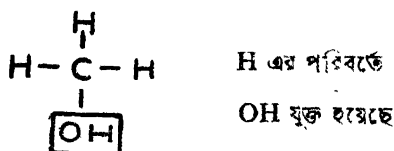
অ্যালকোহল। যেমন মিথাইল অ্যালকোহল। রাসায়নিক ফর্মুলা এই রকম :—

```
     H
     |
 H — C — H
     |
   [OH]
```

H এর পরিবর্তে OH যুক্ত হয়েছে

মিথাইল অ্যালকোহল

হাইড্রোকার্বনের H পরমাণু যদি একাধিক OH গ্রুপ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয় তবে সৃষ্টি হয় গ্লিসারল। প্রপেন থেকে গ্লিসারল হবে নিম্নরূপ :—

```
     H    H    H
     |    |    |
 H — C —  C —  C — H
     |    |    |
     OH   OH   OH
```

গ্লিসারল
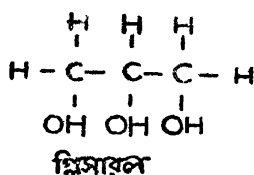
অ্যালকোহল থেকে আরো জটিল যৌগ হ'ল ইথার। দুইটি অ্যালকোহল অণু পরস্পর যুক্ত হচ্ছে একটি জলের অণুকে পরিত্যাগ ক'রে। সৃষ্টি হচ্ছে ইথার। ডাই মিথাইল ইথারের উৎপত্তি এই ভাবে :—

```
    H                 H                          H           H
    |                 |                          |           |
H — C —[OH  H]O — C — H   ———→  H—OH  + H — C — O — C — H
    |                 |                          |           |
    H      জল         H           জল             H           H
মিথাইল অ্যালকোহল  মিথাইল অ্যালকোহল         ডাইমিথাইল ইথার
```
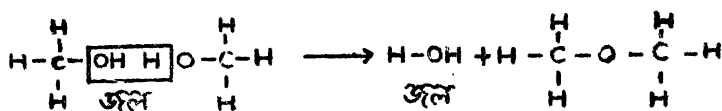
এমনিভাবে দেখা যাবে OH এর জায়গায় যদি O থাকে তবে পাওয়া যাবে অ্যালডিহাইড, যদি NH_2 অর্থাৎ অ্যামিন গ্রুপ থাকে তবে পাওয়া যাবে অ্যামাইন, যদি COOH অর্থাৎ কার্বক্সিল গ্রুপ থাকে তবে পাওয়া যাবে ফ্যাটি অ্যাসিড ইত্যাদি। অর্থাৎ আণবিক গঠনের ভিন্নতা জটিলতার পথে এগিয়ে চলেছে। অ্যালডিহাইড গঠনের রাসায়নিক সঙ্কেত এই রকম :— [পৃ. ১১৬]

অ্যালডিহাইড থেকে অণু আরো জটিল হয়েছে এ্যাসিড গঠনের পথে। যেমন—ফর্মালডিহাইড থেকে ফর্মিক এ্যাসিড, অ্যাসিটালডিহাইড থেকে

এ্যাসিটিক এ্যাসিড। অ্যাসিডের রাসায়নিক গঠনে যুগপৎ O এবং OH গ্রুপ লক্ষ্য করা যায়।

$$H-\overset{\displaystyle H}{\underset{\displaystyle H}{C}}-OH + O \longrightarrow H-O-H + H-\overset{\displaystyle H}{C}=O$$
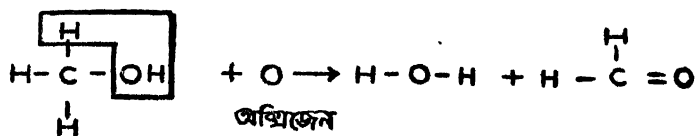
মিথাইল অ্যালকোহল — অক্সিজেন — জল — ফরম্যালডি হাইড

এই জাতীয় এ্যাসিড CO OH অর্থাৎ কার্বক্সিল গ্রুপ দিয়ে চিহ্নিত করা যায় ব'লে একে কার্বাক্সলক অ্যাসিড বলে। কার্বাক্সলক অ্যাসিডের মতই যদি

$$H-\overset{\displaystyle H}{\underset{\displaystyle H}{C}}-\overset{\displaystyle H}{\underset{\displaystyle H}{C}}-H + O \longrightarrow H-O-H + H-\overset{\displaystyle H}{\underset{\displaystyle H}{C}}-\overset{\displaystyle H}{C}=O$$
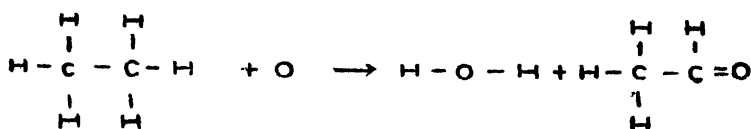
ইথাইল অ্যালকোহল — অক্সিজেন — জল — অ্যাসিট্যালডি হাইড

H এর জায়গায় NH_2 অর্থাৎ এ্যামিনো গ্রুপ থাকে তখন তাকে এ্যামিন অ্যাসিড বলে। যেমন :—

$$H-\overset{\displaystyle NH_2}{\underset{\displaystyle H}{C}}-\overset{\displaystyle OH}{C}-O \quad \text{অথবা} \quad NH_2-\overset{\displaystyle H}{\underset{\displaystyle H}{C}}-COOH$$

গ্লাইসিন
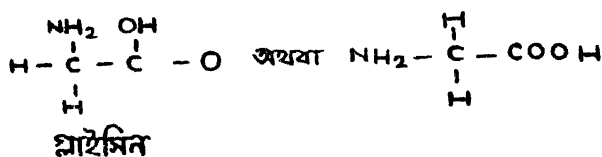
অ্যামিন অ্যাসিড হ'ল প্রাণীদেহের অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান। রাসায়নিক জৈব যৌগ গঠনে ২০টি অ্যাসিড হ'ল মূল। যদিও প্রকৃতিতে ২৫টি বিভিন্ন
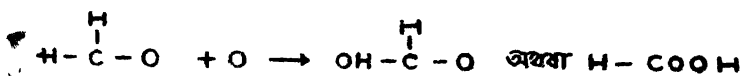
$$H-\overset{\displaystyle H}{C}-O + O \longrightarrow OH-\overset{\displaystyle H}{C}-O \quad \text{অথবা} \quad H-COOH$$

ফর্মালডি হাইড — অক্সিজেন — ফর্মিক অ্যাসিড

$$H-\overset{\displaystyle H}{\underset{\displaystyle H}{C}}-\overset{\displaystyle H}{C}-O + O \longrightarrow H-\overset{\displaystyle H}{\underset{\displaystyle H}{C}}-\overset{\displaystyle OH}{C}-O \quad \text{অথবা} \quad H-\overset{\displaystyle H}{\underset{\displaystyle H}{C}}-COOH$$

অ্যাসিট্যালডি হাইড — অক্সিজেন — অ্যাসিটিক অ্যাসিড

ধরনের অ্যামিন অ্যাসিড দেখতে পাওয়া যায়।
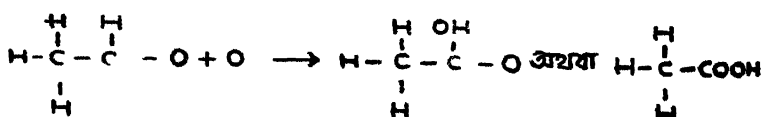
সংহত ফর্মুলাতে এইভাবে দেখলে অণুর ক্রমশঃ জটিল হওয়াকে সহজে বোঝা যেতে পারে :

$CH_4 \rightarrow CH_3OH \rightarrow CH_3CH_2OH \rightarrow CH_3CHO \rightarrow$

মিথেন মিথাইল অ্যালকোহল ডাই মিথাইল ইথার এ্যাসিট্যালডিহাই

$CH_3COOH \rightarrow CH_2NH_2COOH$

এ্যাসিটিক এ্যাসিড গ্লাইসিন

একই ভাবে অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড, অ্যাসিড—এই ভাবে অণুর ক্রমশঃ জটিলতর হয়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে কার্বহাইড্রেট বা শ্বেতসার, শর্করা, সেলুলোজ এবং প্রোটিন যা প্রাণীর মূল উপাদানগুলির অন্যতম।

কার্বহাইড্রেটের সাধারণ ফর্মুলা হল CxH2yOy বা Cx $(H_2O)y$। কার্বহাইড্রেটকে দুভাবে ভাগ করা হয়—সুগার ও ননসুগার। প্রথম ধরনের শর্করা হল গ্লুকোজ, দ্বিতীয় ধরনের স্টার্চ, সেলুলোজ। উপরের ক্রমবিকাশের ধারায় সর্করাকে বলা যায় এ্যালডিহাইড গ্রুপসহ পলিহাইড্রিক অ্যালকোহল।

গ্লুকোজের রাসায়নিক ফর্মুলা এইভাবে দেখা যায়—$CH_2OH(CHOH)_4CHO$ সংক্ষেপে $C_6H_{12}O_6$ সরল থেকে জটিল হবার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর মিলবে গ্লুকোজের সাংকেতিক ফর্মুলা দেখলে :—

```
     OH  OH  OH  OH   OH  H
     |   |   |   |    |   |
 H - C - C - C - C  - C - C
     |   |   |   |    |   ||
     H   H   H   H    H   O
```
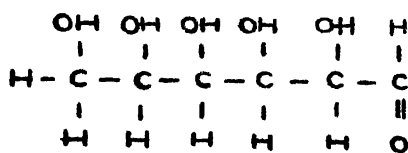
গ্লুকোজ

একই দৃষ্টিতে সহজের জটিলতর হওয়াকে বোঝা যাবে যখন দেখা যায়

```
H-C=O
  |
  H
```
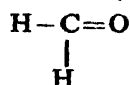
এর ছটি মিলে গ্লুকোজ তৈরি হয়েছে।

রসায়নের বিশেষজ্ঞ না হয়েও এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কিভাবে সরল অণু থেকে প্রাকৃতিক বিবর্তনের গতিতে জটিল অণু গঠিত হয়েছে। আর বলাই বাহুল্য যে জটিলতর অণু বস্তু ধর্মকেও নতুনতর, জটিলতর করে তুলেছে ক্রমে ক্রমে।

প্রোটিন হ'ল পদার্থ স্বরূপের বিকাশের পথে এক দুরূহ বিরাটকার অণু। শত শত পরমাণুর এক ধারাবাহিক শৃঙ্খলাবদ্ধ এই অণুই প্রাণীর গঠনের প্রধান উপাদান। প্রধানতঃ কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, সালফার

কখনও কখনও ফসফরাস, আয়ডিন ও ধাতুর পরমাণু সহযোগে প্রোটিন অণু গড়ে ওঠে।

প্রোটিন গঠনের সাধারণভাবে একটি এইভাবে দেখা যেতে পারে :—

```
                        H
                        |
O  H    H   H — C — H          H                 H
‖  |    |       |              |        |        |     |
—C—C — N— C  — C — N  — C — C  — C — C—N  — C — C — C—
   |        ‖   |    |    ‖   |    ‖   |   |    ‖   |    |
H — C — H   O   H    H    O   C    O       H    O  HH-C—H
    |   H                     |                       |
  — C — C—H              H — C — H                    H
    |   |                     |
    H   H                H — C — H
                              |
                         H — C — H
                              |
```
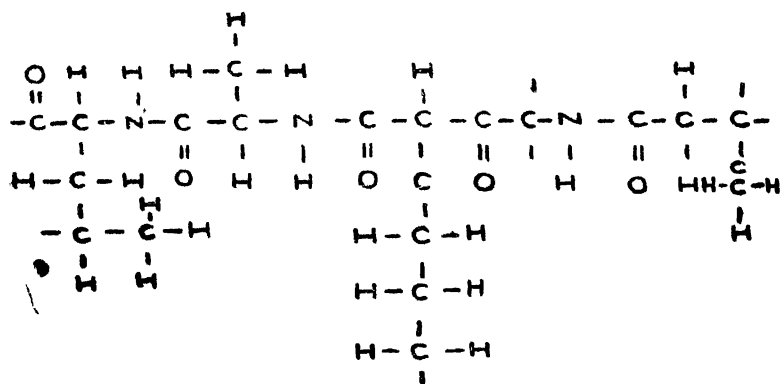
প্রোটিন অনুর একটি অংশ

এই ভাবেই জৈব উপাদান সৃষ্টির পথে প্রথমে সরল অণু অর্থাৎ মনোমার সৃষ্টি হয় তারপর দুরূহ জটিলতার যাত্রাপথে পলিমার সৃষ্টি হয়—এই ভাবেই প্রাণকোষের উৎপত্তি।

জীবন সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের অণু সন্দেহাতীতভাবে পদার্থিক কার্যকারণ থেকেই উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক ঐ সমস্ত জটিল ক্রিয়াকাণ্ডের শক্তির উৎসও নানা পরীক্ষার পর জানা গেছে। সেগুলি হ'ল—

(১) সৌরশক্তি। পৃথিবীর আবহমণ্ডলে বর্তমানে যে ওজন স্তর আছে তা অতীতে ছিল না। সেই জন্য অতিবেগুনী রশ্মি কোন বাধা না পেয়ে পৃথিবীর বুকে আসতে পারত একেবারে সরাসরি।

(২) পটাশিয়াম, থোরিয়াম, ইউরেনিয়াম ও রেডিও সক্রিয় বিকিরণ শক্তি জুগিয়েছে। যদিও এ শক্তি পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগেই প্রধানতঃ নিহিত ছিল।

(৩) আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ-জাত শক্তি।

(৪) আকাশের বিদ্যুৎ থেকে পাওয়া শক্তি।

(৫) উল্কাপাতের সঙ্গে বাহিত উত্তাপও শক্তির ভূমিকা পালন করে।

(৬) তারার বিস্ফোরণ-জাত শক্তি।

* ব্লকে আঁকা জেন বণ্ডগুলি 'ডবল' পড়তে হবে।

জড় থেকে চেতনের ক্রম উত্তরণের এক ধারাবাহিক গতি লক্ষ্য করা যায় এইভাবে :—

জৈবিক বিবর্তন

বহুকোষী প্রাণী সমূহ।

↑

উচ্চতর কোষ হবার গুণসম্পন্ন অবস্থা।

↑

একে বলে ইউকারায়োটিক কোষ ১০০০ মিলিয়ন বৎসর।

↑

বাতাস গ্রহণকারী জীবাণু।

↑

ক্লোরোফিল সম্বলিত অত্যন্ত আদিম কোষ।

↑

ফটোসিনথেসিসের কিছু পিগমেণ্ট দেখা দিয়েছে।

↑

ফটোসিনথেটিক জীবাণু। জল থেকে অক্সিজেন নেয় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে অক্সিজেন বের ক'রে দেয়।

↑

অবায়ুভোগী কোষ॥ প্রথম জীবিত কোষ।....৩০০০ মিলিয়ন বৎসর।

↑

রাসায়নিক যৌগ-বিবর্তন

আত্মোৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন কোষ। প্রোটসেল।

↑

কোয়াসারভেট। প্রথম প্রাণ ও জড়ের মিলন বিন্দু। জড়েতে জীবনের তরঙ্গ সৃষ্টি।

↑

অ্যামিন অ্যাসিড, প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড প্রভৃতি প্রাণীদেহের মূল উপাদান।

↑

কার্বন ডাই-অক্সাইড, হাইড্রজেন, জল, নাইট্রোজেন, হাইড্রো কার্বন প্রভৃতি মৌলিক উপাদান।

প্রাণ যে জড়বস্তুরই পরিণাম এ কথাকে অস্বীকার ক'রে দানিকেন তবু বলেছেন, 'মানুষ মরে যায়। তার চেতনা চলে যায় কালহীন রাজ্যে শক্তির রূপ ধরে।' ৫(২৪৯) দানিকেনের কালহীন রাজ্যের সন্ধান বিজ্ঞান আজো পায়নি। আর শক্তির রূপ ধরে মানুষের চৈতন্য কীভাবে কোথায় চলে যায় সে তাঁরই গবেষণার ব্যাপার। কিন্তু প্রাণী বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে চেতন জড়বস্তুরই গুণগত উত্তরণ আর তার ধারাও আজ জ্ঞাত।

জড় ও প্রাণের মিলন বিন্দু হ'ল সমুদ্র কোয়াসারভেট। কোয়াসারভেট জড়পদার্থে প্রথম স্পন্দনের ঝঙ্কার তোলে। এক ভেঙে দুই হওয়া, গড়া ও

তাণ্ডার জীবনের ছন্দ বিশাল সমুদ্র বক্ষে এই কোয়াসারভেটই প্রথম তুলেছিল। পৃথিবীর বুকে পদার্থ ও তেজ গতির তরঙ্গ তুলে যাত্রা শুরু করেছিল দৃষ্ট বস্তু থেকে দ্রষ্টা হবার পথে। কোয়াসারভেট তারই পথরেখা।

তরল পদার্থের ভিতর কোন কঠিন পদার্থ দিলে সেই কঠিন পদার্থ তরল পদার্থের অণুগুলির মাঝে স্থান ক'রে নেয়। সেই স্থান ক'রে নেবার সময় যে সমস্ত কঠিন পদার্থের অণুগুলি ঠেলাঠেলি ক'রে এবং তাদের আকর্ষণে পাশাপাশি আসতে পারে তারা পরস্পর কাছাকাছি এসে বড় হয়ে নীচে পড়ে যায়, হয় অদ্রবণীয়।

কোন অদ্রবণীয় পদার্থের কণাকে যদি খুব মিহি করে গুঁড়ো করে তরল পদার্থে মিলিয়ে দেওয়া যায় তবে তা থিতিয়ে নীচে পড়ে না। সেই ক্ষুদ্র কণা নিজের ভারেও নীচে পড়তে পারে না। উপরন্তু তরলের অণুর ইতস্ততঃ গতির ধাক্কায় এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে। এই রকম দ্রবণকে কলয়ডাল দ্রবণ বলে। কলয়ডাল রেণুর মাপ ৫০০০ আংস্ট্রম পর্যন্ত হতে পারে [১ আংস্ট্রম—১ ইঞ্চির ২৫ কোটি ভাগের একভাগ] এই রকম হাজার থেকে কোটি পর্যন্ত রেণু হতে পারে।

কলয়ডাল দ্রবণে রেণুগুলো ধাক্কাধাক্কি করতে গিয়ে অনেক সময় পরস্পর আকর্ষণেও এসে পড়ে। ফলে বড় দানা হয়ে থিতিয়ে পড়তে পারে। এই ভাবে যুক্ত হতে গিয়ে রেণুগুলো কখনো দানার আকার পায় কখনো জালের আকার পায়। জালের মতো কণার বেষ্টনীতে তরল আটকা পড়লে তা জেলির মতো হয়ে ওঠে।

প্রাণীকোষের প্রোটপ্লাজম এমনি একটি কলয়ডাল দ্রবণ জলের মধ্যে প্রোটিন, স্নেহ, শর্করা, লবণ প্রভৃতি দ্রবীভূত হয়ে এই দ্রবণে নানা ক্রিয়া ঘটায়। একই সঙ্গে কোন অংশ জেলির মতো হয়ে ওঠে কোন অংশ বা জেলির মতো হবার পূর্বাবস্থা পায়। কোনও অংশ হয় বিদ্যুৎবাহী, কোন অংশ বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ। জেলির মতো আবরণ কোথাও বা পাতলা ঝিল্লির মতো। এই ধরনের কলয়ডাল দ্রবণ এক অনন্ত গতিসম্পন্ন। সর্বক্ষণ এই দ্রবণে নানা অবস্থান্তর ঘটে চলেছে।

কলয়ডাল দ্রবণে নানাপ্রকার পদার্থ থাকতে পারে। জলীয় দ্রবণে নানাপ্রকার পদার্থের রেণুর মাঝখানে থাকে জল। এই অবস্থায় পদার্থের রেণুগুলো পরস্পরের কাছে আসতে গিয়ে মাঝখানে পাতলা জলের আবরণ গড়ে তোলে। এর ফলে পদার্থের রেণু তার মাঝে জলের পর্দা; তারপরে পদার্থের রেণু এমনি সব মিলিয়ে

এক একটা ঝাঁক বেঁধে ফেলে। ঝাঁকবাঁধা রেণুগুলোর চারদিকে আবার জলের আবরণ থাকে। এইভাবে জলের পর্দাঘেরা রেণু ও জলের ঝাঁক মিলে যে ফোঁটাটি গড়ে তোলে তা বুদ্বুদের আকার নিয়ে ভাসতে থাকে। একেই বলে কোয়াসারভেট। এই গঠনই কোয়াসারভেটে এনে দেয় গতি। ফোঁটার বাইরের রেণুও কাছে আসতে চায়, ফোঁটাটি কখনো বড় হয়, কখনও ভেঙে যায়—এমনি ধারা ছুটোছুটি আকর্ষণ, বিকর্ষণ, ভাঙাগড়া শুরু হয়ে যায়।
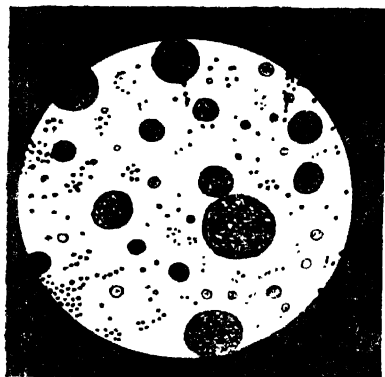
সরল কোয়াসারভেট

জটিল কোয়াসারভেট

পৃথিবীর আদিম উষ্ণ সমুদ্রে কলয়ডাল দ্রবণে গড়ে উঠেছিল কোয়াসারভেট। কোয়াসারভেটের গতি সমুদ্রজলে আবার বিশেষভাবে রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে অনুক্ষণ। কোয়াসারভেটগুলি বাইরের অণুকে নিয়ে কখনও বড় আকার নিয়েছে, কখনও বেশী বড় আকার নিলে আবার বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

বিভক্ত অবস্থায় আবার বড় হবার চেষ্টা করেছে। পদার্থিক ও জৈবিক-ধর্মের এ হ'ল এক অভূতপূর্ব মিলন বিন্দু। প্রোটপ্লাজমের এক অতি আদিম রূপ। কোটি কোটি বছর ধরে কোয়াসারভেট তার ভাঙাগড়ার জীবনস্পন্দন জাগিয়ে রেখেছে সমুদ্র বক্ষে।

কোয়াসারভেট বাড়তে থাকলে দ্রবীভূত পদার্থের ঘাটতি দেখা দিতে থাকে। তখন দৃঢ়সংঘবদ্ধ কোয়াসারভেটই টিকে থাকতে পেরেছে। অন্যগুলি দৃঢ় হবার চেষ্টা করেছে, নয় ভেঙে গিয়ে দৃঢ় কোয়াসারভেটের ইন্ধন জুগিয়েছে।

কোয়াসারভেটের রাসায়নিক জটিলতা, স্পন্দনের অভিনবত্ব এবং তার উপর

সৌর শক্তির ক্রিয়া ক্রমশঃ তাকে আরো জটিল ও আরো স্পন্দনশীল পথে নিয়ে এসেছে। তাপ, অতিবেগুনী রশ্মি ইন্ধন জুগিয়েছে তার বিকাশে। গড়ে উঠেছে প্রাণীকোষ-উপম এক অতিআদিম কণা। এ থেকেই যাত্রা হয়েছিল জীবনের। এই পর্যায়ে সবচেয়ে গুণগত উত্তরণ ঘটেছে যখন জীবনঅণু প্রাণ সঙ্কেতের উপাদান ডি. এন. এ.কে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে নিজ জীবনবৃত্তের মাঝখানে।

প্রাণী সৃষ্টির এই ইতিহাসে জীবনকে আর আত্মাকে পৃথকভাবে দেখার কোন অবকাশ নেই। অবকাশ নেই জীবনকে পৃথক সত্তা ভেবে পদার্থের দেহে তার সাময়িক অবস্থান চিন্তা করা। দানিকেনের অবশ্য এর পরেও জিজ্ঞাসা, 'যে আদি "স্যুপের" উপর জীবন ভাসমান ছিল তেলের ফোঁটার মধ্যে সে আদি স্যুপের আনাজ, মসলা এল কোথা থেকে?' ৩(১৮৭) প্রশ্ন করার জন্যই এ প্রশ্ন বিজ্ঞানের শক্ত দেয়ালে প্রতিহত হয়ে প্রশ্নকর্তার কানেই ফিরে যাবে। দানিকেন প্রাণ সৃষ্টির ব্যাপারে প্রশ্নই করেন নি, তিনি প্রশ্নচ্ছলে, অবজ্ঞার দৃষ্টিতে, দৃঢ়তার সাথে মানুষের আবির্ভাবের গোটা ইতিহাসটাই পাল্টে দিতে চেয়েছেন এবং বলা বাহুল্য এখানেও সেই গলাবাজীতেই।

অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাস

মানুষ যে পার্থিব প্রাণীজগতের ক্রম অভিব্যক্তির ধারার ফলশ্রুতি এ কথা একসময় প্রচুর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে বিবর্তনবাদী তত্ত্বকে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত সত্য বলেই সকলে মনে করেন। বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত জীবাশ্ম ও কঙ্কাল এই তত্ত্বের সত্যতাকে ক্রমশই সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে চলেছে। দানিকেন অবশ্য বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে নতুন ক'রে বিবর্তনবাদের সত্যতাকে চ্যালেঞ্জ ক'রে বসেছেন এবং এ ক্ষেত্রেও যথারীতি তাঁর সম্বল মুখের জোর। তিনি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, 'আমি ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ তত্ত্ব খণ্ডন করব।' (৬-১৮) চার্লস ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের বিপক্ষে আজ পর্যন্ত কোন নৃতাত্ত্বিক আবিষ্কারই হয় নি। তথাপি দানিকেন তাঁর দেবতাকে সর্বনিয়ন্তা হিসাবে তুলে ধরবার জন্য মানুষের স্রষ্টা ব'লে চিত্রিত করতে চেয়ে বলেছেন, 'এ সব আবিষ্কার প্রমাণ করে ঠিক ক'রে আমরা কিছুই বলতে পারি না। কারণ পাঠ্যপুস্তকে আজ যে সাল তারিখ লিখি কাল তাতে সন্দেহ জাগে, নতুন কিছু পেলেই। এত এত নজির পাওয়া সত্ত্বেও মানুষের উৎপত্তি এবং তার ক্রমোন্নতির পরম্পরগত ধারার যে হদিস মেলে না তা সহজেই অনুমেয়। এ

কথা নিশ্চিত যে মানবাকৃতি জীব থেকে মানুষ পর্যন্ত জাতিগত ক্রমোন্নতির হদিস করতে গেলে দেখা যায়, লক্ষ লক্ষ বছর আগেও তারা ছিল। কিন্তু তাদের বুদ্ধির উদয় সম্পর্কে কিছুই বলতে পারি না। অতি সামান্য কিছু ইঙ্গিত থাকলেও পুরোপুরি কিছু মেলে না। মানুষের 'বুদ্ধির উদয়' সম্পর্কে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য একটা ব্যাখ্যাও আজ পর্যন্ত পাবার সৌভাগ্য হয়নি। সে 'অলৌকিক' ঘটনা কেমন ক'রে যে ঘটল সে বিষয়ে অনেক তত্ত্ব, অনেক জল্পনা বর্তমান, সেই জন্যই বিশ্বাস করি, আমার সিদ্ধান্তও প্রণিধানযোগ্য।'২(২৩) এত এত প্রমাণ সত্ত্বেও 'মানুষের উৎপত্তি এবং তার ক্রমোন্নতির পরম্পরাগত ধারার' হদিস তিনি পান নি। তার থেকে নিজের 'সিদ্ধান্ত' বেশী নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। মনে করাকে বিজ্ঞান আটকাতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞান যে হদিস দেয় তা যতক্ষণ না আরো উন্নত আরো বৃহত্তর সত্যের বিচারে বাতিল হচ্ছে ততোক্ষণ তাকে উড়িয়ে দেয় না, দানিকেন দিলেও।

ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের মূল বক্তব্য হ'ল :—

এক বিরামহীন মন্থর ক্রম-পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সুদীর্ঘ কালপ্রবাহের পরিণামেই উদ্ভূত হয়েছে নানা প্রকার প্রাণীজগৎ। এই ক্রমবিবর্তনের প্রধান ভিত্তি হ'ল :

(১) **অত্যধিক বংশ বিস্তার**—উদ্ভিদ বা প্রাণী অসংখ্য বংশধর জন্ম দিলেও তার সবগুলি শেষ পর্যন্ত বাঁচে না।

(২) **বাঁচার জন্য প্রতিযোগিতা**—যে সমস্ত সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে তাদের ভিতর চলে খাদ্য সংগ্রহ ও পরিবেশের সন্ধানের জন্য সংগ্রাম। এই সংগ্রামে যারা পরাজিত হয় তারা বেঁচে থাকতে পারে না।

(৩) **জীবন সংগ্রাম**—বেঁচে থাকার জন্য অবিরাম সংগ্রাম। প্রথমতঃ অন্তপ্রজাতি সংগ্রাম—খাদ্য ও পরিবেশের জন্য একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত প্রাণীদের নিজেদের ভিতর পরস্পর সংগ্রাম। দ্বিতীয়তঃ আন্তপ্রজাতি সংগ্রাম—বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতায় নানা প্রজাতির ভিতর সংগ্রাম। তৃতীয়তঃ পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম—প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম।

এই তিনটি বিষয় একত্রে 'জীবন সংগ্রাম' নামে অবিহিত হ'তে পারে।

(৪) **প্রকারণ**—একই প্রাণীর সন্তান সকলে একরকম হয় না। তারা নানা রকম হয়ে থাকে। এই পরিবর্তন মূলতঃ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হ'লেও তাই আগামীতে ভিন্ন পথ সৃষ্টি করে।

(৫) **প্রাকৃতিক নির্বাচন**—প্রকৃতিতে টিকে থাকার জন্য অনুকূল প্রকা-

রণের কল্যাণে উপযুক্তেরা বেঁচে থাকতে পারে। যে ভিন্নতা প্রাকৃতিক অবস্থায় প্রতিকূলতা গড়ে তোলে তারা টিকে থাকতে পারে না।

(৬) বংশগতি—একটি প্রকারণ এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে সঞ্চারিত হয় এই পরিবর্তন ক্রমে পরবর্তী বংশতে বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা দেয়। এইভাবে প্রজাতি ক্রমশঃ বংশকে এগিয়ে নিয়ে চলে।

ডারউইন প্রাণীজগতের অভিব্যক্তি সম্পর্কে যে তত্ত্ব আবিষ্কার করেন তা ছিল অভিনিবেশ সহকারে প্রাণী বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে লক্ষ্য করার ফল। তার মূল কারণ তখন জানা সম্ভব ছিল না। প্রাণীতত্ত্বের বহু আবিষ্কার তখন পর্যন্ত অজানা ছিল।

পরবর্তী সময়ে বংশ প্রকারণ ও তার গুণ সম্পর্কে প্রাণীতত্ত্বের কোষ প্রক্রিয়া এক নতুন জগতকে তুলে ধরে। ক্রোমসোম ও জীনের আবিষ্কার আর তাদের ধর্ম থেকে প্রাণীর পরিবর্তনশীলতার কারণ আরো সঠিকভাবে জানতে পারা যায়। কোষ বিভাজনের মধ্যে দিয়ে জীনের বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটতে পারে। বিভিন্নরকম বংশগতি ধর্মসম্পন্ন জননকোষ পরস্পর মিলিত হতে পারে। নানা প্রাকৃতিক কারণে ক্রোমসোমের প্রকৃতি বদলে যেতে পারে। বিভিন্ন প্রজাতি উৎপত্তির মূল কারণ হ'ল এইগুলি।

পরিবর্তন প্রত্যেক পুরুষেই কিছু না কিছু হয়ে থাকে। কিন্তু পরিবর্তন যখন অধিক সংখ্যক জীবের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাধিত হয় তখনই নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে। তারা প্রজননের দিক থেকেও স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও তার উপর মহাজাগতিক ক্রিয়ার বৈচিত্র্য স্বভাবতই প্রজাতির ভিন্নত্ব গড়ে তুলতে সহায়তা করে। প্রাকৃতিক পরিবর্তন কম ঘটলে প্রজাতির প্রকারণের ক্ষেত্রেও সংকুচিত হয়ে পড়ে। ক্রোমসোম সূত্রের আভ্যান্তরিণ পরিবর্তন একমাত্র কারণ হয়ে নতুন নতুন প্রজাতির উৎপত্তি ঘটাতে পারে না।

অভিব্যক্তিবাদী তত্ত্ব প্রমাণিত হয়েছে পৃথিবীতে প্রাপ্ত প্রাচীন যুগের বিভিন্ন সময়ের কঙ্কাল ও জীবাশ্ম ইত্যাদি থেকে এমন অনেক প্রাণীর কথা ডারউইন কেবলমাত্র কার্যকারণ থেকে উল্লেখ করেছেন মাত্র। পরবর্তী সময়ের আবিষ্কার সেই উল্লেখের সত্যতাকে প্রমাণিত করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেশে সংগৃহীত লক্ষ লক্ষ জীবাশ্ম পৃথিবীর ভৌগোলিক বৎসরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রাণীবিবর্তনের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেছে। আজ পর্যন্ত সেখানে কোন ব্যতিক্রমের সন্ধান মেলে নি।

জলচর প্রাণী থেকে উভচর তা থেকে `দ্রুত ব'লে ধরা হয়। যদিও এই
অনুমান করা হয়েছিল একজাতীয় মাছের অস্তিত্ব নি। এককোষী জীবের
পাখনা ছাড়াও আরো দুটি পাখনা সামনের দিকে ছিল। শাজ করত প্রাণহীন
দিয়ে এই চারটিই পাখির পাখা ও পা এবং মানুষের বর্তমান হ।
করেছে।. কিন্তু পৃথিবীর মাছে তেমন পাখনার কোন সন্ধান পাওয়া যা! ওলা,
সেই মাছের অস্তিত্ব আজ থেকে পাঁচ কোটি বছর আগে থাকবার কথা। মী

বিস্ময়ের ও আনন্দের কথা হ'ল, সত্যই এমন মাছের সন্ধান পাওয়া যায় দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্রে ১৯৩৮ সনে। ১৯৫২ এবং ১৯৫৬ সনে মাদাগাস্কারে এই ধরনের মাছের আরো সন্ধান মেলে। এই মাছের নাম কয়লাকান্ত। কয়লাকান্তের কোঁপরা ছাড়াও নীচু ধরনের ফুসফুস দেখতে পাওয়া যায়। পাখি ও মানুষের পূর্বপুরুষের সাক্ষাৎ সন্ধান এইভাবে মিলে গেল।

কীভাবে ঐ মাছ টিকে ছিল সে গবেষণার ক্ষেত্র আলাদা। কিন্তু অনুমান করা হয় সমুদ্রতলদেশে পাহাড়ের গহ্বরে যে জল বহু বৎসরেও প্রবল নড়াচড়া ক'রে পরিবর্তিত হয় না, সেখানে এই ধরনের মাছ হয়ত টিকে গিয়েছে। এ কথা অবশ্য মনে করা ঠিক হবে না যে এই মাছই ক্রমবিবর্তিত হয়ে উভচর প্রাণীর জন্ম নিয়েছে। তা হয়ে থাকলে সে মাছ অবলুপ্ত হবার কথা। এটি হ'ল উভচর প্রাণী হবার পথে একটি শাখা। যে শাখা আর বিবর্তনের ধারায় এগিয়ে যেতে পারে নি। বিবর্তিত যে মাছ থেকে পাখি ও মানুষের উৎপত্তি তারা আজ অবলুপ্ত। সে মাছের নাম বিপিডিসটিয়া। কয়লাকান্ত হ'ল বিপিডিসটিয়ার অবলুপ্ত অস্তিত্বের জলন্ত প্রমাণ।

এমনিভাবেই ডারউইনের বিবর্তনের ধারা নানাভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞান সম্মত সংক্ষিপ্ত ধারাপথ অনুসরণ করার সুবিধার জন্য পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক যুগের সঙ্গে মিলিয়ে সংক্ষেপে প্রাণীবিবর্তনকে লক্ষ্য করলে 'পরম্পরা ধারা' খুঁজে না পাওয়ার কোন কারণ নেই। দানিকেনের হদিস না-পাওয়াটা খরগোসের চোখ বুজে থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখার মতো। ভূতত্ত্ব অনুসারে পৃথিবীর যুগ-বিভাগ এই রকম :—

পৃথিবীর ভূ-তাত্ত্বিক যুগবিভাগ
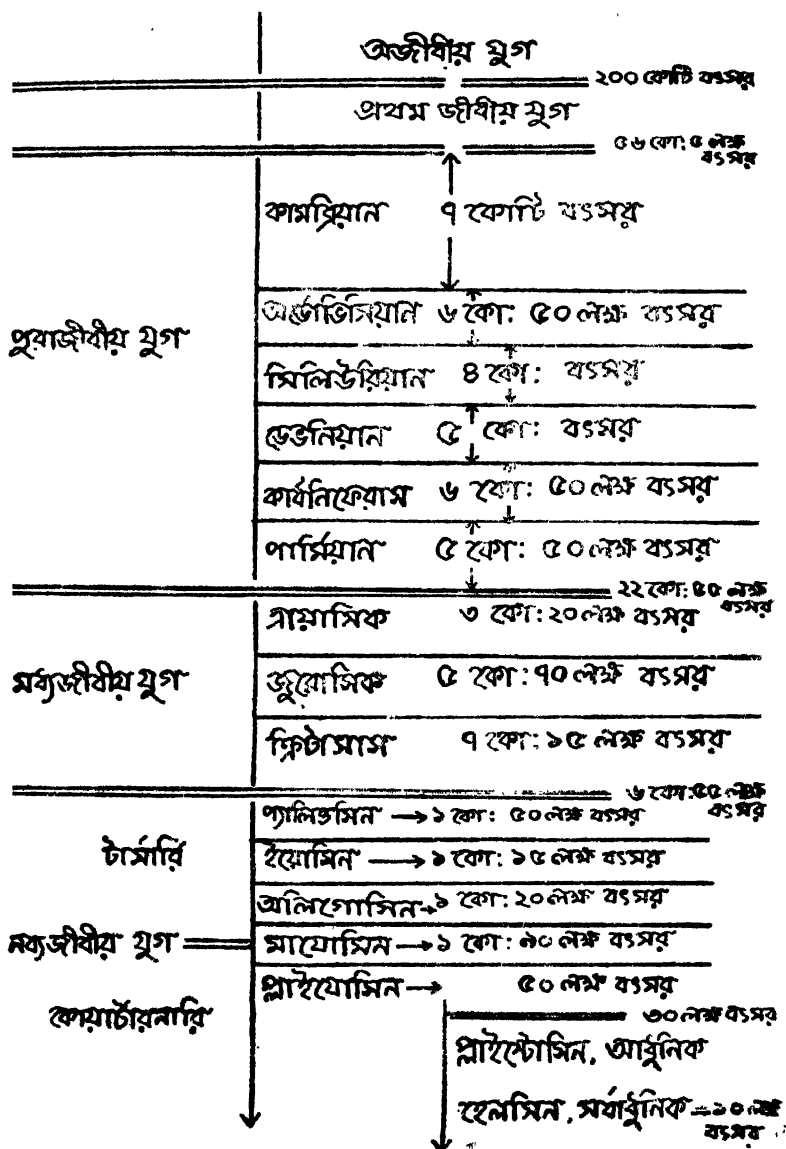
প্রথমজীবীয় যুগেই আদি জীবনের সূত্রপাত ব'লে ধরা হয়। যদিও এই আদি প্রাণীদেহের কোন জীবাশ্ম পাওয়া সম্ভব হয় নি। এককোষী জীবের সরলতম সামুদ্রিক প্রাণীই ছিল একমাত্র জীবন। স্থলে বিরাজ করত প্রাণহীন নিস্তব্ধতা।

কাম্ব্রিয়ান যুগ থেকেই প্রাণী বিবর্তনের সূত্রপাত। সামুদ্রিক শ্যাওলা, জেলিমাছ, স্পঞ্জ, পোকামাকড় ইত্যাদি এই সময়ের প্রাণী। উদ্ভিদ, উদ্ভিদভোজী প্রাণী ও জীবাণুই এই সময়ের তিনপ্রধান বিভাগ। প্রায় হাজার রকমের প্রজাতি ইতিমধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেছে।

অর্ডোভিসিয়ান যুগে সমুদ্র বারবার সরে গিয়েছে। ফলে প্রাণীকুল সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে গিয়েছে। স্থলভাগ ও জলাভূমিতে প্রাণী ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। তবে স্থলচর প্রাণীর তখনও সূত্রপাত ঘটে নি। মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব এই সময় হয়েছে। ঠিক কীভাবে কোথা থেকে মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব হয় তা খুব সঠিক ভাবে চিহ্নিত করা যায় না। অস্ট্রাকোডার্ম নামে এক জাতীয় এই সময়ের মাছের কঙ্কালের ফসিল পাওয়া গেছে যুক্তরাষ্ট্রের কোলারাডো অঞ্চলে। ট্রাইলোবাইট ও আমোনাইট এ যুগের উল্লেখযোগ্য প্রাণী।

সিলিউরিয়ান যুগে মূলতঃ সমুদ্রেই জীবজগৎ থাকলেও ডাঙায় প্রাণী উঠতে শুরু করেছে। মাছের প্রাদুর্ভাব এই যুগে। মাকড়সা ও বিছার পূর্বপুরুষ ইউরিপটেরিডস এই সময়ের প্রাণী। সামুদ্রিক উদ্ভিদ ব্যাপকভাবে ডাঙায় দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। বিছাজাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী স্থলের উপর ঘোরাফেরা শুরু করেছে। এই সময়ের ভূত্বকে স্থলচর প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে। সিলপসিড হ'ল স্থলচর উদ্ভিদের নমুনা। সাগরের অন্ধকার থেকে স্থলভাগের আলোর রাজ্যে প্রাণীর যাত্রা আরম্ভ হয়।

ডেভনিয়ান যুগে ভূত্বকের বিরাট পরিবর্তন হয়। আগ্নেয়গিরির দাপটে সমুদ্র ঠেলে ওপরে ওঠে; কোথাও বা মাটি গহ্বরে পরিণত হয়। মেরুদণ্ডী প্রাণী এ সময়ে প্রধান হয়ে ওঠে। সমুদ্রে মাছের দাপট এ যুগের বৈশিষ্ট্য। স্থলভাগে শিকড়ওয়ালা গাছের প্রাদুর্ভাব হয়। সম্পূর্ণভাবে স্থলজ উদ্ভিদ এই সময়ে দেখা দেয়।

কার্বনিফেরাস যুগে স্থলভাগে গাছের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। প্রাণীজগতে শুরু হয় নানা সম্প্রসারণ। আদিমতম সরীসৃপ কটিলোসর, সর্ববৃহৎ পতঙ্গ মেগানয়রা এই সময়ের প্রাণী। ডানাওয়ালা পতঙ্গ, সরীসৃপ, ডিম থেকে

বাচ্চা হওয়া, বিরাট বিরাট গাছ প্রভৃতি যুগের এ বৈশিষ্ট্য। ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তনে এই যুগেই গাছ চাপা পড়ে পিট, লিগনাইট, কয়লা সৃষ্টি হয়।

পার্মিয়ান যুগে প্রাণী ও উদ্ভিদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে দুই ধারা—বীজ থেকে গাছ হওয়া এবং ডিম থেকে প্রাণী হওয়ার রীতিমত প্রসার ঘটে। কোন প্রাণীর শিং, কারো পাখনা গজায়, কেউ মাংসাশী হয়; প্রাণীর রূপান্তর প্রক্রিয়া নানা ভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। উন্নত মেরুদণ্ডী প্রাণীর উৎপত্তি হয়। প্রেকোডার্ম, ট্রাইলোবাইট, ইউরিপটেরিড প্রভৃতি অবলুপ্ত হয়।

এই ছ'টি যুগকে একত্র ক'রে বলা হয় পুরাজীবীয় যুগ। পুরাজীবীয় প্রাণী থেকেই পরবর্তী সময়ে আরো বিচিত্র সব প্রাণীর উদ্ভব ঘটে।

ট্রায়াসিক যুগে সরীসৃপদের ব্যাপক প্রাধান্য ঘটে। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম জীব ডাইনোসরাস এই সময়ের উল্লেখযোগ্য প্রাণী। এই যুগেই উন্নত-প্রাণীর জয়যাত্রা শুরু হয় স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রাদুর্ভাবের মধ্যে দিয়ে। যদিও স্তন্যপায়ী প্রাণী ছিল খুবই ছোট।

জুরোসিক যুগের সর্বাপেক্ষা প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল গাছে ফুল ফোটা। ফুলের জীবাশ্ম এই যুগের শিলাস্তরেই প্রথম পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ পাখি না বললেও আর্কিওপ্টেরিক্স নামে এক জাতীয় পাখি এ সময়ে দেখা দেয়। জুরাসিক যুগে ফুলফোটা ও পাখি ওড়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সূত্রপাত। কিন্তু তার দ্রষ্টার আবির্ভাব বহু পরে।

ক্রিটাসাস যুগে প্রচুর প্রাণীর অবলুপ্তি ঘটে, কারণ সমুদ্র ভূতাত্ত্বিক কারণে অগভীর হয়ে ওঠে। জল উষ্ণ হয়ে যায়। স্থলভাগে সপুষ্পক উদ্ভিদ ব্যাপক-ভাবে ফুটতে শুরু করে। বর্তমান কালের মতো পাখি বেশী বেশী ক'রে দেখা দেয়।

এই তিনটি যুগকে মিলিয়ে মধ্যজীবীয় যুগ বলা হয়। প্রাচীন ধরনের জীব আর আধুনিক জীবদের মধ্যেকার ভাগ হিসাবে এই যুগ বর্তমান।

টার্শারী যুগ থেকেই আধুনিক প্রাণী জগতের সৃষ্টি। এর পাঁচটি উপ-বিভাগ প্যালিয়োসিন, ইয়োসিন, অলিগোসিন, মাইয়োসিন এবং প্লাইয়োসিন। শেষোক্ত চারটি যুগ ধরেই মনুষ্য প্রজাতির বিবর্তন ঘটে চলে। প্লাইয়োসিন যুগের খুব পরিষ্কার কোন চিত্র পাওয়া যায় না।

স্তন্যপায়ীদের একচেটিয়া প্রাধান্য হ'ল এ যুগের বৈশিষ্ট্য। হাঙর, মাছ, কচ্ছপ, গিরগিটি, সাপ, কুমীর প্রভৃতি প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছে এ যুগের শুরুতে। বিশাল স্থলভাগ এ যুগে একত্র ছিল। সেই বিশাল স্থলভাগে উন্নত প্রাণী বিবর্তন শুরু হয়।

বৃক্ষারোহী প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের দুই প্রকার বানরের দেখা মিলল এই যুগে। মনুষ্যসদৃশ প্রাণী গেরিলা, শিম্পাঞ্জীদের আবির্ভাব ঘটতে থাকে।

কোয়ার্টারনারী যুগ দুই ভাগে বিভক্ত—প্লাইস্‌টোসিন ও হেলসিন—অর্থাৎ আধুনিক ও সর্বাধুনিক কাল। এ যুগে আদিম মানুষের প্রাদুর্ভাব ঘটে গেছে। বরফ যুগের বৈশিষ্ট্য এ যুগের বৈচিত্র্য গড়ে তোলে। অন্ততঃ চারবার পৃথিবী বরফে ঢেকে যায়। তারপর বরফ গলতে শুরু করে। মনে করা হয় যে চতুর্থ যুগের শেষে বরফ গলা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। সম্পূর্ণ গলা শেষ হয়ে গেলে জল সমুদ্র থেকে আরো ১০০/১৫০ ফুট উঁচু হয়ে উঠবে।

এই দুই ভাগকে নিয়ে নব্যজীবীয় যুগ গঠিত। নব্যযুগীয় পর্বে মানব বিবর্তনকে ভালভাবে লক্ষ্য করলে ডারউইনের তত্ত্বের আরো পরিষ্কার ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। দানিকেন অবশ্য তাকে 'মোটামুটি সন্তোষজনকও' মনে করতে পারছেন না।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল এই যে প্রাণীবিবর্তনের এই তত্ত্ব দানিকেনের তত্ত্বের মতো কেবল একটি ব্যাখ্যা নয়, এ তত্ত্ব হ'ল সম্পূর্ণ প্রমাণসম্মত। ভূতাত্ত্বিক যুগের সঙ্গে প্রাণীবিবর্তনের এই ধারা একটি মালার মতো গেঁথে আছে। নানা যুগের শিলাস্তর যেন প্রাণী বিবর্তনের এক একটি যুগচিত্র। যার গায়ে জীবাশ্মের ছবি দিয়ে সমগ্র যুগটিকে এঁকে রাখা হয়েছে। আজ পর্যন্ত এমন কোন আবিষ্কার হয় নি যা থেকে দেখা যায়, হয়ত পুরাজীবীয় যুগে মধ্যজীবীয় প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গেল; কিংবা পুরাজীবীয় যুগে হয়ত মিলল ফুলের সন্ধান। বরঞ্চ ঠিক উল্টো, নতুন নতুন আবিষ্কার এই বিবর্তনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রমাণ হিসাবে দেখা দিয়েছে। দানিকেন প্রাণী বিবর্তনের 'পরম্পরা ধারার' মধ্যে সন্দেহের কারণ খুঁজে পেলে দুই একটা তেমন প্রমাণ উপস্থিত করুন না। একটা ঘোড়ার কঙ্কাল যদি কার্বনিফেরাস যুগের কয়লা স্তরে দেখাতে পারেন অথবা পার্মিয়ান যুগে সরীসৃপের মাঝখানে যদি টিয়া পাখির জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন তা হ'লে অবশ্যই বিবর্তনের ধারাকে 'সন্তোষজনক' মনে করা কঠিন হবে। কিন্তু সে রকম কোন ওলটপালট দানিকেনের মনোজগতে প্রতিফলিত হতে পারে কিন্তু বাস্তবে তেমন আজ পর্যন্ত ঘটে নি।

নবজীবীয় যুগে মানুষের বিবর্তনের ধারা ডারউইন যে সময়ে উত্থাপন করেন তখন প্রতিটি প্রজাতির কঙ্কাল বা জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই বিবর্তনের ধারাবাহিকতা নানা ধরনের নরকঙ্কাল আবিষ্কারের ভিতর

দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে। তবু দানিকেনের সন্দেহ, 'প্রাক মানব জীব যাদের চেহারা তখনো বাঁদরের মতো তাদের থেকে নিয়ান-থে্যাপিডদের অর্থাৎ যে মানবগোষ্ঠী আমাদের পূর্বপুরুষ তাদের অতিক্রান্ত পৃথকীভবন দেখে প্রত্নতাত্বিক কুল বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। আজো পর্যন্ত এ ঘটনার মোটামুটি যে ব্যাখ্যা তাঁরা দেন তা হ'ল স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন।'২(৩৫) বিবর্তনের ব্যাখ্যাকে এমন লঘু সন্দেহের মধ্যেই তিনি সীমাবদ্ধ রাখেন নি, তাকে তিনি জুয়াখেলার মতো অনিশ্চিত ঢিলছোঁড়ার সাথে তুলনা করেছেন, 'মানুষের বুদ্ধিমান হয়ে ওঠার কারণ সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য, বুদ্ধিগ্রাহ্য কোন ব্যাখ্যা আমি আজো পর্যন্ত পাই নি। এ সম্পর্কে যতো তত্ত্ব আছে সবই যেন 'সাট্টা' খেলা, আপনার নম্বর আপনি তুললেন, কিন্তু খেলার শেষে দেখলেন আপনি দাঁড়িয়ে আছেন খালি হাতে। প্রত্যেকটি খুলির আবিষ্কার প্রত্নতত্ত্ববিদকে নতুনতর ধাঁধার সামনে ফেলে দিচ্ছে।'৪(৮৭) দানিকেন তেমন ধাঁধা সৃষ্টির চেষ্টা করলে পারতেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে সাট্টাখেলায় পরিণত এক কথায় ক'রে দেয়া যায়। কিন্তু সেই তত্ত্বকে বাতিল করবার মতো মালমসলা আবিষ্কার ক'রে ধাঁধা সৃষ্টি করা কঠিন কাজ। পাঠককে সঠিক তত্ত্বটি সম্পর্কে অন্ধকারে রেখে কিছু মন্তব্য ছুঁড়ে দেওয়া ছাড়া দানিকেনের পক্ষে অন্য কোন কিছু করা সম্ভব নয়। এই তাঁকে করতে হয়েছে নিজের মনগড়া প্রকল্পের প্রতি পাঠকের আস্থা আনবার স্বার্থে। ধাঁধার মধ্যে প্রত্নজীববিদেরা না পড়লেও সাধারণ পাঠককে ধাঁধার মধ্যে ফেলা দানিকেনের প্রয়োজন, কারণ, 'তা হ'লে আমি যে বলেছি বহিঃ-র্জাগতিক বুদ্ধিমান জীবেরা মানবাকৃতি প্রাণীর উন্নতি বিধান করেছিল, সুপরি-কল্পিত, কৃত্রিম পরিব্যক্তির সাহায্যে কোন এক আদিম অজানা অতীত দিনে, সে কি একান্তই অসম্ভব কল্পনা ?'৪(৮৮) সে 'কল্পনা' কতটা অসম্ভব আলোচনা না ক'রে আমরা বরং দেখতে পারি, প্রত্নতাত্বিকেরা বিবর্তনের যে ব্যাখ্যা প্রমাণ রেখেছেন তা অসম্ভব কিনা!

চার্লস ডারউইন যে অভিব্যক্তিবাদী তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন তা ছিল তাঁর দীর্ঘ আটাশ বৎসরের গবেষণার ফল। এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রধানতঃ তিনটি পথে গবেষণা চালান—(১) ভূস্তরের বিভিন্ন ধাপে লব্ধ জীবাশ্ম থেকে একটা ধারাবাহিক বিকাশকে সূত্রায়ন করা। (২) প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র গুহা-কন্দরে ব্যবহৃত বাসনপত্রের প্রকৃতি থেকে দ্বিপদপ্রাণীর ক্রমবিকাশকে অনুধাবন করা। (৩) নরকঙ্কাল ও জীবজন্তুর শারীরিক গঠন ও তাদের তুলনামূলক জ্ঞান থেকে মানুষ ও অন্যান্য জন্তুর মধ্যে সম্পর্ককে নির্ণয় করা।

ডারইউনের তত্ত্বের যে দুটি প্রধান ফাঁক ছিল তা এই তিনটি পথে অগ্রসর হয়ে পাওয়া সম্ভব ছিল না। মানবকোষের সূক্ষ্মতম অংশের আবিষ্কার তখনো না হওয়াতে পরিবর্তনের ধারাকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় নি সম্পূর্ণ জীববিজ্ঞান সম্মত ভাবে।

ডারউইন বলেছিলেন যে জীবকোষ বড়ই অস্থির। কখনও এক অবস্থায় থাকে না। অনবরত পরিবর্তিত হয়। সেই জন্যই একই পিতামাতার সন্তানেরা আলাদা হয়ে থাকে। একে তিনি পরিবর্তনীয়তা অর্থাৎ পরিবর্তন হবার মতো বা হতে পারা এবং পরিবর্তমানতা অর্থাৎ যা পরিবর্তন হয়ে থাকে বলে উল্লেখ করেন। মানুষ হবার পিছনে এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোষ অন্তর্ভুক্ত ক্রোমসোম এবং ডি-এন-এ. ও আর এন এর ভূমিকা আর তার সাথে দ্বিপদ প্রাণী হবার পর শ্রমের ভূমিকা পর্যালোচনা করলে অভিব্যক্তিবাদ একটি বিজ্ঞানসম্মত পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব হিসাবে গণ্য করতে কোন আপত্তির জায়গাই থাকে না।

মানব বিবর্তনের ধারাকে মধ্যযুগীয় সময়ের গোড়াতে আবিষ্কৃত স্তন্যপায়ী থেকে ধরলে সাধারণ ভাবে এই রকম বিভাগ করা যেতে পারে।
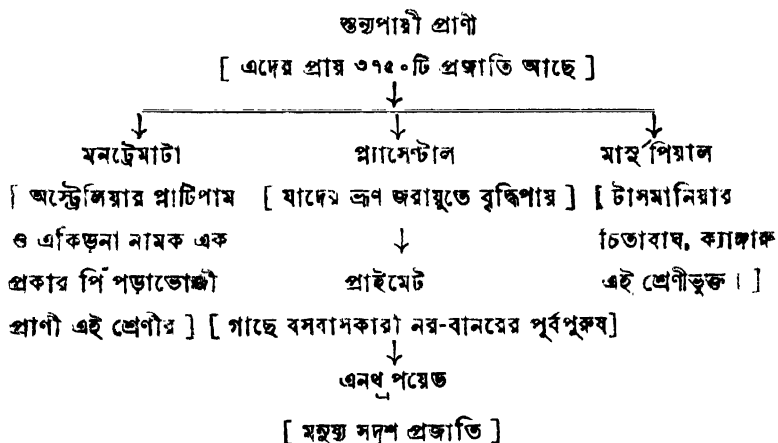
এনথ্রপয়েড হ'ল শরীরের তুলনায় যথেষ্ট বড় মস্তকধারী ধারাল দাঁত সম্বলিত এক শ্রেণীর প্রাণী। এদের পাকস্থলী ছিল সরল। বাচ্চাপ্রসব করা ও বাচ্চাকে দুধ খাওয়ান এদের প্রকৃতি। নিরীহ প্রকৃতির এই প্রাণী গভীর নিরক্ষীয় অঞ্চলে গাছে গাছে বাস করত। নর-বানর-গরিলা-বেবুন-গিবন-ওরাংওটাং-শিম্পাঞ্জীর পূর্বপুরুষ এই এনথ্রপয়েড। এনথ্রপয়েডের পরবর্তী বিভিন্ন ধারা হ'ল এই সমস্ত প্রাণী।

অপুষ্পক উদ্ভিদ থেকে সপুষ্পক উদ্ভিদ এসেছে, অমেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে যেমন মেরুদণ্ডী প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে, চতুষ্পদ জন্তু থেকেই যেমন দ্বিপদ প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে তেমনিই বিবর্তনের ধারায় বিশেষ পরিবেশে, ক্রোমসোম সূত্রের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ও পরবর্তী সময়ে দুপায়ে হাঁটা ও শ্রমসাধনের ভিতর দিয়ে মানুষ অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে আবির্ভূত হয়েছে। এই ধারা আগামী লক্ষ লক্ষ বছর পর মানুষকে কতদূর নিয়ে যাবে কেউ বলতে পারে না। তবে সে মানুষ যে এই মানুষের থেকেও বহু বিবর্তিত উন্নত রূপে আবির্ভূত হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই পরিবর্তন সম্পূর্ণ প্রকৃতি-নির্ভর মানব-ইচ্ছা নিরপেক্ষ হবে না ব'লে মানবপ্রজাতির সে অগ্রগতি তার কোন অংশকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারবে না যেমন হয়েছে অতীতের এনথ্‌পয়েড থেকে নানা শাখার আবির্ভাব। পরিবর্তনীয়তা ও পরিবর্তমানতা আভ্যন্তরীণ জীবনসংকেত ডি-এন-এ. নির্ভর এবং পরিবেশ-নির্ভর। তা নানা পরিবেশে নানা প্রজাতিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তা যদি না করত তাহ'লে পৃথিবীতে অসংখ্য জীব হ'তে পারত না। দানিকেন তবু প্রশ্ন করেছেন, 'আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মাঝখান থেকে কেন একটি মাত্র দল বুদ্ধিমান হয়ে উঠল? গরিলা, শিম্পাঞ্জীরা বেশ ভদ্র জীব এবং পুরোপুরি মনুষ্য পরিবার ভুক্ত, তবু কোন গরিলা, কোন শিম্পাঞ্জী জামা কাপড় পরে বলে জানি না, ছবি আঁকে বলেও শুনি নি।'৩(৮৭) অথচ এ কথা না বোঝার কারণ নেই যে ৩৭৫০টি স্তন্যপায়ী প্রজাতির সবকটি যে কারণে ও বিশেষ অবস্থায় আলাদা আলাদা হয়েছে প্রত্যেকেই এনথ্‌পয়েডে রূপান্তরিত হয় নি, ঠিক সেই কারণেই এনথ্‌পয়েডের সব কটি শাখা মানুষে পরিণত হয়নি।

এনথ্‌পয়েড থেকে আধুনিক কালের দ্বিপদজন্তুর ও মানুষের আবির্ভাবও একভাবে ঘটে নি। অনেক ধারা অবলুপ্ত হয়ে গেছে। ধারাবাহিক চিত্র থেকে এ ধারণা সুপরিষ্কার হতে পারে। ইয়োসিন যুগ থেকে এই বিবর্তনের সূত্রপাত।
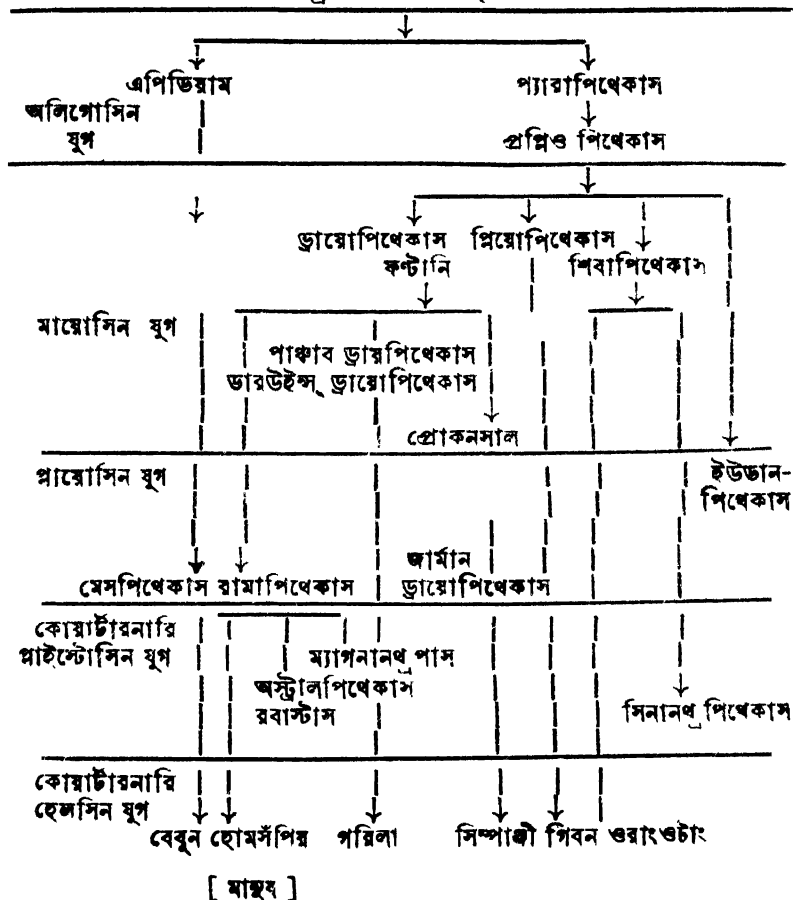
পৃথিবীর যুগবিভাগ ও প্রজাতি

এই ধারাবাহিকতা থেকে খুব পরিষ্কার ভাবেই দেখা যাচ্ছে যে মানুষ আর গরিলা, গিবনেরা কীভাবে বিভিন্ন যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধারা গ্রহণ ক'রে বিবর্তনের পথে এগিয়ে এসেছে। রামাপিথেকাস থেকে মানুষ হবার পথে আরো মধ্যবর্তী স্তর রয়েছে। সে স্তরগুলিও পশুস্তর বলা যেতে পারে। এমন কি রামাপিথেকাসের অন্ত দুটি ধারাও বর্তমান যুগ পর্যন্ত আসতে পারে নি। পারলে, বলা বাহুল্য তারা গরিলা গিবন হ'ত না। আবার মানুষও হ'ত না। রামাপিথেকাস থেকে উৎপত্তি হয়েও সেই ধারার প্রাণীরা দানিকেনের বিস্ময়ের

অবদান ঘটিয়ে জামা কাপড় পরে ছবি আঁকত না। এই পৃথকত্বই পৃথিবীতে এত প্রাণধারা বয়ে এনেছে।

নব্যজীবীয় যুগের দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ কোয়ার্টারনারী যুগে মানব প্রজাতির নানা বিবর্তন ঘটেছে। কোয়ার্টারনারী যুগের সর্বাধুনিক কালে অর্থাৎ হেলোসিনে মানুষের প্রাদুর্ভাব আর প্লিস্টসিন কালে মনুষ্যপূর্ব বংশধরদের আবির্ভাব। প্রাকৃতিক কী অবস্থার মধ্যে দিয়ে কোন অঞ্চলে কীভাবে তাদের উদ্ভব ঘটেছে তার বিবর্তনের ধারাপথেরও অবস্থা আজ জানা গেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা হ'ল বিবর্তনের এই ধারায় প্রত্যেকটি প্রজাতি একদিনে আবিষ্কৃত হয় নি—বিভিন্ন সময়ের আবিষ্কার এই ধারাকেই সুস্পষ্ট করেছে। এই ধারার মাঝখানে কোন ওলটপালট বা অমিল ঘটনানোর মতো ফসিল আজ পর্যন্ত কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি। রামাপিথেকাস থেকে সে ধারা নিম্নরূপ :—
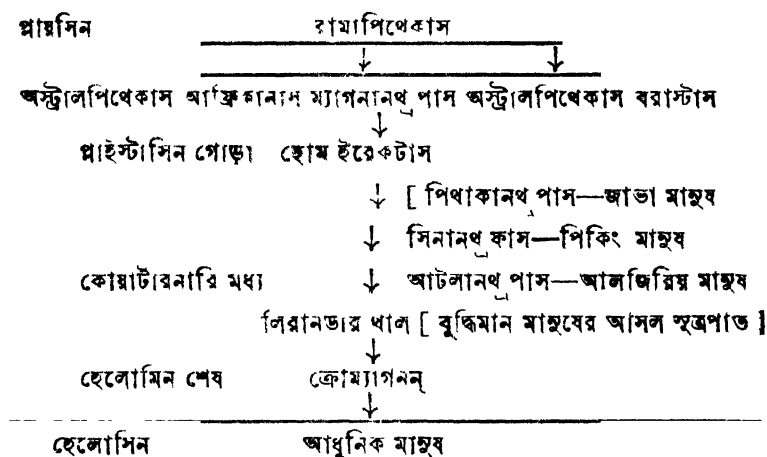
উপরের প্রতিটি স্তরের মনুষ্যপূর্বপ্রজাতির বাহুরকম পরিচয় মিলেছে। ফলে এই ধারাকে আজ আর কোন প্রত্নতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক অস্বীকার করেন না। দানিকেন অবশ্য এই ধারাকেই অস্বীকার করেছেন। এটা তাঁর প্রয়োজন নিজের কাল্পনিক তত্ত্বকে দাঁড় করাবার জন্য। তাই তাঁর প্রশ্ন, 'নরাকার পশু থেকে আদিম মানুষ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ বছর সে কিছুই করলো না, কিছুই শিখল না, তারপরে সেই আদিম মানুষই হঠাৎ এত সব কেমন ক'রে শিখল, সেই প্রশ্নটাই আমার মনে কাঁটার মতো বিঁধছে। আজ পর্যন্ত কি কিছুই করা হয় নি ঐসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে?'২(২৫) প্রশ্নটা শুনলে মনে হয় এসব প্রশ্নের জবাব বুঝি

দানিকেনই প্রথম খুঁজতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু এসব প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা ইতিহাসের প্রথম পর্ব থেকে শুরু হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেই চিন্তা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবে এসেছে। আর বিংশ শতাব্দীর নানা আবিষ্কার তাকে দৃঢ়ভাবে দাঁড় করিয়েছে। মানুষের গবেষণা ও আবিষ্কারকে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায়, সাধারণ পাঠকের চোখে এতে বাঁধা লাগতে পারে কিন্তু তা সৃষ্টি হতে লাগে নিরলস শ্রম আর দীর্ঘকালের সাধনা। তাকে অত সহজে মুছে দেয়া যায় না।

গ্রীক দার্শনিক লুক্রেটিয়াস, ইপিকিউরাস ও এনাক্সাগোরাস বলতে চেষ্টা করেছিলেন, পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে প্রাকৃতিক কারণে। এ্যারিস্টটল সে কথা প্রমাণেরও চেষ্টা করেন। রোমের ক্লডিয়াস গ্যালেন খৃষ্টপূর্ব দুইশত বছর আগে মানুষ আর বানরের সাদৃশ্যের কথা বলেছিলেন। লুসিও ভ্যানিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে মানুষ প্রাকৃতিক কার্য কারণের ফলেই সৃষ্ট বলাতে শূলে প্রাণ হারান। সুইডিস বিজ্ঞানী কার্ল লিনাকাস প্রাণীর শ্রেণীবিভাগে মানুষকে উচ্চতর প্রাণী ব'লে দেখিয়েছিলেন। জেমস মোন্‌বোড্ডো এবং জৈ ডুরনিক অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানুষকে এনথ্রপয়েড এর বিকশিত রূপ বলে বর্ণনা করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বিবর্তনবাদের পক্ষে প্রচুর প্রমাণ সংগৃহীত হয়—একদিকে জীবাশ্মবিদ্যা ও ভূবিদ্যার অগ্রগতি আর অন্যদিকে ভ্রূণতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের নানা শাখার অগ্রগতি এই কাজে সাহায্যে করে। এই সময়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন জীন লামার্ক। ডারউইন সেই চিন্তাকে দৃঢ়সংঘবদ্ধ রূপদান করেন। হেকেল, হাক্সলি ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিকেরা ডারউইনের তত্ত্বকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেন।

এতদ্‌সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য কিছুই করা হয়নি ব'লে দানিকেন মনে করেছেন। তিনি বলেছেন, 'মানুষ উৎপত্তি সংক্রান্ত গবেষণা নিঃসন্দেহে খুবই চমকপ্রদ। খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমার কাছে আরো একটা প্রশ্ন ঠিক এমনি গুরুত্বপূর্ণ, এমনি চমকপ্রদ। সেটা হল কবে কেমন ক'রে কেনই বা মানুষ বুদ্ধিমান হয়ে উঠল।'২(২৫)

'কবে কেমন ক'রে কেনই বা মানুষ বুদ্ধিমান হয়ে উঠল' এ ব্যাপারে অনেক কিছু করেই দেখা গেছে যে মানব বিবর্তনের পরম্পরাগত ধারা ক্রমশঃ মানুষের পূর্ব পুরুষকে উন্নতির দিকে নিয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশের আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক নর-কঙ্কাল ও তাদের ব্যবহৃত দ্রব্য তার প্রমাণ। হঠাৎ উন্নতির কোন অলৌকিক ব্যাপারের সেখানে আদৌ স্থান নেই। মর্গান সর্বাধুনিক কোয়া-

টানারি যুগের মানব সমাজের যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তাতে বর্বরযুগের প্রথমভাগের মানুষের সঙ্গে হোমসাঁপিয়েনের পূর্ববর্তী পুরুষদের পার্থক্য খুবই কম ছিল। ধারাবাহিকতায় কোথাও অলৌকিক উল্লম্ফনের চিহ্ন নেই। শ্রমের ভূমিকার ফলে ঘটেছে অবশিষ্ট পশু চরিত্র থেকে দ্রুত অগ্রগতি ও পৃথকিভবন। ড্রায়পিথেকাস থেকে শুরু করে এই বিবর্তনের কিছু পরিচয় লক্ষ্য করা যেতে পারে।

ড্রায়পিথেকাস ঃ ড্রায়পিথেক্কাসের ধারাতেই মানুষ বাকি এনথ্রপয়েড থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে। ১৮৫৬ সনে ফ্রান্সে এদের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়। আফ্রিকাতেও এদের বাস ছিল। এশিয়ার হিমালয়েও এদের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে।

রামাপিথেকাস ঃ ১৯৩৪ সনে রামাপিথেকাসের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়। চোয়ালের গঠন আর দাঁত নিয়ে গবেষণা ক'রে মানব অভিব্যক্তিক ধারাতে এদের স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। শিবালিক পর্বতেও এদের বাসস্থানের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

অস্ট্রালপিথেকাস ঃ এদের সম্পর্কে জানা যায় যে এরা দলবদ্ধ হয়ে বাস করত। লম্বায় ছোট ছিল। শিকার করার মানবীয় গুণ এরা অর্জন করেছিল। ১৯২৪ সনে দক্ষিণ আফ্রিকাতে ১০টি কঙ্কাল পাওয়া যায়। এরা ইয়োরোপ ও এশিয়াতেও বাস করত। উদ্ভিদ, ফল, শস্য ও ছোট জন্তু এদের খাদ্য ছিল। কুঁজো হয়ে হাঁটতে পারত। অপেক্ষাকৃত আগের থেকে সোজা হয়ে। মস্তিষ্কের পরিমাণ ৬০০ ঘ-সে-মি.।

হোমইরেকটাস ঃ হোম ইরেকটাসের স্তরে নানা দেশে নানা জীবাশ্ম পাওয়া যায়। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হ'ল সিনানথ্রপাস বা পিকিং ম্যান, পিথাকানথ্রপাস বা জাভাম্যান এবং এ্যাটলানথ্রপাস বা আলজিরীয় ম্যান। এরাই প্রথম সোজা হয়ে হাঁটতে পারত। এদের করোটির পরিমাণ ৯০০—১২০০ সি-সি.।

ডারউইনের সূত্র ধরে বিভিন্ন পূর্ব পুরুষের সন্ধান মিলবেই এই আশায় দিকে দিকে গবেষণা চলে। আর্নস্ট হেকেল সেই পথেই পর পর বিভিন্ন ধাপে মানুষের পূর্বপুরুষের বর্ণনা দেন। ইউজেন ডুবয়া সেই পথ ধরে আরো এগিয়ে যান। ডারউইন ও হেকেলের মতে যে ধরনের আবহাওয়া ও স্থানে প্রথম লম্বা হয়ে দাঁড়ান মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল ব'লে বলা হয় সেই সব অঞ্চলে অনুসন্ধান চালাতে গিয়েই ১৮৯১ সনে যবদ্বীপের কাছে ত্রিনিল গ্রামে একটি

জীবাশ্ম পাওয়া যায়। এটিই পিথাকানথ্রপাসের প্রথম স্বাক্ষর। ১৯৩৭ সনে দ্বিতীয় এবং তারপর আরো দু'টি পিথাকানথ্রপাসের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়। জাভার কাছে প্রথম এদের সন্ধান মেলে বলে তাদের জাভা মানব বলা হয়। এরা পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

আটলানথ্রপাসের জীবনযাত্রার ধরনও প্রায় একই রকম ছিল।

হোমইরেকটাসের অন্তর্ভুক্ত হ'লেও সিনানথ্রপাস বা পিকিং মানবকে জাভামানবের পরবর্তী অবস্থা বলে মনে করবার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ১৯২৭ এ পিকিং থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে এক গুহাতে খনন কার্য চালিয়ে মাথার খুলি পাওয়া যায়। এবং অন্ততঃ ৫০টি পিকিং মানবের অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে। এরা পাথরের এবং কিছু হাড়ের অস্ত্রও ব্যবহার করত। এদের মধ্যে আগুন সংরক্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায়। কথার সংকেত এরা ব্যবহার করত বলে অনুমান করা হয়। যদিও আকার ইঙ্গিতই প্রধান ছিল। এরা দৈর্ঘ্যে খর্বাকৃতি ও স্বল্পায়ু ছিল। এদের মস্তিষ্কের পরিমাণ ছিল প্রায় ১০৫০ ঘ.সে.মি.।

নিয়ানডারথাল: নিয়ানডারথাল মানুষের খুব কাছাকাছি পূর্বপুরুষ। ১৯৪৮ সনে স্পেনের জিব্রালটারে নিয়ানডারথালের মাথার খুলি পাওয়া যায়। জার্মানীতে প্যালেস্টাইনেও নিয়ানডারথালের কঙ্কালের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯২২ সনে জাভাতে খনন কার্যের ফলে হরিণ, রাইনোসরাস, কুমীর, প্রভৃতির কঙ্কাল পাওয়া যায়। সেখানেও নিয়ানডারথাল-এর কঙ্কাল পাওয়া যায়। এরা যৌথ জীবন যাপন করত। আগুনে মাংস সেঁক করত। কথা বলাও শুরু হয় এদের মধ্যে। কবরদানের প্রথাও চালু হয়। স্ত্রীপুরুষের কাজের বিভাগ দেখা দিয়েছে। চামড়ার পোশাক পরা আরম্ভ হয়েছে। এদের করোটি আধুনিক মানুষের কাছাকাছি, প্রায় ১৬৫০ ঘ-সে-মি.।

ক্রোম্যাগনন: ১৮৬৮ সনে ফ্রান্সে ৫টি ক্রোম্যাগননের কঙ্কাল পাওয়া যায়। এ থেকে তাদের জীবনযাত্রারও পরিচয় মেলে। ১৯৩৬ সনে এবং ১৯৫২ সনে রাশিয়াতে ক্রোম্যাগননের জীবনযাত্রার চিহ্ন সম্বলিত ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। এখানে কালো-সাদা মানুষের সাধারণ উৎসও খুঁজে পাওয়া যায়। এদের ভিতর নিগ্রয়েড ও ইউরোপয়েডের বৈশিষ্ট্যের ছাপ মেলে। এদের মাথার খুলির ধরন বর্তমান বিশ্বের অনেক জাতির মধ্যে এখনও আছে।

ক্রোম্যাগনন—সময় থেকেই সামাজিক জীবনের সূত্রপাত ঘটায়। মানব মস্তিষ্কে নানা দ্বন্দ্ব এই সময়ে দ্রুত কাজ করতে শুরু করে। আধুনিক মানুষের বিকশিত পর্যায়ে মানবমস্তিষ্কও বিশাল আয়তন পেয়েছে ১৭০০ ঘ.সে.মি.।

এরপর মানুষের যে বৈশিষ্ট্য জাতি সমূহে সঞ্চালিত হয়েছে তা তিনটি ধারায় বাহিত হয়েছে—নিগ্রয়েড, মঙ্গলয়েড, ইউরোপয়েড। এদের উদ্ভব হয়েছে অন্ত্য-প্রত্ন প্রস্তর যুগে।

এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি অর্থাৎ ড্রায়পিথেকাস (ডারউইন) থেকে হোমসাঁপিয়েন হয়ে আধুনিক মানুষ সৃষ্টি কি হঠাৎ হয়েছে? বানর, শিম্পাঞ্জী কেন জামা পরে না, ছবি আঁকে না, আর মানুষ কেন তা করতে পরস্পর থেকে বিভক্ত হয়েছে, এ প্রশ্নের সামনে যদি কতদিন ধরে মানুষ এই পৃথকত্বের সাধনা করেছে তা হলে ধরা যায় তবে তাকে দানিকেন অনুমিত অলৌকিক কোন হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনার ফলে যে এমন ঘটে নি তা বোঝা যেতে পারে।

লজ্জা নিবারণের ধারণা নিয়ানডারথাল মানুষ কোথা থেকে পেয়েছে প্রশ্নটা করতে খুব কম সময় লাগে, কিন্তু সেই বোধ জন্মাতে যে কতবছর অতিক্রম করতে হয়েছে তা মাথায় থাকে না। প্রেম, ভালবাসা, দয়ামায়া, সৌহার্দ, হৃদয়বৃত্তি, কর্তব্য প্রভৃতি বোধ মানুষের কোন সময়েই একদিনে জন্মায় নি। আর বোধগুলি কারো কাছ থেকে প্রাপ্ত গুণও নয়। দানিকেন প্রশ্ন করেছেন, 'কিন্তু আদিম মানুষ তার সম্প্রদায়ের ভেতর কবে চালু করেছিল নৈতিক মান, সেই কথাটাই আমার প্রধান জিজ্ঞাসা। কর্তব্য, প্রেম, প্রীতি, সৌহার্দ ইত্যাদি হৃদয়বৃত্তি কিসের প্রভাবে আদিম মানুষ শিখেছিল? কে সঞ্চার করল তার মনে ভক্তিভাব? যৌন মিলনে লজ্জা সে কেন পেল? কে ঢোকাল তার মনে লজ্জা?' ২(২৪) এখানে উল্লিখিত কোন বৃত্তিগুলিই মানুষের স্বাভাবিক জৈবিক গুণ নয়। এর অনেকগুলিই সামাজিক। সমাজবদ্ধ ভাবে না বাস করলে এ গুণগুলি কখনই মানুষের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হ'ত না। কার্যতঃ অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া আদিবাসী মানুষের মধ্যে এই গুণগুলি সভ্য-মানুষের মতো থাকা সম্ভব নয়। কাজেই কারো শেখানোর উপর এগুলি অর্জন করা নির্ভর করছে না। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন আর যূথবদ্ধ জীবনযাত্রার দীর্ঘ পদ যাত্রার পথেই মানুষ ঐসব গুণ অর্জন করেছে।

বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভব ও অস্তিত্বের কাল পাশাপাশি লক্ষ্য করলে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

ড্রায়পিথেকাস—	মায়োসিন যুগে—	দেখা দেয় অন্ততঃ ২ কোটি ৪০ বছর আগে। বিবর্তনের ধারা বহন করেছে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ বৎসর ধরে।

রামাপিথেকাস—	মায়োসিনের শেষ প্রাইয়োসিন যুগে—	দেখা দেয় অন্ততঃ ১ কোটি ৩০ লক্ষ বছর পূর্বে। বিবর্তন ঘটেছে ৯০ লক্ষ বছর জুড়ে।
অস্ট্রালপিথেকাস—	প্রাইয়োসিনের শেষ এবং কোয়াটারনারির— প্লাইস্টোসিন যুগে।	আবির্ভাব ঘটে প্রায় ৪০ লক্ষ বৎসর আগে। টিকে ছিল অন্ততঃ ২৫-৩০ লক্ষ বছর।
হোম ইরেকটাস—	"	
জাভামানব—		দেখা দেয় ১০-১২ লক্ষ বছর আগে টিকেছিল প্রায় ৭ লক্ষ বছর ধরে।
পিকিং মানব—	"	তিন লক্ষ বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়। বিবর্তনের পথে এগিয়ে চলে কম পক্ষে দুই লক্ষ বছর।
নিয়ানডারথাল—	"	
হোমসঁপিয়েন		এক লক্ষ বছর আগে দেখা দেয়। অন্ততঃ ৫০ হাজার বছর টিকে ছিল।
ক্রোম্যাগনন—	"	৫০ হাজার বছর আগে আবির্ভূত হয়ে ১০-১৫ হাজার বছর টিকে থাকে।
আধুনিক মানুষ—	কোয়ার্টারনারির হেলসিন	৩০-৩৫ হাজার বছর আগে আবির্ভূত হয়ে আজো অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম ক'রে এগিয়ে চলেছে।

এই অবস্থাগুলি পার হবার সময়ে মানব প্রজাতি পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। [মঙ্গলয়েডদের ছড়িয়ে পড়ার চিত্র—১৫ :পৃঃ]

এই বিশাল সময় জুড়ে অজস্র পর্যায় পার হয়ে আধুনিক মানুষে পদার্পণ করতে গিয়েই মানুষের নানা স্বভাব ও বৃত্তি তৈরি হয়েছে। কারো গুঁজে দেওয়া বৈশিষ্ট্য হিসাবে মনুষ্য গুণগুলির প্রাদুর্ভাব ঘটে নি। প্রাচীন সভ্যতার কাল ৮/১০ হাজার বছর আগে। তার পূর্বে একটু একটু ক'রে বিবর্তনের ধারা বেয়ে মানুষের আসতে লেগেছে কী বিশাল সময় সেটা নজরে রাখলে বিভ্রান্তির কোন স্থান থাকে না। এতৎসত্ত্বেও দানিকেনের ধারণা, 'আমার ধারণা ভিন্ন গ্রহের বুদ্ধিমান জীবেরা এ গ্রহে পদার্পণ করেছিল কিনা সেই বিষয়টি অনুসন্ধান না

করলে বাঁদর ও মানুষের মাঝখানকার সেই লুপ্ত অধ্যায়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না।'২(২৫)

এনথ্রপয়েড থেকে মানুষ হবার পিছনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যেতে পারে যা থেকে উভয়ের মিল ও অমিলগুলি বুঝতে সুবিধা হবে।

এনথ্রপয়েডএপ্— মানুষছাড়া এনথ্রপয়েডের বিবর্তিত প্রাণী	মানুষ
১। রক্তে মানুষের মতো চার রকমের গ্রুপ আছে A, B, AB এবং O.	মানুষের চার রকমের রক্ত আছে A, B, AB এবং O.
২। ৩২ জোড়া দাঁত।	৩২ জোড়া দাঁত।
৩। গর্ভধারণের সময়— শিম্পাঞ্জীর—২৩৫ দিন। ওরাংওটাং—২৭৫ „ গেরিলা—২৮০ „	মানুষের গড়ে ২৬৫ থেকে ২৮০ দিন।
৪। ক্রোমসোম সূত্র-বড় প্রাণীর ক্ষেত্রে—৪৮	ক্রোমসোম সূত্র—৪৬
৫। নীচুস্তরের প্রাণী যখন দুই চোখে দুটি বস্তু দেখে এনথ্রপয়েড তখন দুই চোখে এক বস্তু দেখে।	মানুষ দুই চোখে একই বস্তু দেখে।
৬। দু' পায়ে হাঁটতে পারলেও প্রধানতঃ চারপায়ে হাঁটে। সম্পূর্ণ সোজা হ'তে পারে না।	চারপায়ে ছোটবেলা চললেও দু'পায়ে চলাই একক বৈশিষ্ট্য যা শ্রমের শক্তি এনে দেয়।
৭। কথা বলার শক্তি প্রায় নেই।	জিহ্বা কথা বলার শক্তি সম্পন্ন। এই কথা আবার মাথাকে প্রভাবিত করে। মগজ বৃদ্ধি পায়।
৮। মাথার ওজন মানুষের মাথার ওজনের থেকে কম।	মাথার আয়তন ও ওজন সমস্ত এনথ্রপয়েডের চেয়ে বেশী। গরিলার মাথার ওজনের ১০ গুণ, শিম্পাঞ্জীর মাথার ওজনের ৪ গুণ, ওরাংওটাংএর মাথার ৬ গুণ এবং গিবনের ২ গুণ।
৯। মুখ বড়। করোটি ছোট।	মুখ ছোট। করোটি বড়।

১০। মাথা সম্পূর্ণ খাড়া রাখতে পারে না। মাটির দিকে হেলে যায়। | মাথা সম্পূর্ণ সোজা রাখতে পারে। ফলে সম্মুখে বিশাল জগৎকে দেখতে পাওয়া সম্ভব।

মানুষ যে জীববিকাশের ধারা থেকেই উদ্ভূত তার সপক্ষে কিছু কিছু তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

মানব বিকাশের ধারায় আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে মানব কোষের অন্তর্ভুক্ত বিন্দুর চেয়ে ক্ষুদ্র ডি. এন. এ; আর এন, এ সিন্ধুর শক্তির মতো ক্ষমতা নিয়ে। আর বাইরে পরিবর্তনের প্রভাব বিস্তার ক'রে চলেছে পরিবেশ। মানুষের ক্ষেত্রে কোষের ক্রোমসোম সংখ্যা ৪৬। অথচ এনথ্রপয়েডদের ক্ষেত্রে তা হ'ল ৪৮টি। বিবর্তনের ধারা পথে দুজোড়া একই ধরনের ক্রোমসোম সূত্রের পরস্পর মিলে যাবার ভিতর দিয়েই তা সম্ভব হয়েছে। অন্য এনথ্রপয়েড-দের ক্ষেত্রেও এমন ঘটেছে। কাটাহিন নামক লোমার মাংকির ক্ষেত্রে ৫৪টি ক্রোমসোম হয়েছে ৭৮টি থেকে ক্রমশঃ কমে।

এককোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী প্রাণী সৃষ্টি হবার সময়ে যেমন ঘটেছিল ঠিক অনেকটা তেমনি ঘটনা ঘটে যখন পুরুষের শুক্রাণু নারীর ডিম্বকোষে যুক্ত হয়। প্রথম কয়েকমাস মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর ডিম্বকোষ প্রায় একই রকমভাবে মাছের ডিম্বকোষের বিবর্তনের সঙ্গে মিলে যায়। এই অবস্থায় ভ্রূণের সম্মুখ, মধ্য ও পশ্চাদভাগ দেখতে পাওয়া যায়, মাথার কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

তার কয়েকমাস পরের ভ্রূণে সরীসৃপের সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। স্তন্যপায়ীর নিম্নতম জন্তুর মতো এ্যাপেণ্ডিক্স থাকে মানুষের। সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতো তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা মানুষের রয়েছে। ইত্যাদি অনেক কিছুর সাহায্যে এ কথা প্রমাণ করা যায় যে মানুষ এই পার্থিব প্রাণিকুলেরই একজন।

মানুষ এরই মধ্যে হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র। একক।

একদম প্রথমাবস্থায় গাছে যখন এনথ্রপয়েডরা বাস করত তখন থেকেই দু'পায়ে দাঁড়ানোর একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কোন নৈসর্গিক কারণে ও শারীরিক পরিবর্তনের জোয়ারে গেছো প্রাণীর একাংশ মাটিতে নামতে শুরু করে। ফলে তাদের সামনের পা ক্রমশঃ হাতে পরিণত হয়। পরিণামে শরীরের নানা অঙ্গের সামঞ্জস্য ঘটে। স্বরযন্ত্র, মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড, চক্ষু প্রভৃতির বিকাশে এই দণ্ডায়মান অবস্থা বিরাট ভূমিকা পালন করে। মাটিতে থাকা শুরু করে যে

দল, বিবর্তনের ধারায় তারাই এগিয়ে আসে। হাতের গঠন পাল্টায়। পায়ের গোড়ালি শক্ত হতে থাকে। ঘাড় সোজা হয়। চক্ষু এর ফলে সুদূরপ্রসারী হয়। গাছ থেকে নেমে আসায় জীবন-ধারণের জন্য অনেক নতুন প্রতিকূলতা সহ্য করতে হয়। এতেও নিজেদের পাল্টাতে হয় নানাভাবে।

নেমে এসে এই অংশের ভাগ্যে তিন রকম পরিবর্তন ঘটে—এক: যারা নিজেদের দ্রুত পরিবর্তিত করতে পারল তারাই উন্নতির দিকে এগিয়ে এল এবং শেষ পর্যন্ত হ'ল মানুষ। দুই: যারা নিজেদের পরিবর্তিত করতে পারল না, প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে পারল না তারা নিঃশেষ হয়ে গেল। তিন: যারা প্রতিকূলতাকে আংশিক কাটিয়ে কিছুটা দাঁড়ান, ঋজুভাবে চলাফেরা ও কথনও মাটি প্রধানতঃ গাছকে আশ্রয় করল তারা বিবর্তনে পিছিয়ে পড়ল—গরিলা, শিপাঞ্জী প্রভৃতি তাদেরই উত্তর পুরুষ।

মানুষের শরীরের ভারকেন্দ্র নীচে। অন্যদের তুলনামূলক ভাবে উপরে। ফলে মানুষের পক্ষে হাঁটা সহজ। উপরন্তু অন্যদের থেকে মানুষের হাত, পেট, চোয়াল প্রভৃতি ছোট, ফলে চলাফেরাতে ভারসাম্য রক্ষা ক'রে চলতে সুবিধা হয়। হাতের আঙুলের গঠন মুষ্টিবদ্ধ হতে সাহায্য করে।

মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ফলে চোখ সম্মুখে বহুদূর প্রসারিত হয়। চার পায়ে জন্তুর যেখানে চোখ থাকে নীচের দিকে। এর ফলে মানুষের কাছে এক বৃহৎ জগৎ উন্মোচিত হয়। মাথার কাজ বৃদ্ধি পায়। মানুষের এই কাজকে সাহায্য করতে হাঁটু পাকে সোজা রাখতে পারে অনেক্ষণ। শিম্পাঞ্জী বা গরিলা সোজা হয়ে থাকতে পারে অল্পক্ষণ।

বিবর্তনের ধাপে ধাপে মানুষ বিরাট অগ্রগতির দিকে এগিয়ে এসেছে প্রধানতঃ তিনটি কারণে—প্রথমতঃ আহারে বৈচিত্র্য আসাতে। ফলমূল খাওয়া থেকে কাঁচামাংস ভক্ষণ তারপর ঝলসান মাংস খাওয়া ও শস্যদানা আহার শুরু হওয়া। দ্বিতীয়তঃ একসঙ্গে বসবাস করা পরস্পরের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে চলতে শুরু করা। তৃতীয়তঃ হাত মুক্ত হাওয়াতে সচেতন ভাবে পরিকল্পনামাফিক হাতিয়ার ব্যবহার করা যা ক্রমশঃ মাথাকে সমৃদ্ধ করতে থাকে।

হাজার হাজার বছর ধরে এইভাবে মুক্ত হাতের ব্যবহার এতদিনকার প্রাণীবিবর্তনে নিয়ে এল এক বিরাট পরিবর্তন। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস মানববিবর্তনের ধারা পথে হাতের ব্যবহার ও শ্রমের ভূমিকার কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মানুষ হবার পূর্ব মুহূর্তে এই শ্রমের ভূমিকার কথা ইতিপূর্বে লক্ষ্য

করতে না পারায় আপাতদৃষ্টিতে বিকাশের পিছনে মনঃপূত হবার মতো যথেষ্ট কারণ পাওয়া যাচ্ছিল না। আর আভ্যন্তরীণভাবে কোষের ভিতরকার স্বাভাবিক প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের ধারাও জানা ছিল না।

শ্রমের উৎস হিসাবে প্রথম কাজ শুরু করল মুক্ত হাত দুইটি। তারপর এল হাতিয়ার—অস্ত্র। এই প্রথম কোন প্রাণী প্রকৃতি দত্ত শরীরের অঙ্গ ছাড়া অন্য কোন কিছুকে সচেতন ভাবে পরিকল্পনা মাফিক আত্মরক্ষা ও আক্রমণের জন্য ব্যবহার করতে পারল। সমগ্র শরীরে এই ঘটনা বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল যা মানুষের ক্ষেত্রে ছিল সম্পূর্ণ একক। মস্তিষ্কের পরিবর্তনও অভিনব পথে ঘটে চলল। বাকযন্ত্র হ'ল বিকশিত। মস্তিষ্ক নতুনতর জটিলতার পথে যাত্রা শুরু করল। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শরীরের সমস্ত অঙ্গের তুলনামূলক পরীক্ষা ক'রে এই সব বিষয়ে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েছেন।

একদিকে শ্রমসাধন মস্তিষ্ককে সমৃদ্ধ করতে লাগল। অন্যদিকে সমৃদ্ধ মস্তিষ্ক শ্রমকে আরো কার্যকরী হ'তে সাহায্য করতে লাগল। কথা বলা মাথাকে জটিলতর করে চলল, জটিলতর মস্তিষ্ক বাকশক্তিকে আরো কার্যকরী হ'তে সাহায্য করতে লাগল। শ্রম, বাক্য, মস্তিষ্ক মানুষকে নিয়ে এল ভিন্ন জগতে। যেখানে রচিত হয়ে গেল পশুজীবন আর মানব জীবনের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। সামাজিক জীবনের সূত্রপাত সেই জীবনকে আরো একধাপ ঠেলে তুলে দিল। মানব-জীব-বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে মানবীয় মূল্যবোধগুলি ক্রমশঃ বিকশিত হ'তে লাগল। লজ্জা, ভয়, ভালবাসা, দুঃখ, দয়া, কৃতজ্ঞতা, স্বার্থপরতা উদারতা প্রভৃতি সমস্ত মানবীয় গুণগুলি সামাজিক জীবনযাত্রার ফল। কোন মানুষের কেবল জীনের পরিবর্তন তা ঘটাতে পারে না। এককভাবে মানুষের এই গুণগুলি অর্জন করা অসম্ভব। এগুলি সবই সামাজিক গুণ। দৈহিক কোন গুণ নয়।

দানিকেন এত জেনেও কেন বিবর্তনবাদকে পাশ কাটিয়ে যেতে চেয়েছেন? কেন তিনি এই ভ্রান্ত ধারণা গড়তে চেয়েছেন যে, মানুষের বুদ্ধিমান হয়ে ওঠার পেছনে মানবীয় মূল্যবোধ অর্জনের কারণ অনুসন্ধানের জন্য আজ পর্যন্ত কোন চেষ্টাই হয়নি? এর কারণ তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমার ধারণা ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান জীবেরা এগ্রহে পদার্পণ করেছিলেন কিনা সেই বিষয়টা অনুসন্ধান না করলে বাঁদর ও মানুষের মাঝখানকার সেই লুপ্ত অধ্যায়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না।' সেই 'লুপ্ত' অধ্যায়টি দানিকেন নিজে সরবরাহ করেছেন বলেই অভিব্যক্তিবাদী তত্ত্বকে তিনি এ কথায় নাকচ করে দিতে চেয়েছেন। তার তত্ত্বমতে 'আমার অনুমান, এ ঘটনা সম্ভব হয়েছে অজানা বুদ্ধিমানজীবের দ্বারা আদিম

মানুষের জেনেটিক কোডের কৃত্রিমভাবে পরিবর্তন ঘটিয়ে। এমনি করেই নতুন মানুষ হঠাৎ পেয়েছে কর্মশক্তি, পেয়েছে বোধ, বুদ্ধি, স্মৃতি আর সেই সঙ্গে জেগেছে কারুশিল্পে আর প্রযুক্তি বিদ্যায় তার আগ্রহ।'২(৩৩) পাঠককে হতবুদ্ধিকর অবস্থায় নিয়ে যাবার জন্য এর চেয়ে সাজানো বক্তব্য উপস্থিত করা সত্যই কঠিন। প্রথম কথা 'জেনেটিকোড তার উপর আবার 'কৃত্রিমভাবে পরিবর্তন' ঘটান। শুনে কার না মাথাটা ঘুরে যায়! কিন্তু জীন আর তার কোডের পরিচয় যার আছে তার কাছে এমন বৈজ্ঞানিক রূপকথা স্থান পাওয়া সম্ভব নয়।

দানিকেন বলেছেন, উন্নত জীবেরা মানুষের মস্তিষ্কে কোন অপারেশন করে বা জীনকে সরাসরি অপারেশন ক'রে বুদ্ধি বপন করেছে। কিন্তু কীভাবে একাজ ঘটল? উত্তর সেই একই, সেই সুউন্নত জীবেদের জ্ঞান তো আমাদের জানবার কথা নয়। জীনকে কীভাবে অপারেশন করে বদলান যায় তা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। তাহ'লে লেখক দানিকেন জানলেন কী ক'রে? এখানেই তিনি দিগ্বিজয়ী। না জেনেও বলে ফেলতে পারেন। অথচ বিজ্ঞান তা পারে না।

জীন সম্পর্কে জীববিজ্ঞানীরা যেটুকু জানেন তাতে কৃত্রিম পরিবর্তনের কোন ধারণা দিতে তাঁরা পারেন না। ব্যাপারটা এমন নয় যে অপারেশন করা যায়, কিন্তু কিছু কৌশল আয়ত্তে না আসায় পারা যাচ্ছে না। আসলে অপারেশনের ধারণাটা, কৃত্রিম পরিব্যক্তির রহস্যময় ধারণাটারই কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

জীনতত্ত্বের অতি সরলীকরণ

জীন কী? জীনকে এখনও প্রত্যক্ষভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় নি। তবে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কোন সন্দেহ নেই। প্রধানতঃ মানব শরীরে জীনকে আচরণের মধ্যে দিয়েই সনাক্ত করা সম্ভব। আকারগত অবস্থা থেকে কার্যকরী ভূমিকার মধ্যে দিয়েই জীনের সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা হয়। কখনও বলা হয়, জীন হ'ল শরীর বৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপের একক; কখনও বলা হয় আত্মোৎপাদনের ন্যূনতম একক; কখনও বলা হয় ক্রোমসোম সূত্রের পরিবর্তন-ক্ষম ক্ষুদ্রতম অংশ। শেষোক্ত সংজ্ঞানুসারে জীন হ'ল ক্রোমসোমের অংশ। কেউ কেউ অবশ্য জীনকে ক্রোমসোমের অংশ না ব'লে তাকে তার ভিতরকার আনুবীক্ষণিক এবং তারো ছোট অংশের বিন্যাসকে ব'লে থাকেন।

সে যাই হোক ক্রোমসোমের ভিতরেই জীনকে সনাক্ত করা যায়। এবং অতিক্ষুদ্র পদার্থের সঙ্কেত বলে মনে করা যায়। এই ক্ষুদ্রতম পদার্থটি তা'হলে,

কী? এই পদার্থটি বহু পরীক্ষার পর ডি. এন. এ. বলে জানা গেছে। ডি. এন. এ অর্থাৎ ডি-অক্সি রাইবো-নিউক্লিক এ্যাসিডই হ'ল জীনের আচরণের কারণ। ডি. এন. এ.-র এই অবস্থান স্বভাবতই মানবদেহ কোষে। জীনের কৃত্রিম পরিবর্তন সংক্রান্ত দানিকেনের মতামতের জবাব পেতে হ'লে কোষের কোথায় কি ভাবে ডি. এন. এ.-র অবস্থান তার একটু ধারণা করা যেতে পারে।

কোষ হ'ল জৈবিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন হবার ক্ষমতা সম্পন্ন ক্ষুদ্রতম একক, যার বহিরাবরণ অর্ধভেদ্য পদার্থদ্বারা সীমাবদ্ধ। মানবদেহ এমনি অসংখ্য কোষ দ্বারা সৃষ্ট। কোষের আকার ও আয়তন নানা প্রকার হয়ে থাকে। লিভারের কোষ, রক্তের লোহিত কণিকার কোষ, মানুষের ডিমের বা পেশীর কোষ ভিন্ন ভিন্ন রকম। কোষগুলি এতই ছোট যে দুই একটি শ্রেণীর কোষ বাদ দিলে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া কোষকে দেখাই যায় না।

কোষের ভিতর যে সব অংশ থাকে কোষ থেকে কোষে তাদের ভিতর পার্থক্য ঘটে থাকে। তবুও সাধারণতঃ কতকগুলি অংশ প্রায় সমস্ত কোষেই থাকে। কোষের ভিতরকার নানা অংশের মধ্যে নিউক্লিয়াস ব'লে একটি অংশ আছে যাকে বলা যায় কোষের পরিচালন কেন্দ্র। নিউক্লিয়স কোষের অপরিহার্য অংশ। মানবদেহের লোহিত কণিকার সৃষ্টির সময় নিউক্লিয়াস থাকে না। তা ছাড়া কোন কোষই নিউক্লিয়স ছাড়া বাঁচতে পারে না। নিউক্লিয়স হ'ল কোষের কেন্দ্র বিন্দু। এ ছাড়া বাকি অংশকে বলা হয় সাইটোপ্লাজম। সাইটোপ্লাজমের ভিতর আবার নানা অংশ রয়েছে।

কোন কোষে কটা নিউক্লিয়স থাকবে তা কোষের গঠনের ও কার্যকলাপের উপর নির্ভর করে। তবে সাধারণতঃ একটি কোষে একটি নিউক্লিয়স থাকে। নিউক্লিয়স সাধারণতঃ সাইটোপ্লাজমের আয়তনের থেকে ১০-১২ ভাগের এক ভাগ হয়। মানবদেহের লোহিত কণিকা, লিভার কোষ, ডিম্বাণুর ব্যাস যথাক্রমে ৭ মাইক্রো, ২০ মাইক্রো এবং ১০০ মাইক্রো [১ মাইক্রন = ১ মিলি মিটারের হাজার ভাগের এক ভাগ] নিউক্লিয়সের আয়তন এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

নিউক্লিয়সের ভিতর আবার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হ'ল ক্রোমসোম। ক্রোমসোম সূত্রই মানুষের বংশগতি রহস্যের মূল কারণ। কোষগুলি বিভাজনের মধ্যে দিয়ে সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। একটি কোষ থেকে প্রায় সমান আকারের দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রতিটি অপত্য কোষে ক্রোমসোম সংখ্যা

জন্মদাতা কোষের সমান হয়ে থাকে। ক্রোমসোমের আকৃতি, প্রকৃতি, গুণাবলীও জন্মদাতা কোষের অনুরূপ হয়ে থাকে।

জীনগুলির অবস্থান এই ক্রোমসোম দেহে। জীন হ'ল ক্রোমসোমের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ। একটি নির্দিষ্ট ধর্মী জীন একটি নির্দিষ্ট ক্রোমসোমের নির্দিষ্ট অংশে অবস্থান করে। মানব শরীরের এবং গুণের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য এইরূপ অসংখ্য জীনের সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপের ফল।

যে মুহূর্তে যৌনমিলনের মধ্যে দিয়ে ডিম্বাণুর নিষেক ঘটছে, সেই মুহূর্ত থেকেই লব্ধ জীনগুলির ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শারীরিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ শুরু হয়। তারপর ক্রমাগত কোষবিভাজনের ভিতর দিয়ে সৃষ্ট নতুন ক্রোমসোমের অন্তর্গত জীনগুলি তাদের কাজ শুরু করে। এ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রত্বের কথা চিন্তা ক'রে মনে রাখা যেতে পারে, ডিম্বাণুর ব্যাস যখন ৭ মাইক্রো শুক্রাণুর ব্যাস তখন তার চেয়েও অনেক অনেক ছোট।

ক্রোমসোমের মুখ্য রাসায়নিক উপাদান হ'ল নিউক্লিক এ্যাসিড ও প্রোটিন। দুই প্রকারের নিউক্লিক এ্যাসিড আর. এন. এ. এবং ডি. এন. এ. ক্রোমসোমের ভিতর পাওয়া যায়। শতকরা হিসাবে ৪৫ ভাগ ডি. এন. এ. আর ১'২ থেকে ১'৪ ভাগ হ'ল আর. এন. এ.। বাকি অংশ হ'ল প্রোটিন। এই ডি. এন. এ-ই হ'ল জীনের উপাদান।

কোষের ভেতর ডি. এন. এ.-র অবস্থানটা এবং তার রাসায়নিক পরিচয় লক্ষ্য করা যেতে পারে। তা হ'লে বুঝতে সুবিধা হবে দানিকেনের কথা অর্থাৎ কীভাবে চারাগাছ কলম করার মতো সেই বুদ্ধিমান জীবেরা 'তাদের মধ্যে 'বপন' করেছেন 'জেনেটিক' বীজ দ্বিতীয় দফায় কৃত্রিম পরিব্যক্তির সাহায্যে।'২(৩৫)
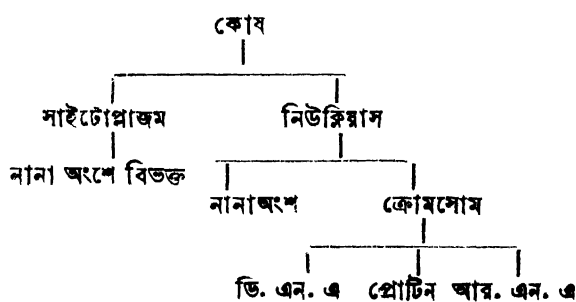
ডি. এন. এ. শরীরের কোন যন্ত্র বিশেষ নয়। এটি একটি উপাদান মাত্র। ডি. এন. এ. হ'ল একটি নিউক্লিক এ্যাসিড। জীবদেহে এই নিউক্লিক এ্যাসিডের

অণুগুলিই সর্ববৃহৎ। নিউক্লিক এ্যাসিড প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি নিউক্লিয়টাইড দ্বারা গঠিত। প্রতিটি নিউক্লিয়টাইড ফসফরিক, এ্যাসিড শর্করা ও নাইট্রোজেন যুক্ত বেসের দ্বারা গঠিত। ডি. এন. এ.তে যে বেসগুলি দেখা যায় তারা হ'ল থাইমিন, এ্যাডিনিন, গুয়ানিন ও সাইটোসিন। পৃথক পৃথক ক'রে ডিঅক্সি-রাইবোজ, নাইট্রোজেন বেস, ফসফরিক এ্যাসিড এবং তার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা নিউক্লিয়টাইডটি লক্ষ্য করা যেতে পারে। তারপর নিউক্লিয়টাইডের বিশেষ ভঙ্গিমায় গড়ে ওঠা ডি. এন. এ.-র অবয়বটি দেখা যাবে।

রাইবোজ হ'ল একটি শর্করা। তার রাসায়নিক অণুআকৃতি হ'ল নিম্নরূপ।

CH_2OH / OH–C–H / OH–C–H / OH–C–H / H–C=O → CH_2OH / OH–C–H / [H]–C–H / OH–C–H / H–C=O → CH_2OH, O, OH, H–C, C–H, H, H, C – C, OH, H

রাইবোজ ডি-অক্সিরাইবোজ ডি-অক্সিরাইবোজ
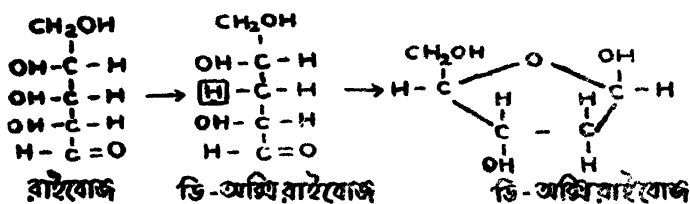
[চতুষ্কোণের ভিতর 'O' নেই]

রাইবোজ অণুর একটি 'OH' গ্রুপের অক্সিজেনটি না থাকায় তাকে বলা হয় ডি-অক্সি রাইবোজ। রাসায়নিক সঙ্কেতে H=হাইড্রোজেন, O=অক্সিজেন এবং C=কার্বন।

ডি. এন. এর বেস এ্যাডিনিনের অণুর রাসায়নিক সঙ্কেত নিম্নরূপ। এখানে N=নাইট্রোজেন।

NH_2, C, N, C, N, CH, C, CH, NH, N

ফসফরিক অ্যাসিডের রাসায়ানিক সঙ্কেত নিম্নরূপ। যথন P=ফসফরাস

O
||
OH – P – OH
|
OH
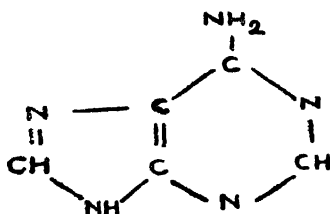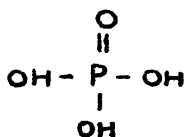
ডি অক্সি রাইবোজ, ফসফরিক অ্যাসিড এবং এ্যাডিনিনের সময়ে গঠিত নিউক্লিওটাইডের অণুটি হবে নিম্নরূপ :

[H_2O অপসারিত] [H_2O অপসারিত]
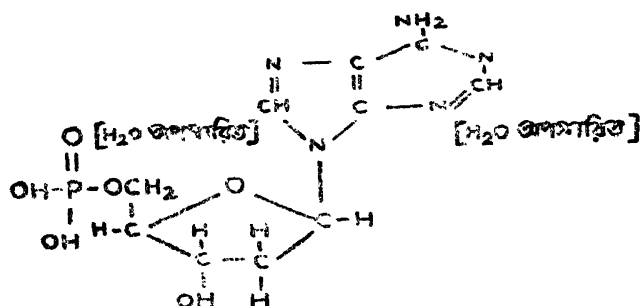
ফসফেট ডি-অক্সিরাইবোজ অ্যাডিনিন-নাইট্রোজেন বেস

ডি. এন. এ গঠনপ্রণালী যা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা হ'ল নিউক্লিয়টাইডের পরস্পর জড়ানো দুইটি রজ্জুর মতো অণু। এরা থাইমিন, এ্যাডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন এই কয়টি নাইট্রোজেন বেস সমূহের দ্বারা হাইড্রোজেন বণ্ডের মাধ্যমে যুক্ত।

এ্যাডিনিন, সাইটোসিন প্রভৃতিকে R অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করলে ডি. এন. এর রজ্জুর মতো গঠনের রাসায়নিক চেহারা হবে এই রকম :—
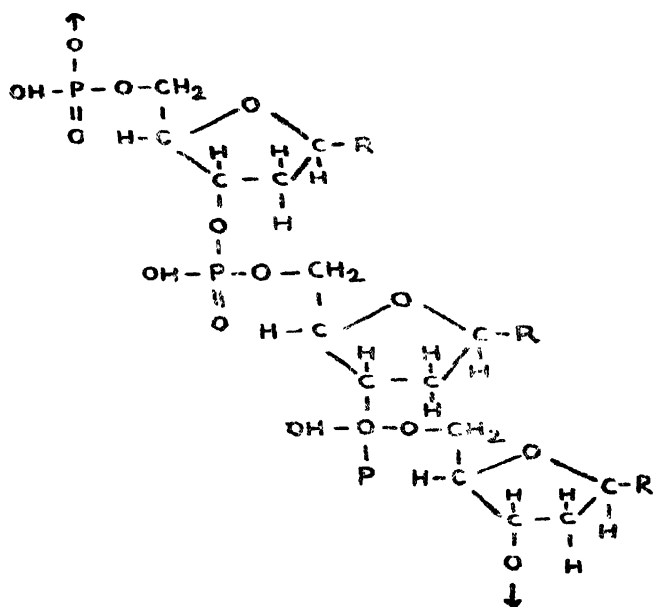
এই ভাবে দুইটি রজ্জুর মতো জড়িয়ে থাকে ডি. এন. এর বিরাট অণুটি। আক্ষরিক ভাবে অণুটির গঠন এই রকম :—
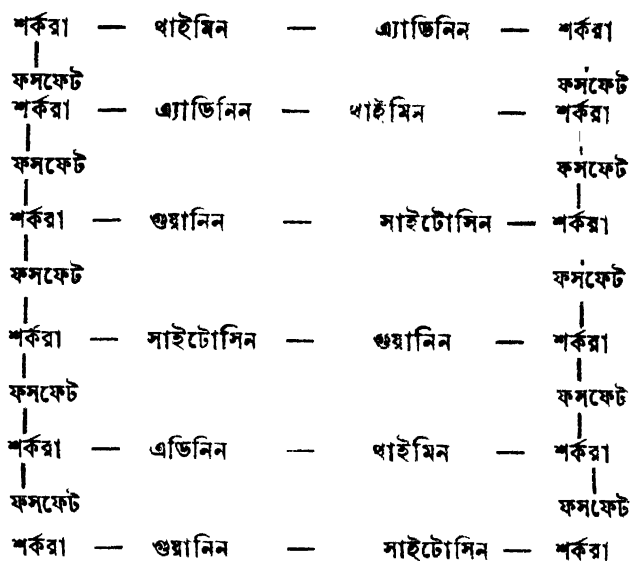
ডি. এন এর আদর্শ নক্সাতে থাইমিন, এ্যাডিনিন প্রভৃতি নাইট্রোজেন বণ্ডের মাধ্যমে সংযুক্ত। সেই নক্সার রূপটি এই রকম :—
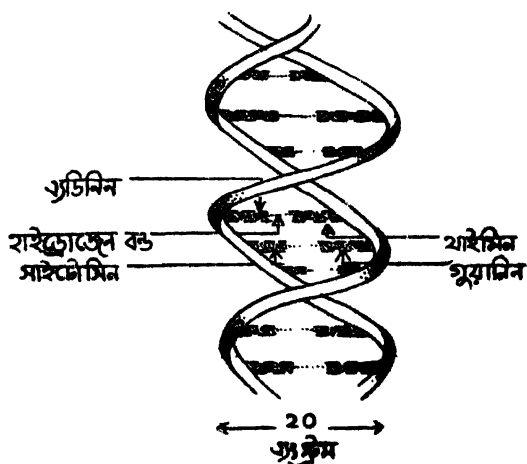
প্রতিটি রজ্জুর একটি বেস থেকে আর একটি বেস এর দূরত্ব ৩·৪ আংস্ট্রম [আংস্ট্রম $=10^{-10}$ মিটার অর্থাৎ 10^{-4} মাইক্রো] রজ্জুর একটি সম্পূর্ণ পাকের মধ্যে ১০ টি বেস থাকে। অর্থাৎ একটি পাকের দূরত্ব ৩৪ আংস্ট্রম। ডি. এন. এর একটি অণুর প্রস্থ ২০ আংস্ট্রম লম্বায় প্রায় ১০০০ গুণ বেশী। আঙ্গিক গঠনের এই হ'ল স্বরূপ।

এই সামগ্রিক বিন্যাসটিই হ'ল জেনেটিক কোড বা জীবন সঙ্কেতের মর্মার্থ। এইরূপ জীনের ধর্মসম্পন্ন ক্ষুদ্র ও অসংখ্য ডি. এন এ কণাই বংশগতির সমগ্র কার্যকলাপটি সম্পন্ন করছে। মানব বৈশিষ্ট্যের মৌল সমস্ত কার্যক্রমই চালিয়ে যাচ্ছে এই সঙ্কেত। একটি ডি. এন এর অণু কয়েক হাজার কিউক্লিয়টাইডের সমষ্টি। আর মানবদেহের একটি মাত্র কোষের ৪৬টি ক্রোমসোম সূত্রের মধ্যে অবস্থান করছে এক শত কোটি জোড়ার মতো নিউক্লিয়টাইড বেস।

জীন সম্পর্কে রাসায়নিক ও জীববিদ্যাগত এই ধারণার উপর দাঁড়িয়ে শল্য চিকিৎসকের কোন ছুরি এর উপর কী অস্ত্রপ্রচার চালাবে বা কী কৃত্রিম পরিব্যক্তি ঘটাবে তার হদিশ করা দানিকেনের সাধ্য হ'লেও আমাদের সাধ্য নয়। যেহেতু জীনকে প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তনের পিছনে অসীম গুণ-সম্পন্ন ব'লে আবিষ্কার করা হয়েছে সুতরাং বানর থেকে মানুষ সৃষ্টিতে দেবতারা জীনের কৃত্রিম পরিবর্তন ঘটিয়েছে ব'লে দাবি করা দানিকেনের সুবিধা হয়েছে। কিন্তু শরীরের অসংখ্য কোষের সংখ্যাতীত ক্রোমসোমের সঙ্কেতের উপর কৃত্রিম পরীক্ষার ধারণাটা কথা জুড়ে দেবার চেয়ে কোন বাস্তব ব্যাপার হ'তে পারে না। দানিকেনের তবু মত, 'আমাদের পূর্বপুরুষদের জেনেটিক কোডের সামঞ্জস্য বিধান ক'রে তাদের প্রবুদ্ধ ক'রে তুলেছিল।' এই 'সামঞ্জস্যে'র যে নির্দিষ্টভাবে কী অর্থ তা আমাদের বুদ্ধির অগোচর।

প্রসঙ্গক্রমে যে কথাটির উল্লেখ অত্যন্ত প্রয়োজন তা হ'ল কোন প্রাণীর বিবর্তনে তার বংশানুক্রম ও পরিবেশের মধ্যে কোনটি যে কোন অবস্থায় গুরুত্ব লাভ করবে তা বলা শক্ত। কেবল জীন সঙ্কেতের হেরফের পরিবেশকে অগ্রাহ্য ক'রে কোন পরিবর্তনকে চরমভাবে কার্যকরী করতে পারে না। বানর থেকে মানুষ হবার পথে কেবল জীনের প্রভাবই যে একমাত্র কার্যকর প্রভাব, এমন না হওয়াটাই স্বাভাবিক। আপাতদৃষ্টিতে জীনের প্রভাব অধিক বোধহয় বলেই দানিকেন জীনের কৃত্রিম পরিবর্তন ঘটিয়েই মানুষের আবির্ভাবের কথা ঘোষণা করেছেন।

পরিবেশ যে বিবর্তনে ও বৈশিষ্ট্য অর্জনে কত গভীর প্রভাব বিস্তার করে তার দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

হিমালয়ানস নামক এক জাতীয় খরগোসের পা, লেজ এবং কানের প্রান্ত-ভাগগুলি কালো রঙের, কিন্তু দেহের অন্য অংশ সাদা। উষ্ণতায় এদের বাচ্চারা হয় সাদা এবং শৈত্যের প্রভাবে হয় কালো। ড্রসিফিলার পায়ের সংখ্যা
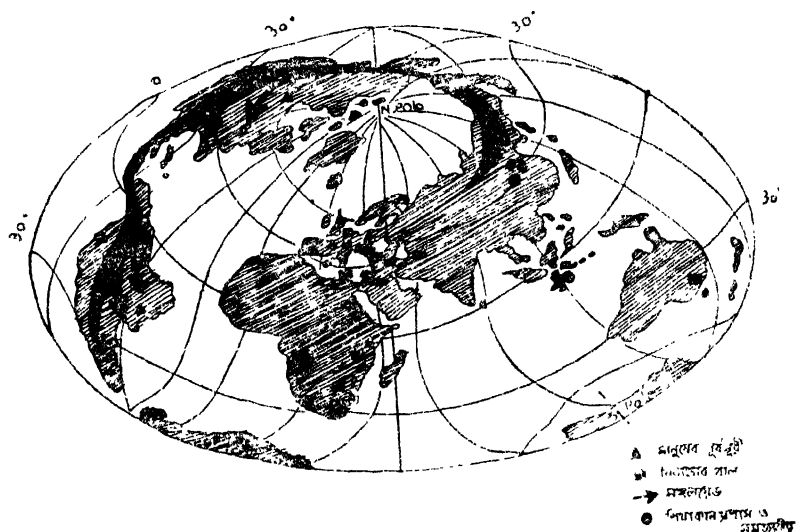
মঙ্গলয়েডদের ছড়িয়ে পড়া

স্বাভাবিক উত্তাপে হয় তিনজোড়া। খুব কম উত্তাপে বাচ্চা বড় হ'লে পায়ের সংখ্যা হয় ছয় জোড়া। সামুদ্রিক প্রাণী বোনালিয়ার স্ত্রীদের দেহ বিরাট। পুরুষ এত ছোট যে তারা প্রথমে স্ত্রীদের শুণ্ডতে এবং পরে জনন নালীর ভিতর প্রবেশ করে। এই অবস্থায় একটি লার্ভা স্ত্রী বোনালিয়ার শুণ্ডতে আশ্রয় নিলে সেটি পুরুষ বোনালিয়ায় পরিণত হয়। কিন্তু যদি সে জলের ভিতর স্বাধীন-ভাবে জীবন যাপন ক'রে বড় হয় তবে তা স্ত্রী প্রাণীতে পরিণত হয়। ক্রেপিডুলা নামক সামুকের বাচ্চারা স্ত্রী প্রাণীর ঘন সান্নিধ্যে বাস করলে পুরুষ আর স্ত্রী প্রাণী থেকে দূরে বড় হলে স্ত্রীশামুকে পরিণত হয়। অফ্রায়োট্রকা নামক সামুদ্রিক প্রাণীর নতুন জীবন সৃষ্টির সময় পুরুষ হিসাবে শুক্রাণু সৃষ্টি করে, পরে যখন বয়োবৃদ্ধি ঘটে তখন ডিম্বাণু সৃষ্টি করতে থাকে। মৌমাছির বাচ্চা হবার পর যারা স্বাভাবিক খাদ্য পায় তারা হয় স্ত্রী মৌমাছি যারা তা পায় না

তারা হয় শ্রমিক মৌমাছি। এম'নি অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে দেখান যায় যে কেবল জীনের অবস্থাই কোন প্রাণীর বংশধারাকে নির্দিষ্টভাবে বদলাতে পারে না। মানুষের বিবর্তনের জীবনসঙ্কেতের পরিবর্তন ও পরিবেশের প্রভাব উভয়েই নিশ্চয়ই কার্যকরী ভূমিকা পালন ক'রে থাকবে। কেবল জীনের কৃত্রিম পরিবর্তন উল্লম্ফন ঘটাতে পারে না যদিও কৃত্রিম পরিবর্তন বিষয়টিই রীতিমতো গল্পকথা।

মস্তিষ্ক নিয়ে রহস্যবাদ

প্রাচীন লিপি ও চিত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে দানিকেন বলেছেন, 'বিজ্ঞান তার উদ্ভট কল্পনার জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছে।' কী অদ্ভুত অভিযোগ। দানিকেন উদ্ভট কল্পনা করছেন না, উদ্ভট কল্পনার জাল বুনছে বিজ্ঞান। অথচ ছয়খানি গ্রন্থজুড়ে দানিকেন যা ছড়িয়েছেন তা যেমন একদিকে উদ্ভট অন্যদিকে তেমনি অবৈজ্ঞানিক।

মস্তিষ্ক সম্পর্কে তিনি যে সব মন্তব্য করেছেন তা একদিকে দেবতাদের অপারেশনের ভেল্কী আর অলৌকিকতার রোমাঞ্চ যুক্ত। কখনো বলেছেন মানব মস্তিষ্ক বিশ্বমস্তিষ্কের অংশ, কখনও বলেছেন মানব মস্তিষ্ক যে সব কাজ করে তা সেই অতীতের অসামান্য আগন্তুকদের রেখে যাওয়া স্মৃতির উন্মোচন। তাঁর কথায়, 'বহির্জাগতিক নভশ্চরেরা যখন তাদের আপন জন্মসৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের 'কলম' ক'রে বসিয়ে দিয়েছিল নরাকৃতি বানরের মগজে—অমন কলম আমরাও করি ছোট আকারে গাছ-গাছড়া অথবা গৃহপালিত জন্তুর ক্ষেত্রে—তখন তারা তাদের অত্যুন্নত অতিন্দ্রিয় উপলব্ধি শক্তিকেও স্থানান্তরিত করেছিল তাদের আপন অবয়বে অবয়বীদের সত্তায়।'৫(২৮৬) একথা বলতে গিয়ে তিনি মানুষের সমস্ত কর্ম, শক্তি সাধনাকেই উড়িয়ে দিয়েছেন এই ব'লে, 'প্রতিভা শুধু পরিশ্রমের ফল নয়, নয় বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তি তর্কের পরিণতি। আমার ধারণা প্রতিভা প্রধানত বহির্জাগতিক শক্তির কাছে অশিক্ষিত মস্তিষ্ককে উন্মোচন করবার ক্ষমতা।' হেঁয়ালির এখানেই শেষ নয়। তিনি বলেছেন, 'মানব মস্তিষ্কটা যোগাযোগের মাধ্যম ছিলও বটে আছেও বটে। আধুনিক গবেষণা থেকে বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ মিলেছে মানুষ 'প্রাকৃতিক নিয়মের' অতীত পরামণ:শক্তির অধিকারী।' ৫(২৯৬) কোথায় বিজ্ঞানসম্মত কী প্রমাণ দানিকেন পেয়েছেন আমাদের জানা নেই। তবে তিনি এ প্রমাণ পেয়েছেন, 'আমার বিশ্বাস উপযুক্ত কাল উপস্থিত হলেই বহির্জাগতিক মানুষ 'পাঠিয়ে দেয় দিব্যদর্শনের স্পন্দন।'৫(২৯৭) প্রতিভা সেই

উপযুক্ত কালে পেয়ে যাওয়া সিগন্যালের ফল। অর্থাৎ মস্তিষ্ক পরিশ্রমও পরিবেশের বিবর্তিত ফল নয়।

বিজ্ঞানের কাছে মস্তিষ্ক হ'ল আজ পর্যন্ত বস্তুর বিকাশের সর্বোত্তম রূপ। যেখানে বস্তুর বিকাশে পরিবর্তনের ধারায় এমন একটা গুণগত উত্তরণ ঘটেছে যে তাকে নিছক বস্তুধর্ম দিয়ে আর ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বস্তুর ধর্মই হ'ল সরল থেকে জটিল হওয়া, ক্রমবিকশিত হওয়ার পথে বিভিন্ন ধর্মের পরিমাণগত বৃদ্ধি ঘটিয়ে তাকে গুণগত ভাবে বদলিয়ে দেওয়া। এই বৈশিষ্ট্যকে অনুধাবন করতে না পারার ফলেই দেখা দেয় আধ্যাত্মিক সমস্ত চিন্তা। ইট, গাছ, পাথরের সঙ্গে মিল খুঁজে না পেলেই ঈশ্বরকে ডেকে আনা হয়। দানিকেনের ঈশ্বর হ'ল গ্রহান্তরের মানুষ। তাকে তিনি ঈশ্বরের মতো সবকিছু অবলীলাক্রমে করতে পারার ক্ষমতাসম্পন্ন হিসাবে গড়ে তুলেছেন। মানুষের পরিশ্রমের ইতিহাসকে তাই তিনি অনায়াসে বাতিল করতে পারবেন।

মস্তিষ্ক ও তার কাজের ধারণা কিছুটা করতে পারলে মস্তিষ্ক যে প্রাণি-জগতের নিয়মেরই একটি বিশেষ ধরন, কোন অলৌকিক কাণ্ডকারখানার কেন্দ্র নয় সে সম্পর্কে বোঝার সুবিধা হবে।

মানব দেহের যাবতীয় অনুভূতির কেন্দ্র হ'ল মস্তিষ্ক। অনুভূতি থেকে প্রাথমিকভাবে ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সূত্রপাত। আদিম প্রাণী থেকে আজকের সর্বোন্নত প্রাণী মানুষের ক্ষেত্রে পর্যন্ত এই অনুভূতি ও তার প্রতি সাড়া দেবার ধারা প্রক্রিয়ার বিচার বিশ্লেষণ করেই বোঝা সম্ভব হয়েছে যে মানব মস্তিষ্ক একটি বিবর্তিত প্রাণচৈতন্যের মূল পরিচালনা কেন্দ্র।

বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ সাধনের জন্য শরীরের নানা অঙ্গ নানাভাবে কাজ করে। স্নায়ুতন্ত্র হ'ল তার ভিত্তি। এই স্নায়ুতন্ত্র কোন হঠাৎ ঘটে যাওয়া বা কোন অতিমানবের হস্তক্ষেপের ফলে গড়ে ওঠে নি। স্নায়ুতন্ত্র হ'ল, কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ফল। স্নায়ুতন্ত্রের একটু ধারণার মধ্যে গেলেই শারীরবৃত্তীয় কাজের পিছনে যে বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে তা অনুধাবন করা যাবে। স্নায়ুতন্ত্রের কার্যাবলীকে বিশ্লেষণ করে না দেখিয়ে গ্রহান্তরের সুউন্নত প্রাণীকে দিয়ে অস্ত্রোপচার জাতীয় কাজ করাবার উদ্ভট তত্ত্ব হাজির করার অর্থ হ'ল আলোর দিকে পর্দা লাগিয়ে অন্ধকার ক'রে সেই আঁধারে আলো খোঁজার মতো।

পরিবেশের পরিবর্তনই হ'ল উত্তেজনা যাতে প্রাণী সাড়া দেয়। প্রাণীর

উত্তেজনায় সাড়া দেবারও ক্রমবিবর্তন ঘটেছে সরল প্রাণী থেকে উন্নত প্রাণীতে আসতে গিয়ে।

এককোষী প্রাণীর ক্ষেত্রে উত্তেজনায় সাড়া দেবার অর্থ হ'ল কোষের তরলাংশের ধর্মের পরিবর্তন। প্রোটজোয়া, ফাংগি প্রভৃতি প্রাণীর ক্ষেত্রে উত্তেজনায় সাড়া দিয়ে এগিয়ে বা পিছিয়ে আসতে দেখা যায়। এদের বিশেষ ধরনের গ্রহণ ক্ষমতা ও সেই অনুসারে কাজের ক্ষমতা রয়েছে। আরো উন্নত প্রাণীর ক্ষেত্রে উত্তেজনায় সারা দেওয়া বলতে পরিবেশের সঙ্গে শরীর ও তার অংশকে সামঞ্জস্য ক'রে নেওয়া বোঝায়। উন্নত প্রাণীর ক্ষেত্রে উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া অর্থ রাসায়নিক পরিবর্তন ও স্নায়ুতন্ত্রের ধর্মে পরিণত হয়েছে। রাসায়নিকভাবে হর্মোন সৃষ্টি ও স্নায়ুতন্ত্র হিসাবে মস্তিষ্ক ও সুষুম্নকাণ্ড কাজ করে।

স্নায়ুতন্ত্রের উচ্চতর ও নিম্নতর অবস্থার পার্থক্য হ'ল মূল যন্ত্রগুলির বিন্যাসে। সংযোগ সাধনকারী নিউরন কোষের আধিক্য ও সান্নিকট্যই উত্তেজনা বহন ক'রে নিয়ে যাওয়া ও ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। এর ফলে উত্তেজনায় সাড়া দেওয়াটা কেবল কতকগুলি সাধারণ সাড়া দেওয়ার যোগফল হয় না, বরং অনেকগুলি সাড়া দেওয়ার এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া হিসাবে কাজ করে। সাধারণ কোষ জটিল ভাবে সাড়া দিতে পারে না ব'লে উন্নত প্রাণীর বিশেষ কোষ 'নিউরন' সৃষ্টি হয়েছে।

মানব দেহের স্নায়ুতন্ত্রকে সাধারণভাবে দুই ভাগ করা যেতে পারে—মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জা বা স্নায়ুজালিকা।

মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের সংযোগকারী স্নায়ুজালিকা ধরলে স্নায়ুগুচ্ছগুলিকে ৬ ভাগে ভাগ ক'রে দেখা যেতে পারে—দুই বাহু জুড়ে ৮ জোড়া সার্ভিকাল নার্ভ; চামড়া, ভিতরের যন্ত্রাংশ এবং বুকে বিস্তৃত ১২ জোড়া থোরেসিক নার্ভ; তলপেট ও পায়ের দিকে প্রসারিত ৫ জোড়া লুম্বার নার্ভ; দুই পায়ে ছড়িয়ে পড়া ৫ জোড়া স্যাক্রাল এবং ১ জোড়া কসিজিয়াল নার্ভ; এই পাঁচটি প্রধান সুষুম্না-কাণ্ডের নার্ভসহ ১২ জোড়া ক্র্যানিয়াল নার্ভ মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জাকে যুক্ত ক'রে রয়েছে। (পরের পৃষ্ঠায় চিত্র প্রদর্শিত হল।)

মস্তিষ্কের পাঁচটি ভাগ: (১) টেলেন্সেফেলন বা গুরুমস্তিষ্ক (২) ডায়েন্সেফেলন বা আন্তমস্তিষ্ক (৩) মেসেন্সেফেলন বা মধ্যমস্তিষ্ক (৪) মেটেন্সেফেলন বা অণু-মস্তিষ্ক (৫) মিয়েন্সেফেলন বা নিম্নমস্তিষ্ক। এই সাধারণ বিভাগ অনুসারে কেবল

মস্তিষ্কের অংশকেই বোঝা যায়। আর একটি বিভাগ অনুসারে মস্তিষ্ককে তিনটি ভাগে চিহ্নিত করা হয়—সেরিবেলাম বা লঘু মস্তিষ্ক, সেরিব্রাম বা গুরুমস্তিষ্ক এবং ব্রেনস্টেম।

টেলেন্সেফেলন, ডায়াঙ্গেফেলন এবং মেসেন্সে:ফলনের উপরাংশ নিয়ে
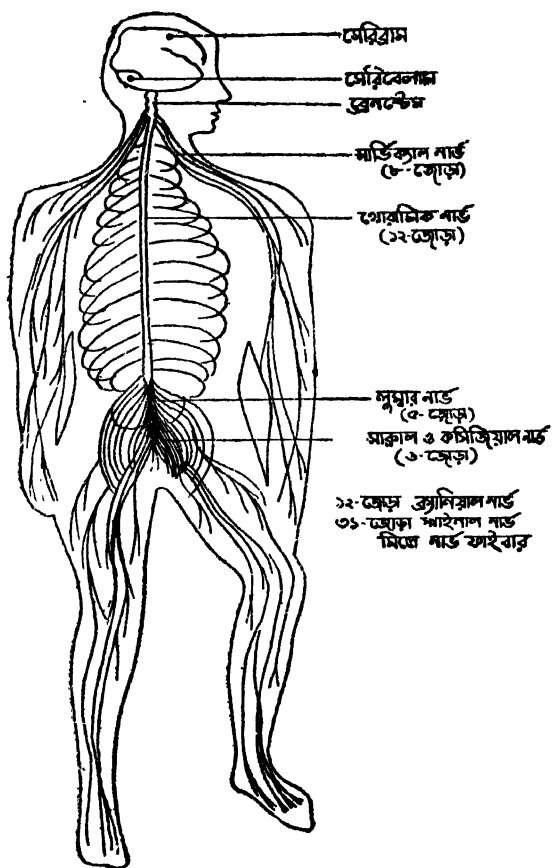
নার্ভজালিকা

সেরিব্রাম বা গুরুমস্তিষ্ক তৈরি হয়েছে। পন এবং সেরিবেলাম বা লঘুমস্তিষ্ক নিয়ে মেটেন্সে:ফলন গঠিত। অংশ অনুসারে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের ভাগ এই ভাবে দেখা যেতে পারে, যার প্রতিটি অংশের সুস্পষ্ট কাজ রয়েছে। (চিত্র পর পৃষ্ঠায়।)

সরলভাবে মস্তিষ্ককে তিনভাগে বিভক্ত ক'রে এইভাবে দেখা যেতে পারে।

বিভাগ সরল হ'লেও কাজ জটিল। কাজ জটিল হলেও তা রহস্যময় নয়, যেমন দেখিয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিক দানিকেন। (সরলবিভাগের চিত্র পর পৃষ্ঠায়।)
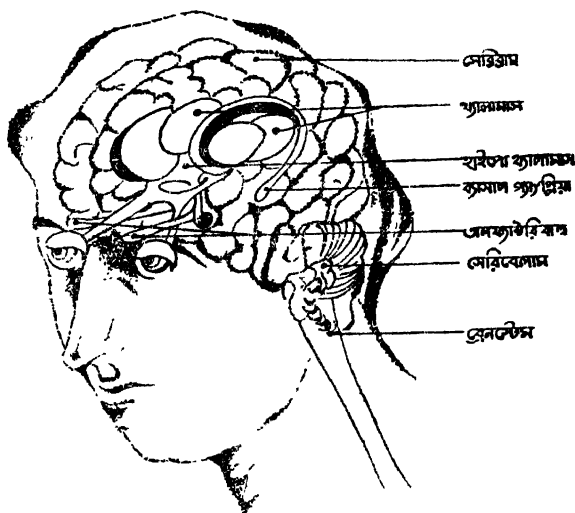
মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ

গুরুমস্তিষ্কের দুটি ভাগ—বাম ও দক্ষিণ গোলার্ধ। গুরুমস্তিষ্কই হ'ল বৃহৎ অংশ। যে আবরণে এটি ঢাকা থাকে তাকে সেরিব্রাল করটেক্স বা মস্তিষ্ক বল্কল বলে। গুরুমস্তিষ্কে প্রধান দুটি ভাগের মধ্যবর্তী খাঁজের নাম মিডিয়াম ফিসার বা মধ্যবর্তী খাঁজ। অন্য দুটি খাঁজের নাম সিলভিয়াসের খাঁজ ও রোলাণ্ডোর খাঁজ। এই খাঁজগুলি দেবতাদের ছুরির প্রয়োগের জন্য হয় নি—এগুলি হয়েছে বিবর্তনের ধাপে ধাপে মস্তিষ্ক বৃদ্ধির সময় করোটিতে স্থানাভাবের কারণে। সমগ্র মস্তিষ্কটি তিনটি আবরণে ঢাকা, এই আবরণগুলিকে বলে মেনিঞ্জেস্। তার উপর আছে শক্ত হাড়ের করোটি বা খুলি।

গুরুমস্তিষ্ক পাশ থেকে দেখলে দেখা যাবে মস্তিষ্ক বল্কলে লোব বা বেরিয়ে পড়া অংশ রয়েছে চারটি—ফ্রন্টাল বা সম্মুখ, টেমপোরাল বা পাশ, প্যারাইটাল বা মধ্য এবং অক্সিপিটাল বা পিছন লোব। গুরু মস্তিষ্কের দুটি অংশেই এমন লোব দেখা যাবে।

প্রসঙ্গক্রমে যেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হল, মস্তিষ্ক বল্কলে এই অংশগুলি নিম্নশ্রেণীর কোন প্রাণীর মস্তিষ্কে নেই। এগুলি ক্রমবিবর্তনের ফলে মানব মস্তিষ্কে রূপ পেয়েছে। খাঁজ এবং বেরিয়ে পড়া লোব এই দুটি জিনিসই

বিবর্তিত মানব মস্তিষ্কের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সেই জন্য এই গোটা আবরণীটিকেই বলা হয় নিও করটেক্স বা নয়া আবরণী। নিম্নস্তরের প্রাণীদের মধ্যে যে লোব গুলির প্রাধান্য ছিল তা বর্তমানে মানব মস্তিষ্কে থাকলেও সেগুলি অপ্রধান বা অপস্থয়মাণ অবস্থায় পৌঁছে গেছে। এই ধরনের অংশ হ'ল অলফ্যাক্টরি,
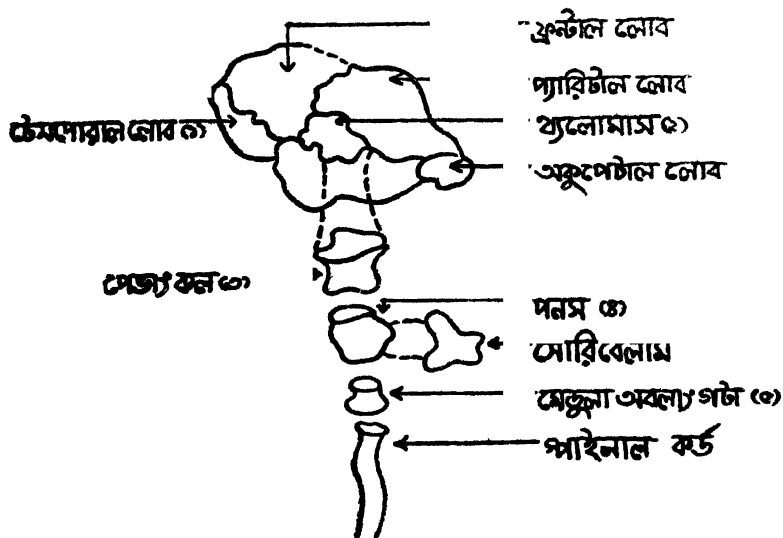
মস্তিষ্কের সরল বিভাগ

ব্রেনস্টেম—৩-এর একাংশ + ৪ + ৫ মিলে গঠিত।
সেরিগ্রাম—১ + ২ + ৩-এর উপরাংশ।
সেরিবেলাম—পৃথকভাবে চিত্রিত।

লিমবিক, ইনস্যুলার লোব। এই ধরনের করটেক্সকে এ্যালো করটেক্স বা পুরাতন বল্কল বলে। নয়া আবরণীর লোবগুলি উন্নত প্রাণী মানুষের শ্রবণ, দর্শন, বাক, চিন্তন প্রভৃতি কার্যগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, পক্ষান্তরে শেষোক্ত লোবগুলি নিম্নস্তরের প্রাণীর তীব্র ঘ্রাণশক্তি জাতীয় ক্ষমতার উৎস।

নিম্নমস্তিষ্কেও বল্কল রয়েছে। গুরুমস্তিষ্ক যখন সমস্ত মানসিক কার্য্যক্রমকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে, নিম্নমস্তিষ্ক তখন শরীরের ভারসাম্য রক্ষা, স্বাভাবিক স্নায়বিক কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের ক্ষেত্রে গুরুমস্তিষ্কের পরিমাণ নিম্ন মস্তিষ্কের বেশ কয়েক গুণ। এ থেকেও বোঝা যায় যে, পশুর ক্ষেত্রে যখন ইচ্ছানিরপেক্ষ কার্যকলাপের প্রাধান্য মানুষের ক্ষেত্রে তখন ইচ্ছাধীন কাজের দিকই প্রধান।

গুরুমস্তিষ্কের ভিতরের দিকে গর্তের চারপাশে সূক্ষ্মজালতন্ত্র বা রেটিকিউলার ফরমেশন রয়েছে। নিম্নমস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের দুপাশে এমনি সূক্ষ্ম নার্ভজালিকা আছে, তাকে বলে গ্যাংগ্লিয়ন। রেটিকিউলার ফরমেশনের কাজ হ'ল, গ্যাংগ্লিয়ন ও মস্তিষ্ক বল্কলের মধ্যে যোগসাধন। মস্তিষ্ক বল্কল যখন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের সাহায্যে নানা অনুভূতি, উত্তেজনা সৃষ্টি করে তখন তাকে প্রয়োজন মতো কম বেশী করার দায়িত্ব এই রেটিকিউলার ফরমেশনের। স্বশাসিত স্নায়ু ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক এই গ্যাংগ্লিয়ন। গ্যাংগ্লিয়ন শরীরের অভ্যন্তরস্থ হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, ফুস্ফুস প্রভৃতির কার্যকে নিয়ন্ত্রণ করে।

মস্তিষ্কের একটি বিশেষ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হ'ল থ্যালামাস। দেখতে ডিম্বাকৃতি—এক জোড়ায় অবস্থান। এটি সংবেদন নার্ভের কাজের কর্তৃত্ব করে। ব্যাসাল গ্যাংগ্লিয়া হ'ল থ্যালমাসের কাছে অবস্থিত। এর কাজ হ'ল চেস্টীয় স্নায়ুর নিয়ন্ত্রণ করা। হাইপো থ্যালামাসের কাজ হ'ল শরীরের তাপ, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আবেগ, যৌনবোধ, ভয়, রাগ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা। অলফ্যাক্টরি স্নায়ু বাহ্য ঘ্রাণশক্তিকে মাথায় চালান দেয়। অপটিক নার্ভ দর্শনকে মস্তিষ্কে চালোনা করে।

এ সমস্ত কিছু মস্তিষ্ককে একটি জটিল যন্ত্র বিশেষ হিসাবেই তুলে ধরে যার প্রক্রিয়া আবার মস্তিষ্কতে ক্রিয়া ঘটায়। কোন দূর মহাকাশের গ্রাহক যন্ত্র বা বহুকালের ধরে রাখা বাণীর রেকর্ডার হিসাবে মস্তিষ্ককে আদৌ দেখা সম্ভব নয়। মানুষের এই অতিউচ্চ স্নায়ুতন্ত্র যে ক্রমবিকশিত সরল স্নায়ুযন্ত্রের পরিণাম এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই।

স্নায়ুতন্ত্র প্রাথমিক স্তরে ছিল কেবল কোষের কার্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। জেলিফিস প্রভৃতি প্রাণীর ক্ষেত্রে সারা শরীরে ছড়িয়ে থাকা, বিশেষ ভাবে বহিরঙ্গে, নার্ভসেলগুলিই উত্তেজনাতে সাড়া দেবার কাজ করে।

পরবর্তী স্তরে খুব সরল ধরনের কেন্দ্রীভূত নার্ভ কোষ দেখা দিয়েছে উত্তেজনায় সাড়া দিতে। হাইড্রা প্রভৃতি প্রাণীর ক্ষেত্রে এই নার্ভকোষগুলি বিশেষভাবে মুখের কাছে থাকে।

এরপর কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র শিথিলভাবে গড়ে উঠেছে তিনটি স্তরে। প্রথমতঃ মুখের কাছে নার্ভ রিং বা শরীরের বহিরাংশে নার্ভ জালিকা সৃষ্টি হওয়া। দ্বিতীয়তঃ খুব নীচু স্তরের মস্তিষ্ক সৃষ্টি হওয়া। তৃতীয়তঃ মস্তিষ্ক প্রাধান্য পাওয়া। মেরুদণ্ডী প্রাণীতে এসেই স্নায়ুতন্ত্র পরিষ্কার একটি বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে প্রাধান্য পেতে শুরু করে।

মেরুদণ্ডীর মস্তিষ্কের সাধারণ বিভাগগুলির ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কীভাবে অলফ্যাক্টরি বাল্ব ক্রমশঃ কমে এসেছে, নিওপ্যালিয়াম এবং রিনাল ফিসার ক্রমশঃ মস্তিষ্কে দেখা দিয়েছে ও সুস্পষ্ট হয়েছে।
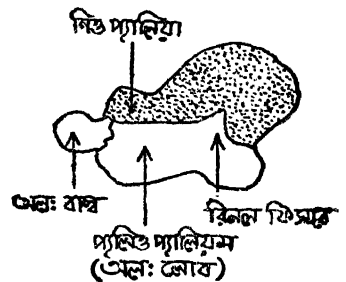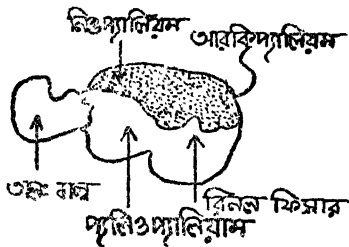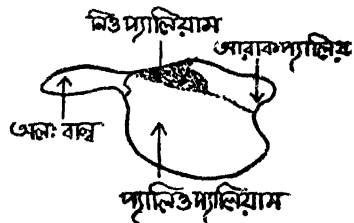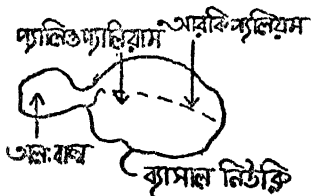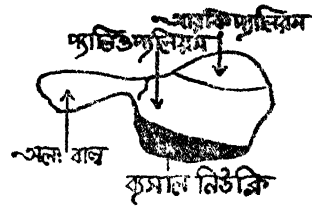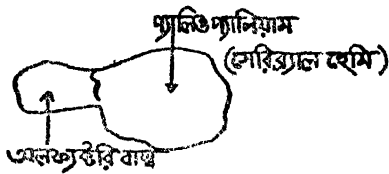
মস্তিষ্কের ক্রমবিকাশ

শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম ও মস্তিষ্কের কার্যাবলীর অসাধারণ ক্ষমতার স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা করতে হ'লে একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কথা স্মরণ রাখা দরকার। এই রাসায়নিক নিঃসরণ শরীরের বৃদ্ধি, পরিচালনা ও বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই বিশেষ রসের নাম হর্মোন। দেবতার শল্য চিকিৎসার ফলে যে এই রস নির্গমন শুরু হয় নি তার প্রমাণ যে হর্মোন রস এমন কি গাছের ক্ষেত্রেও কাজ করে। বীজ থেকে যখন একাংশ উর্ধ্বে ওঠে এবং অপরার্ধ মাটিতে প্রোথিত হয়, তখন অক্সিন নামে এক প্রকার হর্মোন এই কাজে সাহায্য করে।

মানবদেহে হর্মোন নিঃসরণের বিভিন্ন গ্রন্থিকেন্দ্র রয়েছে। তার মধ্যে প্রধান হ'ল ছয়টি—পিটিউটারি, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, এড্রিন্যালস, আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারান্স এবং গোনাড। আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত বিভিন্ন হর্মোন বা গ্রন্থিরস ছাড়াও আরো নানা রকম হর্মোন থাকা স্বাভাবিক ব'লে শারীরবিদ্‌রা মনে করেন।

মস্তিষ্কের অন্তর্ভুক্ত পিটিউটারি গ্রন্থি সম্পর্কে আলোচনা করলে মানবদেহের শরীর ক্রিয়ার পিছনে কোন আদিদৈবিক হস্তক্ষেপের থেকে শারীরিক কার্যক্রমকেই মূল বলে বোঝার সুবিধা হবে। মস্তিষ্ক বহির্জাগতিক বার্তার উত্তরদাতা থেকে পার্থিব কার্যকারণের প্রতিফলক হিসাবেই বেশী প্রতিভাত হবে।

পিটিউটারি একটি মটরদানার মতো গ্রন্থি। নাকের পিছনে মাথার ভিতরে এর অবস্থান। হাইপথ্যালামাস নামক মস্তিষ্কের অংশের সঙ্গে যুক্ত। একে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—সম্মুখ, পশ্চাৎ ও মধ্য অংশ। উল্লিখিত প্রধান ছয়টি গ্রন্থির হর্মোন রস নির্গত হবার জন্য এই গ্রন্থির সম্মুখভাগ কাজ করে। সারা শরীরের অস্থি ও টিস্যুর বৃদ্ধিতে, গর্ভধারণের সময় দুগ্ধ সৃষ্টিতে এই অংশ কাজ করে। মধ্যভাগের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার উপর শরীরের রঙ, চুলের রঙ ও চামড়ার স্বাস্থ্য নির্ভর করে। পিছনের ভাগ শরীরের জল যা কিডনির সাহায্যে বিশোধিত হয় তাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রসববেদনার পর সন্তান প্রসবে গর্ভকে পরিচালনা করে।

পিটিউটারি গ্রন্থি শরীর-রস নিয়ন্ত্রণে যে ভূমিকা পালন করে তা মস্তিষ্কের শরীর পরিচালনার মতোই। পিটিউটারি ছাড়া অন্য গ্রন্থিগুলি যখন কোন কারণে রস নিঃসরণে ব্যর্থ হয় বা অপেক্ষাকৃত কম সফল হয় তখন পিটিউটারির সমগ্র অংশ যৌথভাবে তা পুষিয়ে দেবার জন্য সেই গ্রন্থিকে উত্তেজিত করে। আবার অন্য গ্রন্থি যদি কোন কারণে অধিক পরিমাণ হর্মোন নিঃসরণ করে তখন পিটিউটারি সে ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার্থে সেই গ্রন্থিকে উত্তেজিত করবার জন্য যে রস নিঃসরণ হয় তা কমিয়ে দিয়ে সমগ্র অবস্থাটি স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে।

থাইরয়েড শরীরের রাসায়নিক কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই গ্রন্থির কার্যকলাপের উপরই কোন ব্যক্তির শক্তিসামর্থ্য নির্ভর করে। প্যারাথাইরয়েড হ'ল শরীর সম্পর্কীয় রসায়ন ক্রিয়ার মধ্যে ক্যালসিয়ামের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। থাইমাস শিশুবয়সে বীজাণু আক্রমণ প্রতিষেধক এক প্রকার শ্বেত কণিকা সৃষ্টি করে। পাকস্থলিতে জারক রস সৃষ্টি করে যা দিয়ে খাদ্য হজম হয়। এড্রিন্যালস

শরীরের লবণ ও জলভাগকে পরিচালনা করে ও বিশেষ সময়ে জোগান
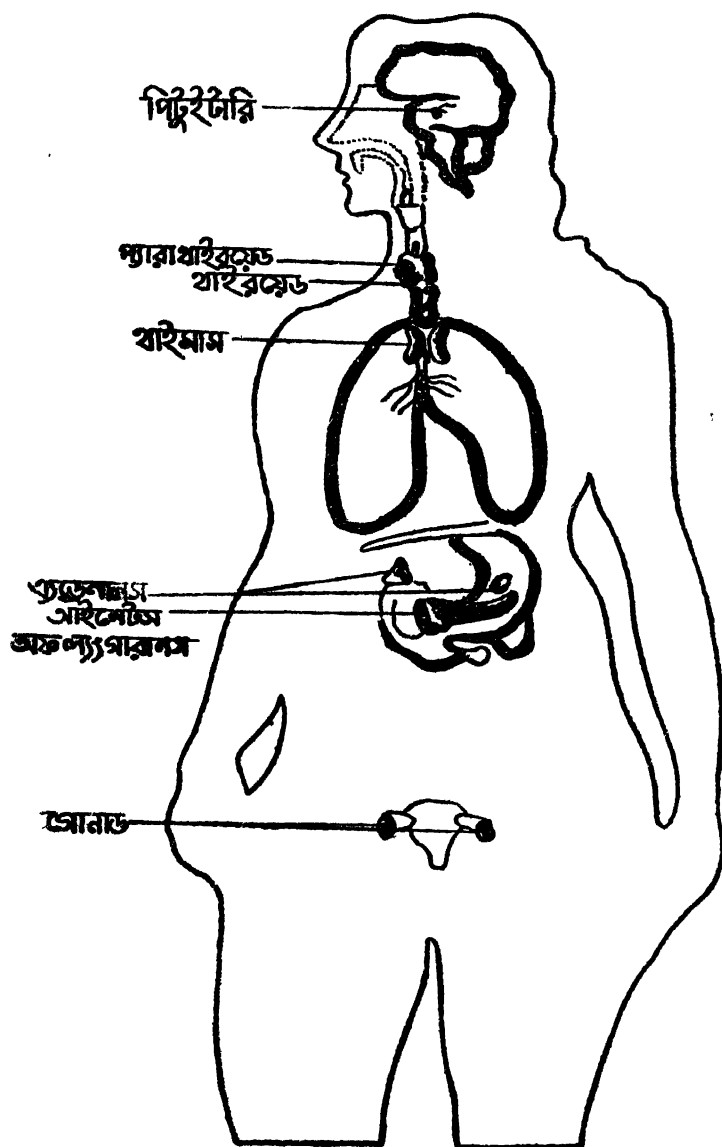
হর্মোন কেন্দ্র

দেয়। প্যাংক্রিয়াসের আইলেটস্ অফ ল্যাঙ্গারহনস্ রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণ করে। গোনাড হ'ল শরীরের যৌন-বৈশিষ্ট্যের ও প্রবণতার নিয়ন্ত্রক।

এইসব রস নিঃসরণ ও মস্তিষ্কের কাজ পরস্পর নির্ভরশীল। আর মস্তিষ্কের জটিলতা, তার স্বক্রিয় বৈশিষ্ট্যই যে মানুষের নানা বিশেষত্বের পিছনে কাজ করে হর্মোনতত্ত্ব তার প্রমাণ। শারীরবৃত্তীয় গঠন ও বিবর্তনের ধারাবাহিকতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এগুলির অস্তিত্ব ও বৃদ্ধি কোন হঠাৎ ঘটে যাওয়া অবস্থার ফলে যে হয় নি সে সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায়।

মস্তিষ্ক সম্পর্কে সমগ্র তথ্য এখনও মানুষের কাছে পরিষ্কার নয়। কোটি কোটি মস্তিষ্ককোষের কার্যকলাপ ও বিন্যাস আজও অস্পষ্ট। একমাত্র গুরু মস্তিষ্কে কোষ সংখ্যাই হ'ল ১৫০ কোটি। এ থেকে অনুধাবন করা যেতে পারে যে, সমগ্র মস্তিষ্কের কার্যক্রম সঠিকভাবে জানা কী জটিল ব্যাপার।

মস্তিষ্ক যে কত উন্নত ধরনের এবং বিরাট ক্ষমতার অধিকারী তার একটি প্রমাণ হ'ল মস্তিষ্কে নতুন কোষ তৈরি না হলেও কাজ চলে যেতে পারে। কিছু অংশ নষ্ট হ'লেও বাকি অংশ সে কাজ চালিয়ে নেয়। লুই পাস্তুরের মাথায় ৪৬ বছর বয়সে রক্তক্ষরণ হয়। এর পরও তিনি বেঁচেছিলেন ২৭ বছর। কেবল বেঁচে ছিলেন না বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়েছেন এবং তা অত্যন্ত উঁচু দরের। মৃত্যুর পর তাঁর মাথা অস্ত্রোপচার ক'রে দেখা যায় যে দক্ষিণার্ধ মস্তিষ্ক তার সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গিয়েছিল।

প্রাইমেটদের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের বিশ্লেষণী ক্ষমতার বিকাশ ঘটেছে প্রধানতঃ সেরিব্রাল করটেক্সের বিকাশের মধ্যেই। তারপর মাংসাহার, দাঁড়িয়ে চলা, হাতিয়ার ব্যবহার ও কথা বলার ভিতর দিয়ে মাথার আরো পরিবর্তন ঘটেছে। মস্তিষ্ক ভরের শতকরা ৮৭ ভাগ রয়েছে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারে এবং ১১ ভাগ সেরিবেলামে।

নিও করটেক্স প্রাইমেটদের বেড়েছে। মানুষের ক্ষেত্রে আরো বেড়েছে। মানুষের মাথায় মোট নিউরনের সংখ্যা প্রায় ১৪০০ কোটি। অন্যান্য প্রাইমেটদের মধ্যে মস্তিষ্ক নিউরনের সবাধিক সংখ্যা হ'ল ১০০ কোটি।

মানব মস্তিষ্কের যে পরিবর্তন মাতৃগর্ভে সাধিত হয় তার ক্রমবিবর্তন ও বিকাশ লক্ষ্য করলে মনুষ্যেতর প্রাণী থেকে মানব মস্তিষ্কের বিবর্তনের এক সম্পূর্ণ রূপরেখা পাওয়া যায়। সেখানে কোন স্তরে এসে লাফ দিয়ে পরিবর্তন কিছু ঘটতে দেখা যায় না। প্রাইমেটদের মাথার সাথে তুলনা করলে মানব মস্তিষ্কে সমস্ত অঙ্গেরই প্রায় একই রকম অবস্থান দেখা যায়। পার্থক্য তার পরিমাণগত ও পরস্পর অনুপাতের। সুতরাং মানুষ পার্থিব ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় সাড়া দিতেই

এই রূপ লাভ করেছে, অপার্থিব কোন বার্তায় সাড়া দেবার সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ নেই।

দানিকেন পার্থিব বিবর্তনমূলক সব ঘটনা ও মানব মস্তিষ্কের নিজস্ব ক্রিয়া প্রক্রিয়ার কোন মূল্য দিতে নারাজ। তাঁর মতে, 'আজ কার মাথায় অদ্ভুত কোন কল্পনা খেলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তো বলা চলবে না সে কল্পনার স্রষ্টা বা আবিষ্কর্তা সেই। কোন পরিকল্পনার প্রাথমিক খসড়াটুকুকে আদিম স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে তুলে সে শুধু ভাসিয়ে দিয়েছে চেতন-মনের ওপর তলায়। সুদূর অতীতে সাজিয়ে রাখা 'কার্ডের ছিদ্র' থেকে আজকের সৃষ্টিশীল মানুষকে বের ক'রে আনতে হবে বিশেষ জ্ঞান-টিকে, বিশেষ মুহূর্তে।'৪(২০) এ যেন কম্পিউটারের গুঁজে দেওয়া তথ্য সমাবেশ। অতি প্রাকৃত মানুষ তার নিয়ন্ত্রক। মানব মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য এখানে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্ক পাভলভ বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা ক'রে দেখিয়েছেন। ফ্রয়েড ইয়ুং যখন মানসিক কার্যাবলীর সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারকে রহস্যময় ক'রে তোলেন পাভলভ সেখানে শারীরবিজ্ঞানী কার্যকারণ দিয়ে মানব আচরণকে ব্যাখ্যা করেন। দানিকেন এই সমস্ত প্রচেষ্টাকে এক রোমাঞ্চকর কুহেলিকায় নিয়ে গিয়েছেন। সাজিয়ে রাখা জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে একটি একটি ক'রে মণিমুক্তা বের করে এনে মানুষ নিজেকে গড়ে তোলে নি। মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে মিলে মিশেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পাভলভের পরাবর্তের তত্ত্ব সেই সত্যকেই এগিয়ে নিয়ে এসেছে। দানিকেন চেষ্টা করেছেন পাঠককে সেই বস্তুগত সত্য থেকে সরিয়ে আনতে। আমরা বরঞ্চ কষ্টকল্পনা থেকে বাস্তব সত্যকেই আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করি।

পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু চেতন ও জড়পদার্থ তাদের স্বকীয় বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান করেই নিজস্ব ধর্মরক্ষা ক'রে চলেছে। পদার্থের আণবিক গঠন, সৌর জগতের পারস্পরিক নির্ভরতা, প্রাণীর 'শর্তহীন পরাবর্ত' হ'ল এমনি ধরনের ধর্মের প্রমাণ। আগুনে হাত লাগলে হাতটি সরে আসা, কুকুরকে খাদ্য দিলেই লালা ঝরা, কোন কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে জলে পড়লেই সাঁতার দিতে পারা প্রভৃতি হ'ল চেতন পদার্থের নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের ফল। মাকড়সার জাল বোনা, পাখীর বাসা বাঁধাও জটিল শর্তহীন পরাবর্ত। নিম্নতম প্রাণী, উদ্ভিদ, এ্যামিবা প্রভৃতির স্বউপযোজনের ক্ষমতা আছে। উচ্চতর প্রাণীর স্নায়বিক গঠনের জটিলতার জন্য স্বউপযোজন-সহ স্বশাসন ও স্বপরিচালনার ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে।

কুকুরের মুখে অ্যাসিড ঢেলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে মুখে লালা ঝরবে এবং অ্যাসিডের প্রতিবিধানে তা কাজ করবে। বেশী অ্যাসিড ঢাললে লালাও বেশী বের হবে। এ হ'ল শর্তহীন পরাবর্ত। প্রাকৃতিক উত্তেজনায় এমন স্বাভাবিক সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা কুকুরের জন্ম সূত্রেই পাওয়া। যে-কোন প্রজাতিরই কতকগুলি সাধারণ সংকেতে সাড়া দেবার ক্ষমতা আছে। এগুলি সহজাত। একটি বিশেষ উদ্দীপক প্রত্যেক বারই বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটায়। শারীর বৃত্তিমূলক এবং জাতি বৈশিষ্ট্য সূচক এমনি স্থায়ী প্রতিক্রিয়াগুলি হ'ল শর্তহীন পরাবর্ত।

অপরপক্ষে কুকুরকে খাদ্য দেবার সময় যদি একটি ঘণ্টা বাজান যায়—তবে দেখা যাবে খাদ্য না দিয়েও ঘণ্টা বাজালে কুকুরের মুখে খাদ্য দেবার সময় যেমন লালা ঝরত ঠিক তেমনই লালা ঝরবে। অর্থাৎ শব্দের সঙ্গে কুকুরের মস্তিষ্কের একটি পরাবর্ত গড়ে উঠল। যেহেতু একটি শব্দের শর্তসাপেক্ষে এই লালাঝরা তাই একে বলা হয় শর্তাধীন পরাবর্ত। এই পরাবর্ত সম্পূর্ণই ব্যক্তি কেন্দ্রিক। অস্থায়ী। বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্নভাবে পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত, তাই শর্তাধীন পরাবর্তও অসংখ্য। ওই পরাবর্ত প্রাণীর জীবদ্দশায় অর্জিত—সম্পূর্ণ ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য সূচক। পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের পরাবর্ত ভেঙে যায় ও নতুন পরাবর্ত গড়ে ওঠে। এইভাবে শর্তাধীন পরাবর্ত যেমন বিচিত্রমুখী তেমনি গতিশীল। প্রাণীর ব্যাপ্তী ও অগ্রসরতায় এই পরাবর্তই নিয়ত কাজ ক'রে চলে।

পরিবেশের মধ্যে দু'টি দিক আছে। বিশেষ ক'রে মানুষের ক্ষেত্রে—একটি হ'ল স্থাণু, যেমন—আকাশ, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি। এগুলি কম-বেশী একই রকম থাকে। অপরটি হল পরিবর্তনশীল, যেমন—সামাজিক অবস্থা, উৎপাদন সম্পর্ক, শ্রেণীদ্বন্দ্ব। মানুষের ক্ষেত্রে তাই শর্তাধীন পরাবর্ত অসাধারণ জটিলতা ধারণ করে।

মানুষের স্নায়ুমণ্ডল দু'ভাবে কাজ করে। স্বয়ংক্রিয় জৈবক্রিয়া ঘটায় কিছু স্নায়ুমণ্ডল যেমন হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতি। আর উচ্চমনন ক্রিয়ায় নিযুক্ত ইচ্ছা, বুদ্ধি, চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে অন্য স্নায়ুমণ্ডল। শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে ওঠে উচ্চ-মস্তিষ্ক বা সেরিব্রামে। এই উচ্চ বা গুরুমস্তিষ্কই শর্তাধীন পরাবর্ত মারফৎ বহির্বাস্তবের সামান্যতম পরিবর্তনের সঙ্গেও জীবদেহ ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাদির ক্রিয়া-কলাপের সামঞ্জস্য বিধান করে। এই কাজে মানুষের কাছে প্রথম সাংকেতিক তন্ত্র হ'ল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি স্তর আর দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্র হ'ল ভাষা। বলা বাহুল্য মানুষই একমাত্র দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্র মতো পরাবর্ত গঠন করতে

পারে। ভাষা থেকেই মানুষের চিন্তাশক্তির জন্ম এবং ভাষাই মানুষের চিন্তা-শক্তিকে এত উন্নতস্তরে পৌঁছাতে সক্ষম ক'রে তুলেছে।

কোন ব্যক্তির গায়ে ১১০° ফারেনহাইট পর্যন্ত গরম করা কয়েলের পাইপ চামড়ার গায়ে লাগিয়ে কয়েকবার ঘণ্টা বাজিয়ে ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে তাপজনিত শর্তহীন পরাবর্তকে শর্তাধীন করা যেতে পারে। অর্থাৎ তারপর কয়েলটিকে তাপ না দিয়েও ঘণ্টা বাজান হ'তেই দেখা যাবে তার ১১০° ফারেনহাইটের মতো গরমের অনুভূতি হচ্ছে। এবারে শর্তাধীন পরাবর্ত যদি ঘণ্টা বাজানোর বদলে 'ঘণ্টা বাজাই' কথটি বলার সঙ্গে গঠন করা হয় তা হ'লে দেখা যাবে 'ঘণ্টা বাজাই' কথাটি বলার সময় ১১০° ফাঃ তাপের বদলে ১৫০° ফাঃ তাপ কয়েলে সঞ্চার করালেও সে পূর্ববৎ তাপ অনুভব করছে। একই ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তিকে কিন্তু ১৫০° ফাঃ তাপ দিলে ঘণ্টা বাজাই কথাটি বললে ভীষণ গরম অনুভব করবে। স্বল্প মাত্রার হেরফেরকে কেন্দ্র করে বিকফের এই পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে মানুষের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি সবই ব্যক্তি নির্ভর। এ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করা যায়: (১) সামাজিক উদ্দীপক ভাষা ও চিন্তা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। (২) মানুষ কেবল প্রবৃত্তির দাস নয়। প্রবৃত্তিগুলিও সামাজিক কাঠামোতে এসে পরিবর্তিত হয়। (৩) মানুষের জৈবিক বৃত্তি—স্বাদ, হিংসা, যৌনবোধ প্রভৃতি কেবল সভ্যতার আবরণে পাশব বৃত্তি নয়। এগুলিও সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে।

এই সমস্ত কিছু থেকে দেখা যাচ্ছে যে পরাবর্ত হ'ল বাইরের উদ্দীপনায় স্নায়ুতন্ত্রের সাড়া দেওয়া। কখনও তা স্বাভাবিক কখনও শর্তসাপেক্ষ। বাইরের উদ্দীপক স্নায়ুতে উত্তেজনা জাগায় তাই স্নায়ু প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়। সংজ্ঞাবাহী স্নায়ুকোষ উত্তেজনাকে কেন্দ্রীয় স্নায়ু ব্যবস্থার দিকে নিয়ে যায়। আর চেস্টীয় স্নায়ু কেন্দ্র থেকে নির্দেশাবলীকে বাহিরের দিকে নিয়ে আসে। সংযোজক কোষ হ'ল এই দুই-এর সংযোগ সাধন করে।

সমগ্র স্নায়ু ব্যবস্থার কার্যপ্রণালীই পরিবেশের উপর নির্ভর করে। পরিবেশের প্রতি সাড়া দিতে গিয়েই সরল স্নায়ুতন্ত্র জটিল আকার ধারণ করেছে। কোন্ উত্তেজনার প্রকৃতি কী রকম তা যাচাই করা এবং সেই মতো কাজ করার ক্ষমতাই স্নায়ুতন্ত্রকে জটিল ক'রে তুলেছে। মস্তিষ্ক তারই সর্বোচ্চ রূপ। মস্তিষ্ক বল্কলের বিস্তার ও তার ভিতরকার নানা খাঁজের উৎপত্তি এই কাজে বিশ্লেষণী ক্ষমতার ফল। বিশ্লেষণী কেন্দ্রগুলি মস্তিষ্কের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ভাষার ব্যবহার

মস্তিষ্ককে আরো জটিল করেছে। ফলে সমগ্র ব্যাপারটিকে সহজেই অতিপ্রাকৃতের সঙ্গে যুক্ত ক'রে ফেলার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে যে মস্তিষ্ক বল্কল বিনষ্ট হ'লে শর্তাধীন পরাবর্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়। কোন বহির্জাগতিক নিয়ন্ত্রণ বা অতিপ্রাকৃত চৈতন্যের হস্তক্ষেপ এখানে কিছু নেই।

মানুষের ক্ষেত্রে শর্তাধীন পরাবর্ত হ'ল অসংখ্য পরাবর্তের এক জটিল সমন্বয়। কথা বলা ও শোনার ভিতর দিয়ে এক বিশেষ উদ্দীপকের সন্ধান মিলেছে। মানুষের ক্ষেত্রে শব্দের বিশেষ তাৎপর্যের সঙ্গে সাড়া দেবার এক গুণগত ভিন্নস্তর সৃষ্টি হয়েছে মানব মস্তিষ্কে, ভাষার ভিতর দিয়ে।

ভাষাই মানব মস্তিষ্কে চিন্তা, ভাবনা, স্মৃতি, বিশ্লেষণ, দুঃখ, শোক, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি মানুষী অনুভূতি গড়ে তোলার পথ রচনা করেছে। সমাজবদ্ধ বসবাস ভাষার প্রয়োজন ও ব্যবহারকে বিচিত্রমুখী করেছে। মুক্ত হাত ও তার দ্বারা শ্রম করবার প্রয়োজন ভাষা ও সমাজকে সমৃদ্ধ করেছে। স্নায়ু প্রক্রিয়া এই সমস্ত অনুভূতির জনক। বিশেষ ধরনের পরাবর্তের ভিতর দিয়ে বিশেষ ধরনের অনুভূতি প্রতিফলিত হয়। দূর মহাকাশের সিগন্যাল মানব মস্তিষ্ককে পরিচালনা করে না। মানব মস্তিষ্ককে পরিচালনা করে প্রকৃতি-পরিবেশ-সমাজ।

সমস্ত মানব অনুভূতিই কার্যকারণ যুক্ত, স্থানকাল নির্ভর ও মস্তিষ্কের ক্রিয়াকর্মের ফল। ভাষা তার মধ্যমণি। মানুষের পরস্পর ভাব বিনিময়ের প্রচেষ্টার ফল হ'ল ভাষা। নীচুস্তরের প্রাণীও ভাব বিনিময় করে। কিন্তু তা প্রায়ই অসম্বদ্ধ। মানুষের ভাষা হ'ল বস্তু ও ঘটনার বাস্তব ধারণা থেকে বিমূর্ত ধারণা গড়ার মাধ্যম। বিমূর্ত ধারণা থেকেই চিন্তা-ভাবনা-কল্পনা গড়া সম্ভব। একটি নির্দিষ্ট বস্তুকে নির্দিষ্ট হিসাবে নীচু স্তরের প্রাণী শনাক্ত করতে পারে না। রঙ, আকার, তাপমাত্রা, দূরত্ব প্রভৃতি বস্তুতে বস্তুতে যে পার্থক্য ঘটায় তা মানুষই উপলব্ধি করতে পারে। ভাষার মাধ্যমে এই পৃথকীকরণ সম্ভব। ভাষার মাধ্যমেই একজনের অভিজ্ঞতা অন্যজনে সঞ্চালন করা যায় এবং তাই মানুষকে এত উন্নতির সোপানে উত্তীর্ণ করেছে।

চিন্তা হ'ল অনুচ্চারিত ভাষা। ভাষা ছাড়া চিন্তা অকল্পনীয়। যৌনবোধ জৈবিক এক বৃত্তি। কিন্তু ভাষা তাকে জৈবিক বৃত্তির উলঙ্গ অবস্থান থেকে সামাজিক বৈশিষ্ট্যে উত্তরণ ঘটিয়েছে। কেবল পাশব বৃত্তি হ'লে যৌন-আকর্ষণ সুন্দর-অসুন্দরের বিবেচনা বর্জিত কেবল বিপরীত যৌন আসঙ্গের দিকেই ধেয়ে যেত। কিন্তু মানব সমাজে আজ তা একেবারেই অসম্ভব।

পশুর ক্ষেত্রে মানবসমাজের সংস্পর্শে এসে অনেক মানবীয় আচরণ করতে দেখা যায়। সেগুলি সবই ঘণ্টা বাজিয়ে শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে তোলার মতো। পশুমস্তিষ্কে যেমন শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে ওঠে, মানব মস্তিষ্কে সেই শর্তাধীন পরাবর্তই এক গুণগত রূপান্তর ঘটিয়েছে। আর সেই ক্ষেত্রে সেই ভূমিকা পালন করেছে দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্র—ভাষা।

অবশ্য এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, মানুষের ক্ষেত্রে আরো উন্নত কার্য-প্রণালী থাকাও সম্ভব।

সাংকেতিক তন্ত্র যে পরাগর্ত গড়ে তোলে তা দেহগতভাবেও পরিবর্তন ঘটায়। মানবদেহকোষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অংশ হ'ল ক্রোমসোম। ক্রোম-সোমের মুখ্য রাসায়নিক উপাদান হ'ল প্রোটিন আর নিউক্লিক অ্যাসিড। নিউক্লিক অ্যাসিড যা ক্রোমসোমের মধ্যে পাওয়া যায় তার একটি হ'ল, ডি. এন. এ. আর অপরটি আর. এন. এ.। ক্রোমসোমের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে আর. এন. এ. আছে শতকরা ১·২ থেকে ··৪ ভাগ।

পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে মস্তিষ্ক কোষে নিউরনের আর. এন. এ. প্রতিটি শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে ওঠার সময় বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটায়। পরীক্ষাধীন মস্তিষ্ক কোষের আর. এন. এ. থেকে যে প্রাণী পরীক্ষাধীন নয় তার মস্তিষ্কের আর. এন. এর বিন্যাস হয় আলাদা। এ থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে শর্তাধীন পরাবর্ত নিউরনের আর. এন. এর পরিবর্তন ঘটায়। পরাবর্ত গঠন সুতরাং মহাজাগতিক প্রাণীর পাঠান বার্তার ফল নয়।

এইভাবে দেখা যাবে দানিকেন বিজ্ঞানের সত্যকে আভাস ক'রে কার্যতঃ বিজ্ঞানকে এক কল্পনার স্বেচ্ছাচার হিসাবে তুলে ধরেছেন। নিজের ব্যর্থতা বিজ্ঞানের ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছেন। ধর্মকে বিজ্ঞানের অর্থে আর বিজ্ঞানকে ধর্মের চেহারায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। আর তা করতে গেলে মস্তিষ্কের বৈজ্ঞানিক কার্যপ্রণালীকে পাশ কাটাতেই হবে। তিনি বলেছেন 'পৃথিবীর সমস্ত ধর্মপ্রচারক আপন মতবাদ প্রচার কালে বলেছেন, যে বাণী তিনি প্রচার করছেন সে বাণী ধর্মের অনুশাসন, তাঁর নয়। তাঁর মস্তিষ্কে হঠাৎ জাগা কোন চেতনা, না হয় তার অন্তর্লীন কোন স্বর্গীয় শক্তি—দেবতা, ঈশ্বর, মহাপ্রভু তাকে দিয়ে এ কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।'৫(৩০৭) বলা বাহুল্য ধর্মপ্রচারকেরা অলৌকিকের কারবার করেন বলেই তাদের মাথা তাঁরা পরিচালনা করেন না বলে মনে করেন। এ উদাহরণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রসঙ্গে অবান্তর।

এমন অবান্তর প্রসঙ্গ দিয়ে দানিকেন বৈজ্ঞানিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির বিস্তর

চেষ্টা করেছেন। কখনও অন্যের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, 'আমাদের জ্যোতিষ মানমন্দির আছে মোটে দু'শ পনেরটা কিন্তু জৈব মানমন্দির আছে প্রায় লাখ দশেক, অবশ্য তাদের আমরা অভিহিত করি ভিন্ন নামে—বলি মন্দির, মসজিদ, গির্জা।'৪(৮০) অর্থাৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানের মান মন্দির আর মন্দির-মসজিদ-গির্জা ভিন্ন নামে একই জিনিস। আবার 'জগতের সব মগজের একটা অংশ মাত্র তার নিজের মগজ।'১(১৪০) অর্থাৎ মানুষের মাথার সঙ্গে মহাজাগতিক অন্য কোথাকার প্রাণীর মগজের ঐক্যবদ্ধতা রয়েছে। কখনও নিজেও বলেছেন, 'মোট কথায় তা হ'লে বস্তু হ'ল ঊর্ধ্বপাতনে কেলাসিত আত্মা।'৫(২২৫) এ কথার যে সঠিক কী অর্থ হ'তে পারে তা আমাদের মাথায় আসে না। আবার অন্যত্র বলেছেন, 'বস্তু যদি শক্তিরই একটা রূপ হয় তা হ'লে তা কেলাসিত আত্মাও বটে। অর্থাৎ আত্মাই শক্তি এবং শক্তিই আত্মা।'৫(২২৮) এও এক উদ্ভট বৈজ্ঞানিক কথা। বস্তু-আত্মা-শক্তি সব একাকার ক'রে বিজ্ঞানকে ভাবের রাজ্যে নিয়ে গিয়েছেন তিনি। আর এমনি সব উদ্ভট ধারণা সৃষ্টি ক'রে আবার স্পর্ধিত উক্তি করেছেন, 'ধারণাটা উদ্ভট মনে হচ্ছে? বিজ্ঞানীদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি এ প্রশ্নের জবাব দেবার ভার।'৫(২২৬)

দানিকেনের 'উদ্ভট' তত্ত্বের জবাব যোগাবে বিজ্ঞান। তবে হ্যাঁ, বিজ্ঞানী মহল ইতিমধ্যেই জবাব দিয়েছেন তাঁর উদ্ভট তত্ত্বকে পরিহার করার মধ্যে দিয়ে। কারণ সাধারণ পাঠককে বিভ্রান্ত করা গেলেও বিজ্ঞানী মহল অত সহজে বিভ্রান্ত হন না। বিজ্ঞানের সত্য মানুষের সত্য। আর দানিকেনের সত্য অতি-মানবিক।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রসঙ্গান্তর

অতীতে কোন একসময় পৃথিবীতে মহাজাগতিক প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছিল ব'লে দানিকেন যে প্রকল্প তুলে ধরেছেন তাতে তিনি প্রাসঙ্গিক ব'লে কতকগুলি বিষয়কে টেনে এনেছেন যা শেষ বিচারে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতি বিজ্ঞানের সত্য অর্থ নৈতিক শ্রেণীদ্বন্দ্ব নিরপেক্ষভাবে প্রকাশিত হয়। দানিকেনের তত্ত্ব এইসব মন্তব্যের ফলে সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। পরিণামে তাঁর তত্ত্ব বস্তুবাদী চিন্তার সরাসরি বিরুদ্ধে এবং সমাজ বিকাশের প্রগতিশীলতার মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে এই সব মন্তব্যের কোন নিবিড় যোগাযোগ না থাকায় মন্তব্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সমগ্র প্রকল্পটিকে একটি উদ্দেশ্যমূলক চরিত্র দান করেছে। নিছক প্রত্নতাত্ত্বিক সত্য ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আড়ালে চলে গিয়েছে। মূল বিষয়বস্তু থেকে এইভাবে অন্যপথে যাত্রার বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই ফুটে উঠেছে দানিকেনের এলোমেলো মন্তব্য ছুঁড়ে দেবার তাৎপর্য।

মহাকাশ থেকে কোন বুদ্ধিমান প্রাণী পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা যে চালাতেই পারে এ সম্পর্কে সাধারণ বুদ্ধিতে কোন সন্দেহ দেখা দিতে পারে না। আর সেই যোগাযোগের সূত্রে কোন অজ্ঞাত প্রাযুক্তিক জ্ঞানের অধিকারী সেই প্রাণীর এ পৃথিবীতে অতীতের কোন এক সময়ে পদার্পণ করাটাও একেবারে অসম্ভব ভাবার কোন কারণ নেই। সেই কথা বলতে গিয়ে দানিকেন অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ হিসাবে যে সব বক্তব্য এনেছেন সেগুলি আরেক ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। কতকগুলি প্রতিষ্ঠিত সুস্পষ্ট বিষয়কে ঝাপসা ক'রে দেওয়া ছাড়া পাঠকের কাছে সেই প্রসঙ্গগুলির অন্য কোন মূল্য কিছু নেই। সুপ্রতিষ্ঠিত সেইসব বিষয়গুলিকে সংক্ষেপে তুলে ধরেই কেবল দানিকেনের অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্যগুলির বিচার করা হ'ল।

এখানে দানিকেনের মন্তব্যের লক্ষ্য পাঁচটি বিষয়কে আলোচনার জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

(১) মহাকাশ অভিযানের পক্ষাবলম্বন

(২) জন্মনিয়ন্ত্রণে সালিশী।

(৩) ধর্মগুরুরূপে মার্ক্স ও লেনিন।

(৪) ফ্যাসীবাদী আর বিপ্লবী কাজের একীকরণ।

(৫) ধর্মের সেবায় বিজ্ঞানের নিয়োগ।

মহাকাশ অভিযানের পক্ষাবলম্বন

শ্রেণীবিভক্ত সমাজ অসম বিকাশের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। নানাদিকে যতোই উন্নতির পথে অগ্রসর হ'তে দেখা যাক এই শ্রেণী সমাজ থেকে কখনই অসামঞ্জস্য, বৈষম্য ও দারিদ্র্য দূর হ'তে পারে না। সুতরাং এ-সমাজে একদিকে যখন ক্ষুধা, দারিদ্র্য আর অনাহারক্লিষ্ট মানুষের আর্তনাদ অন্যদিকে তখন কোটি কোটি টাকা খরচ ক'রে কার আগে কে চাঁদে যাবে তার প্রতিযোগিতা চলে। তবে সেই চাঁদে যাবার প্রতিযোগিতা ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন না জোগালেও মানব-জ্ঞান-ভাণ্ডারকে অবশ্যই সমৃদ্ধ করে।

তাহ'লে মানুষ কী করবে? জ্ঞান-ভাণ্ডারের অন্বেষণে একদল মানুষকে নিরন্ন রেখে মহাকাশে ছুটবে, না ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে সমাজবক্ষে বিজ্ঞানের ডানা জুড়ে দেবে? দানিকেন অবশ্য শেষোক্ত লক্ষ্যেই মহাকাশ গবেষণার স্বপক্ষে মন্তব্য করেছেন—মহাকাশ গবেষণাকে একই সঙ্গে ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম হিসাবেই দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর উত্থাপিত সে প্রয়োজনীয়তাও কল্পনাশ্রয়ী!

তিনি বলেছেন, 'প্রকাণ্ড নভোযানে ক'রে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যাবে গ্রহান্তরে, উপনিবেশ স্থাপন করবে সেখানে। বসাবে গ্রাম, গড়ে তুলবে শহর, ধনধান্যে পুষ্পে ভরে তুলবে গ্রহান্তরের সে সব উপনিবেশ।.........মনপ্রাণ ঢেলে মহাকাশ গবেষণা চালানো তো এই কারণেই দরকার।'১(১১৫) বর্তমান বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে একথা বলা যায় যে মঙ্গল ছাড়া কোথাও মানুষের প্রবেশের মতো নৈসর্গিক অবস্থা নেই। আর মঙ্গল সম্পর্কে যা জানা গিয়েছে তাতে সেখানে কোন প্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। মানুষ গিয়ে গাছপালা শস্য রোপণ করলেই তা কলতে আরম্ভ করবে এমন ভাবনা গল্প উপন্যাসে চলতে পারে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা অত সহজে ভাবা সম্ভব নয়। পৃথিবীর মাটিতে বীজ পুঁতলে তা গাছে পরিণত হবার নৈসর্গিক আনুকূল্য রয়েছে। এই আনুকূল্য ছাড়া উদ্ভিদ বাঁচে না। সাহারায় বটগাছ জন্মে না। গৌরীশৃঙ্গে ধানের চারা গজান সম্ভব নয়। চাঁদের বালি প্রস্তরময় ভূমিতে চাষবাসের চিন্তা করা অসম্ভব। ভাবতে ভাল লাগলেও বিজ্ঞান কেবল ভাবনার পিছু পিছু ছুটতে পারে না। বিজ্ঞানের এক পা থাকে মাটির উপর,

অন্য পা শূন্যে তোলে নতুন আরেকটুকু মাটির সন্ধানে। মহাকাশ গবেষণা এই অর্থে প্রয়োজনীয় ব'লে দেখান অর্থ বিজ্ঞানের দুপাকেই শূন্যে তুলে দেওয়া। মজাতির যৌবন ফিরে পাওয়া নিয়ে কাহিনী হ'তে পারে। বিজ্ঞান যৌবন ফিরিয়ে দেবার অবাস্তবতা নিয়ে আশার আলো দেখাতে পারে না। বড়জোড় যৌবনকে ধরে রাখার জন্য গবেষণা চালাতে পারে। বর্তমানে মহাকাশ গবেষণায় চাঁদে সোনা ফলানোর চেষ্টা অবাস্তব। মহাকাশ গবেষণা আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে বরঞ্চ পৃথিবীতে সোনা ফলানোর চেষ্টা করতে পারে।

পৃথিবীর সম্পদের উপর দানিকেনের আস্থা কম। তিনি আশঙ্কা করেছেন, 'শক্তিরও পার্থিব উৎস অনন্ত নয়। সে কারণেও মহাকাশ পরিক্রমা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের শহরে আলো জ্বালাতে, আমাদের ঘর গরম করতে, বিদারণীয় পদার্থ আনতে যেতে হবে মঙ্গলে কিংবা অন্য কোন গ্রহে।' ১(১১৮) কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে এমন ভাবনা মানুষের পক্ষে করা প্রয়োজন হবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে এখন এরকম ভাবনা যে শখের দুর্ভাবনা তা বলতে কোন দ্বিধা নেই। নিজের দেশে হাজার হাজার বিঘা জমি অনাবাদী ফেলে রেখে বিদেশ থেকে শস্য আমদানির পরিকল্পনা আর পৃথিবীতে শক্তির উৎসের অনুসন্ধান না ক'রে মহাকাশে শক্তির সন্ধানে নিয়োজিত হওয়া প্রায় একই কথা।

কয়লা, পেট্রোল পৃথিবীতে সীমিত। অবশ্য পরিকল্পিত ভাবে ব্যয় করলে এ সম্পদ এখনও মানব জাতির অনেক দিনের শক্তির উৎস হিসাবে কাজ করতে পারে। কিন্তু বেহিসেবী প্রতি পাঁচজনে একজন একটি ক'রে মোটর গাড়ি ব্যবহার ক'রে আর সামরিক কাজে অজস্রভাবে শক্তি ক্ষয় ক'রে মহাকাশের দিকে শক্তির জন্য তাকিয়ে থেকে কোন দিন সমস্যার সমাধান হ'তে পারে না।

নদীপথে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ সৃষ্টি করা, বৃষ্টির জল জমিয়ে তাকে জলবিদ্যুতে নিয়োগ করা, সমুদ্র ঢেউ-এর শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা, সূর্যের আলোকে শক্তি হিসাবে ব্যবহার করা, আগ্নেয়গিরির তাপ ভূগর্ভ-তাপ-আণবিক-শক্তি প্রভৃতি থেকে শক্তি সংগ্রহের আয়োজন করা আজো ব্যাপক ভাবে হয় নি। পার্থিব নানা উৎস সম্পর্কে গবেষণাকে প্রসারিত না ক'রে অবিশ্বাস্য পরিমাণ অর্থব্যয়ে আকাশের দিকে শক্তির জন্য তাকিয়ে থাকার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।

'মহাকাশ গবেষণার স্বপক্ষে' দানিকেনের 'একটা বড় যুক্তি হচ্ছে এর ফলে নতুন নতুন নানা শিল্প গড়ে উঠছে। হাজার হাজার লোকের কর্ম-সংস্থান

হচ্ছে।'১(১১৭) কর্মসংস্থানের এমন অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে গেলে সামরিক উৎপাদন সংস্থাগুলোকেও তো কর্মসংস্থানের কেন্দ্র হিসাবে ধরতে হয়। তাহ'লে আর সামরিক ব্যয়কে কোটি কোটি টাকার নিষ্ফল নিয়োগ বলা হয় কেন! লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে যদি একটি সৌধ নির্মাণ করা হয় তাতে বহু কর্মী লাগে। কিন্তু সে কাজকে বলে দায়। মহাকাশ গবেষণা যতক্ষণ গ্রহান্তরে দানিকেনের শস্যদানা না ফলাবে কিংবা চাঁদের থেকে না নিয়ে আসবে ইউরেনিয়ামের সস্তা ভাণ্ডার ততক্ষণ হাজার কর্মীর কর্মসংস্থান যোগালেও সে ব্যয় মানবজাতির কাছে দায়।

রেস খেলা থেকে কর আদায় ক'রে, মানুষকে মাতাল ক'রে ট্যাক্স সংগ্রহ ক'রে, লটারি চালু ক'রে অর্থ বাড়িয়ে সরকারের আয় বৃদ্ধি দেখান যায়। কিন্তু তা সাধারণ মানুষের পকেট থেকে সরকারের পকেটে অর্থের পরিভ্রমণ হয় মাত্র, দেশের সম্পদ তাতে বাড়ে না। হাজার হাজার পুলিশ পুষে, লক্ষ লক্ষ সৈনিক রিক্রুট ক'রে চাকুরি দেওয়া যায় বটে। কিন্তু তাতে একটি দেশের বোঝাই বৃদ্ধি পায়। মহাকাশ গবেষণা হাজার লোককে চাকুরি যোগালেও সারা পৃথিবীতে তার ব্যয় মানবজাতির দারিদ্র্যের প্রতি বিদ্রূপ ছাড়া কিছু নয়।

পার্থিব সম্পদ অনুসন্ধানে ও বিজ্ঞানের অনেক প্রশ্নের সমাধানে সাহায্য করার মধ্যে মহাকাশ গবেষণার কিছুটা স্বার্থকতা থাকা সম্ভব। কিন্তু নানা দেশের লুণ্ঠনের ধনে কোন দেশের আধিপত্যবাদী চরিত্রের দর্প প্রকাশ করতে মহাকাশ গবেষণা চালান ভবিষ্যৎ মানব বংশধরের কাছে অপরাধ স্বরূপ।

দানিকেন যেভাবে মহাকাশ গবেষণার স্বপক্ষে যুক্ত হাজির করেছেন এবং নানা উদাহরণ তুলে ধরেছেন তাতে সেই অপরাধের স্বরূপকে চুনবালি দিয়ে ঢাকবার চেষ্টার কথাই মনে পড়িয়ে দেয়।

তিনি মহাকাশ গবেষণার কর্মকাণ্ড দেখে বিহ্বল হয়েছেন। তার চেয়েও মারাত্মক কথা, তিনি সমস্ত পাঠককেও বিহ্বল করতে চেয়েছেন। আমেরিকার গবেষণা ক্ষেত্র 'নাসা'র কর্মকাণ্ডের চিত্র বারবার তুলে ধরেছেন। তাঁর তত্ত্বের সঙ্গে এই বর্ণনায় যে কী এমন যোগাযোগ থাকতে পারে তা বোঝা দুষ্কর। তবু সযত্নে নাসার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন, 'এত সব কি শুধু গোটা কতক লোকের চাঁদে যাবার খেয়াল চরিতার্থ করবার মানসে? আগেই যথেষ্ট বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ দিয়ে বলেছি, মহাকাশ গবেষণার কাছে আমরা কত ঋণী।'১(১২০) অবশ্য দানিকেন ঠিক কার কাছে কী অর্থে কতটা ঋণী তার বিস্তৃত ব্যাখ্যার মধ্যে না যাওয়াই ভাল।

ঋণী তিনি একাই নন। গোটা মানবজাতির ঘাড়েই এই ঋণ চাপিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'এই মহাকাশ গবেষণার অগ্রগতিই তৃতীয় মহাযুদ্ধের হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে।'১(১১৬) দানিকেনের অদ্ভুত তত্ত্ব আমাদের নতুন কথা শোনাল। তৃতীয় আরেকটি যুদ্ধ যে হবেই না, এমন কথা কোন রাজনীতিবিদ তো বলতেই পারেন না কোন জ্যোতিষিও বলেছেন বলে শোনা যায় নি। আণবিক যুদ্ধের ভীতিই যদি বৃহৎ শক্তিবর্গকে যুদ্ধ থেকে সাময়িক ভাবে সরিয়ে রেখেও থাকে তবে তার সঙ্গে মহাকাশ গবেষণার সম্পর্ক কোথায়? সাম্রাজ্যবাদী দেশ যুদ্ধ করে তাদের বাজার ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য। মহাকাশ গবেষণা যদি তাদের মনে কোন মহান ভাবের উদয় ঘটিয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত ক'রে থাকে তবে তার খবর পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষদের কাছে নেই। যুদ্ধ যাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের সঙ্গে জড়িত তাদের আণবিক যুদ্ধের ভীতিও সংযত রাখতে পারে না।

আণবিক বোমা যখন কোন অঞ্চলের প্রাণী ও সম্পদকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে তখন বিভিন্ন যুদ্ধবাজ দেশ 'নিউট্রনবোমা' তৈরির গবেষণায় মত্ত। এই বোমা কেবল একটি অঞ্চলের প্রাণীদের মেরে ফেলবে এবং তার প্রভাবও হবে সাময়িক। ফলে নীরবে হত্যাকাণ্ডের পর সাম্রাজ্যবাদী দানবেরা সেখানে প্রবেশ ক'রে অনায়াসে সম্পদ ও ভূমি গ্রাস ক'রে ফেলতে পারবে। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়, মহাকাশ গবেষণা কি এ থেকেও বিরত রাখতে পারবে?

পৃথিবী জুড়ে ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াই যখন সামাজিক মর্মবস্তু থেকে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে, সাম্রাজ্যবাদের দানবীয় হুঙ্কার যখন প্রতিটি ক্ষুদ্রাকার বিদ্রোহের কাছেও নতি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে তখন যুদ্ধের বিরুদ্ধে মহাকাশ গবেষণার ব্যবস্থাপত্র অনেক সন্দেহের উদ্রেক ঘটায়। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে যে কেবল নিপীড়িত মানুষের বিপ্লবী লড়াই দিয়েই রোধ করা সম্ভব এই সত্যকে আক্রমণ করেই কি তবে দানিকেন মরিয়া হয়ে বলেছেন, 'মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা, সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত বিজ্ঞান যদি মহাকাশ গবেষণায় নিযুক্ত হয় তো বোঝা যাবে পৃথিবীর যুদ্ধ বিগ্রহ কত অবাস্তব, কত অপ্রয়োজনীয়।'১(১০১) মানব সমাজের সামনে তাঁর মতে আর কোন কাজ নেই। সমস্ত কিছুকেই মহাকাশ গবেষণায় নিযুক্ত করতে হবে। যুদ্ধকে অপ্রয়োজনীয় ক'রে তোলার এমন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা সত্যিই স্তম্ভিত করবার মতো। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় ধান ভানতে লেখক দানিকেন হঠাৎ এই রকম শিবের গীত ধরলেন কেন?

দেশে দেশে শোষণ-ভিত্তিক সমাজে দারিদ্র্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে অতীত থেকে অনেকেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। প্রাচুর্যের মধ্যে দারিদ্র্যের কারণ, আর মনুষ্য সৃষ্ট কৃত্রিম অভাবকে সমাজের শ্রেণী সম্পর্কের মধ্যে খুঁজে পাবার পরও জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্যাভাবের তত্ত্বকে বার বার সম্মুখে নিয়ে আসা হয়েছে। দানিকেন প্রাসঙ্গিকতা সৃষ্টি ক'রে সেই কথাই পুনরুচ্চারণ করতে চেয়েছেন।

আমেরিকার গবেষকের মুখনিঃসৃত উক্তিকে ঢাকঢোল পিটিয়ে সামনে আনা হয়েছে, 'আমাদের ভবিষ্যৎ কী ভয়ঙ্কর?.........মানুষের সংখ্যা বাড়ছে প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায়। মানুষের বন্যায় ডুবতে বসেছে পৃথিবী। সকলকারই আহার চাই, পরিধেয় চাই, চাই মাথা খোঁজার ঠাঁই। সকলেই সৃষ্টি ক'রে চলেছে মল এবং আবর্জনা, বৃদ্ধি ক'রে চলেছে নাইট্রোজেন।.........কর্কট-রোগের আবের মতো পৃথিবীর বুকে গজিয়ে উঠেছে শহরের পর শহর, গড়ে উঠেছে জনপদ।'৩(১৭২) দানিকেনের বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের মধ্যে হঠাৎ মার্কিনী প্রচারের কণ্ঠ কেবল মতামতই ব্যক্ত করে নাই, মনুষ্য জনপদকে 'কর্কট রোগের' সঙ্গে তুলনা করেছে। এটা তাদের পক্ষেই বলা সম্ভব যাদের দেশে অসংখ্য মানুষকে নিঃস্ব ক'রে কোটিপতির সংখ্যা দমকে দমকে বেড়ে চলেছে: ১৯৪৪ সনে আমেরিকার কোটিপতির সংখ্যা ছিল ১৩,২৯৭ জন, ১৯৫৩তে তা হয়েছে ২৭,৫০২ জন এবং ১৯৬৪তে বেড়ে তিনগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৮০,০০০ জন। এই সুখের সংসারের পাশে সাধারণ মানুষের জনপদ কর্কটরোগ বীজাণুর মতো মনে হওয়া অসম্ভব নয়।

কিন্তু দানিকেন, মহাকাশ বিজ্ঞানী এ সব কথা তুলে ধরছেন কেন? তিনি কি কেবল গ্রহান্তরের দূতকেই অনুসন্ধান করছেন? এটা কি নিছক প্রকৃতি বিজ্ঞানের গবেষণার শ্রেণী নিরপেক্ষ চরিত্রের নমুনা? তাই যদি হবে তবে দানিকেন জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে হঠাৎ ওকালতি করতে নামলেন কেন? পৃথিবীর মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্য তাঁর পরামর্শ, 'মাত্র একটি সমাধান এর আছে, তা হ'ল এই মুহূর্ত থেকেই জন্মনিয়ন্ত্রণ শুরু করা। বড় ছোট নানা ধর্মের গুরুরা এর বিরোধিতা করেন। সব সম্প্রদায়ের লোকই ভাবেন যতো ছেলে ততো সুখ ততো জোর। অনেক ছেলের সঙ্গে অনেক দুঃখও যে আসে। সে দুঃখ ঈশ্বরেচ্ছায় সংঘটিত হয় জেনেও মানুষ আরো ছেলে চায়।' জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, তবে কি গফুরের এক মেয়ে হ'লে, মদন তাঁতীর একটি ছেলে

হ'লে, কিংবা হরিপদ কেরানী নিঃসন্তান হলেই তাদের জীবনে দুঃখ ঘুচবে, দারিদ্র্য দূর হবে? এমন যে হতে পারে না তা ধনীর সন্তান-সন্ততির কলরব মুখরিত প্রাসাদের গায়ে নিঃসন্তান, স্বল্প সন্তান আর অধিক সন্তান সম্পন্ন মুমূর্ষু মানুষদের বস্তীর পাশাপাশি অবস্থান দেখলেই বোঝা যায়।

দানিকেন সন্তানের জন্মদানকে বলেছেন, 'এ পাপ! এ পাপ সমস্ত মানুষদের বিরুদ্ধে, যে মানুষ ঈশ্বরের আপন মূর্তিতে গড়া তারই বিরুদ্ধে।'৩(১৭৩) এর অর্থ শোষিত মানুষের জীবনের দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনার কারণ তাদেরই সন্তান উৎপাদন। তা হ'ল তাদেরই পাপের ফল। পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্ট-দারিদ্র্য অনাহার তো আজকের 'জনসংখ্যা বিস্ফোরণের' কালের ঘটনা নয়। এ তো মানব সমাজের বাল্যকাল থেকেই। একসময় আদিম অবস্থায় মানুষ উৎপাদনের উৎস খুঁজে বের করতে পারেনি। তাই অভাব ছিল সে সমাজে। তারপর থেকে উৎপাদনের উৎস মানুষের সামনে উন্মুক্ত হয়েছে কৃষি ও শিল্প বিকাশের মধ্যে দিয়ে। সেই স্বল্প জনসংখ্যা আর বিপুলা পৃথিবী তো বহুদিনই একসঙ্গে বসবাস করেছে। অভাব কি সেদিনও ছিল না? প্রাচুর্য কি সেদিনও অভাবের পাশে নির্লজ্জ অবস্থান করে নেয় নি? সেদিন তবে দারিদ্র্য আর ক্ষুধা সমাজে স্থান পেয়েছিল কেন?

আজ তো উন্নত বিজ্ঞান মানুষের সামনে প্রাচুর্যের থালা সাজিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শ্রম লাঘব করতে এসেছে যন্ত্র। সম্পদ সৃষ্টির বহুমুখী উৎসগুলি আজ উন্মুক্ত। মানুষ ক্রমাগত জয় করে চলেছে প্রকৃতিকে। অথচ এই শ্রেণি-বিভক্ত সমাজে অভাব-অনটন-উপবাস আজ নিত্যসঙ্গী। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ কবে মানব সমাজকে বিপদের মুখে নিয়ে আসবে তার চেয়ে বড় প্রশ্ন হল, এখন মানব সমাজের সামনে বিপদটা কী?

এখনকার বিপদটাকে ঢাকতেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির তত্ত্ব। নানাদেশে নানা সময়ে বারবার এ তত্ত্ব সামনে এসেছে। এই তত্ত্বের নায়ক মালথাস কতবড় মানববিদ্বেষী—শ্রমিক-বিদ্বেষী তো বটেই—ছিলেন তা তাঁর নিজস্ব উক্তি থেকেই বোঝা যায়। জোর ক'রে সেই তত্ত্বকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেও যখন সম্ভব হয় নি তখন দানিকেন আবার মহাকাশ অভিযান—গ্রহান্তরের প্রাণী প্রভৃতি নানা কিছুর চোখ ধাঁধান বিষয়ের মধ্যে দিয়ে তাকে তুলে ধরতে চাইছেন।

মালথাস বলেছিলেন, 'আমাদের কাজ হ'ল প্রকৃতির এই মৃত্যু দানের কাজটাকে সাহায্য করা।...যদি আমরা বার বার ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ না দেখতে চাই তা হ'লে আমাদের উচিত হবে অন্য ধরনের ধ্বংসকে উৎসাহ দেওয়া।

…গরিবদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে দেবার বদলে তারা যাতে এর বিপরীত অভ্যাস রপ্ত করে সেদিকে চেষ্টা করা দরকার। আমাদের উচিত শহরগুলোর রাস্তা আরো সঙ্কীর্ণ করা, ঘরগুলোর আয়তন আরো কমান যাতে লোকে গাদাগাদি করে থাকতে বাধ্য হয়। আর প্লেগকে ফিরিয়ে আনার সব ব্যবস্থা করা দরকার। গ্রামাঞ্চলে যে দিকে দরিদ্র কৃষকেরা থাকে আমাদের উচিত পচা জমে থাকা জলাশয়ের দিকে তাদের বসতীর জন্য উৎসাহ দেয়া। সর্বোপরি যা আমাদের করা উচিত তা হ'ল, সব চাইতে শক্তিশালী ও ধ্বংসাত্মক রোগগুলোর প্রতিশেধক ওষুধপত্রগুলোর ব্যবহার না হতে দেওয়া।' কথাগুলো আজ অবিশ্বাস্য মনে হ'তে পারে। কারণ শোষক শ্রেণী আজ আর এত স্পষ্ট ক'রে তাদের ঝোলা থেকে কথাগুলো বের করে বলে না। কিন্তু সেদিন মালথাসের প্রস্তাব মতো গণতন্ত্রের বুনিয়াদী পিঠস্থান বৃটিশ পার্লামেণ্টে গৃহীত হয়েছিল 'পুওর ল অ্যামেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্ট।' এর সাহায্যে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের তরফ থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে দেওয়া সমস্ত সুযোগ সুবিধা বাতিল করে প্রতিষ্ঠিত করা হয় কুখ্যাত 'ওয়ার্ক হাউস।'

মালথাসপন্থীরা সেদিন জানত না যে শ্রমিক শ্রেণী চিরকাল মরবার জন্য জন্মায় নি। স্বয়ং মালথাসের গরিব সম্পর্কে উক্তি, 'প্রকৃতির বিশাল ভোজ সভায় তার জন্য কোন আসনই শূন্য পড়ে নেই। প্রকৃতি তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতেই বলছে, আর সেই আদেশটাকে কাজে পরিণত করতে সে বিলম্বও করে না।' এই কথাকে পদদলিত করে দুনিয়ার প্রথম শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় সোভিয়েট রাশিয়ায়। পৃথিবীতে শোষক শ্রেণীর বিদায়কে ত্বরান্বিত করতে একে একে চীন, কোরিয়া, আলবেনিয়া, রুমানিয়া, ভিয়েৎনাম, কম্পুচিয়া প্রভৃতি দেশে দেশে গরিব শোষিত মানুষ বাঁচার দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে।

মালথাস পন্থী উইলিয়াম ভগ্‌ট-এর, 'চীনে একটা বড় রকমের দুর্ভিক্ষ বাঞ্ছনীয়ই নয় মানব জাতির স্বার্থে অপরিহার্যও বটে' এই দম্ভ উক্তিকে প্রহসনে পরিণত করে সমাজতান্ত্রিক চীন দেশ থেকে বেকারী-বেশ্যাবৃত্তি-ভিক্ষা-বৃত্তিকে বিদায় করেছে যা এ পর্যন্ত হাজার বছরের কোন শ্রেণী সমাজ কল্পনাই করতে পারে নি। কিংসলে ডেভিড-এর 'পারমাণবিক অস্ত্র ও জীবাণু অস্ত্র দুটোই নির্বিচারে ব্যবহার করা হোক' বলে উক্ত জহ্লাদের ইচ্ছা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দৈত্যের মতো বিশাল হয়েও পূরণ করতে পারছে না।

সরাসরি মালথাসীয় মানবতার শত্রুরা আজ ভিন্নভাবে সেই একই মনোভাব ব্যক্ত করে চলেছে। বিজ্ঞানী দানিকেন সে দলের না হয়েও কেমন অক্লেশে

বলে গেলেন, 'কোটি কোটি ক্ষুধার্ত মানুষকে মৃত্যুর দরজায় ঠেলে দেওয়ায় চেয়ে নতুন করে জন্মদান না করা নিশ্চয়ই যুক্তি সঙ্গত।'১(১১৫)

জন্মের সঙ্গে ক্ষুধার তুলনা করতে গিয়ে স্বয়ং মালথাস দেখাতে চেয়েছিলেন যে খাদ্যের উৎপাদন যখন বৃদ্ধি পায় গাণিতিক প্রগতিতে লোকসংখ্যা তখন বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক প্রগতি অনুসারে। অর্থাৎ খাদ্যোৎপাদন যদি ২—৪—৬—৮ এই গতিতে বৃদ্ধি পায় তবে লোকসংখ্যা তার পাশাপাশি বাড়বে ২—৪—৮—১৬ এই গতিতে। সুতরাং খাদ্যাভাব অনিবার্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন দেশের ক্ষেত্রেই এই পরিসংখ্যান দিয়ে তা প্রমাণ করা যায় নি। এমন কি কোন অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রেও না। ১৯০০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১৯ ভাগ। খাদ্যবস্তু ও কাঁচামালের জোগান বেড়েছে শতকরা ৩০ ভাগ। শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১৮৯ ভাগ।

হিসাব করে দেখা গেছে ১৮৫০ সালে ৪ জন কৃষক ৫ জনের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করতে পারত। ১৯৪০ সালে প্রায় এক শত বছরে একজন কৃষকের উৎপাদন বেড়ে যা দাঁড়িয়েছে তা দিয়ে ১০ জনের খাওয়ার সংস্থান হ'তে পারে। আরও ৩০ বছর পরে একজন কৃষক যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করতে পারবে তা দিয়ে ২৪ জনের প্রয়োজন মিটবে।

ব্রাজিলের জোসুয়া ডি কাস্ত্রোর বই 'দি ব্ল্যাক বুক অফ্ হাঙ্গার' এবং 'দি জিও-গ্রাফি অফ্ হাঙ্গার' নামক বই-এ এই সম্পর্কে অনেক কিছু বক্তব্য আছে। তিনি ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত জাতিপুঞ্জের এফ. এ. ওর সভাপতি ছিলেন। তিনি সেই বই-এ বলেছেন, 'সত্য কথা বলতে কি উপনিবেশবাদের অমানবিক অর্থ নৈতিক শোষণ পদ্ধতিই ছিল চীনের অর্থনৈতিক বিশৃংখলা ও ক্ষুধার মূল কারণ যা বিপ্লবের পূর্ববর্তী কালে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে চীনের বুকে রাজত্ব করেছে। ...অতীতে চীনের শিশুদের মধ্যে স্থায়ী ক্ষুধার লক্ষণগুলো যেমন রোগা, অপুষ্ট শরীর, চোখমুখের অসুখ, চামড়া মোটা হয়ে যাওয়া, মাড়ি থেকে রক্ত পড়া, হাড়ের বিকৃতি ইত্যাদি এত বেশী ক'রে চোখে পড়ত যে এগুলো একটা জাতিগত বৈশিষ্ট্য বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না।' কিন্তু এই অবস্থাতেও চীনে 'অপরিহার্য দুর্ভিক্ষ' এসে মানবজাতিকে বাঁচায় নি। মানবজাতিকে পথ দেখাতে ১৯৪৯ সনে চীনে ঘটেছিল অপরিহার্য বিপ্লব।

লেখক ডি কাস্ত্রোর আরো বলেছেন, '১৯৪৯ সনে চীনে খাদ্যশস্য উৎপাদনের মাত্রা ভীষণভাবে কমে গিয়েছিল। দাঁড়িয়েছিল ১১ কোটি টনে। জাপ-বিরোধী যুদ্ধের আগে এর পরিমাণ ছিল ১৫ কোটি টন।...নতুন সরকারের

প্রবর্তিত কৃষি ব্যবস্থায় ও উৎপাদন পদ্ধতির এক আমূল সংস্কার করে উৎপাদন মাত্রাকে দ্রুত বাড়িয়ে তুলেছে। ১৯৫২ সনে খাদ্য শস্য উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬·৩ কোটি টনে। ১৯৫৬ সনে হয় ১৮ কোটি টন। ১৯৫৭ সালে হয় ২০ কোটি টন। অর্থাৎ মাত্র ৭ বছরে চীন তার উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়ে তোলে। এই কয় বছরে চীনে গড় উৎপাদনের হার ছিল প্রতি বছর শতকরা ৮ ভাগ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোর কাছে এটা ছিল এক বিস্ময়। তারা সমস্ত চেষ্টা করেও উৎপাদন বৃদ্ধির হার শতকরা ৩ ভাগের বেশী করতে পারে নি।' বর্তমানের ৮০ কোটি জনসংখ্যা নিয়ে চীনে খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ক্রমাগত জ্যামিতিক আর গাণিতিক প্রগতির অনুপাতে যে পিছিয়ে পড়ছে না তা এ সব কথা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না।

কাস্ত্রোর বলেছেন, 'চীনের এখন সাধারণ খাদ্যের শতকরা ৬০ ভাগ হ'ল নরম শস্য; যেমন চাল গম ইত্যাদি বাকি ৪০ ভাগ হ'ল শক্ত শস্য। আগে শাকসব্জি শুধুমাত্র পেঁয়াজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন নিত্য-ব্যবহার্য শাক-সব্জির মধ্যে রয়েছে বিশ রকম তরকারি।...দৈনিক খাবারের মধ্যে এখন শুয়োরের মাংস ও ডিম স্থান করে নিতে শুরু করেছে।' এ কথা ১৫ বছর আগের। তখনই তিনি বলেছেন, 'দুটো মূল উৎপাদনের ক্ষেত্রে চীন ১৯৫৮ সালেই আমেরিকাকে পেছনে ফেলে চলে গেছে। এই দুটো হ'ল গম আর তুলো। ঐ সালে চীনের গম ও তুলো উৎপাদনের মাত্রা ছিল যথাক্রমে ৪ কোটি টন ও ৩৫ লক্ষ টন। এর বিপরীতে আমেরিকার উৎপাদনের মাত্রা ছিল যথাক্রমে ৩·৭ কোটি টন ও ২৬ লক্ষ টন। এখানে মনে রাখা দরকার যে গমই হ'ল আমেরিকার প্রধান শস্য। চীনের প্রধান শস্য হ'ল চাল। আর চীনই যে বর্তমান দুনিয়ার বৃহত্তম চাল উৎপাদক দেশ এটা এখন কোন নতুন খবর নয়।' পৃথিবীর বৃহত্তম জনগণের বাসস্থান চীনের এই সব ঘটনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কারণ কি? জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে এর কারণ হিসাবে দেখান সম্পূর্ণভাবেই উদ্দেশ্যমূলক।

দানিকেনের ভাষায় দারিদ্র্যের 'একটি মাত্র সমাধান জন্মনিয়ন্ত্রণ' যে বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব নয় তা বিস্তৃত বলার অপেক্ষা রাখে না। সারা পৃথিবীর বিচারে তো সর্বত্র জন্মনিয়ন্ত্রণ কাম্যও নয়। বিশ্ব-ব্যাঙ্কের গর্ভনরদের কাছে সভাপতি হিসাবে প্রথম বক্তৃতায় ম্যাকনামারা বলেছিলেন, '...কোন কোন দেশে অধিক জনসংখ্যার প্রয়োজন আছে। আর তা প্রয়োজন তাদের জমি ভরে তোলার জন্য, যার অন্য অর্থ অর্থনৈতিক বৃদ্ধি।'

বিশ্বজুড়ে ক্ষুধা তাই জনসংখ্যাজনিত সমস্যা নয়। এ সমস্যা হ'ল সমাজ ব্যবস্থার—শ্রেণিব্যবস্থার পরিণাম। গানার মিরডাল তার 'চ্যালেঞ্জ অফ্ পভার্টি' (!) গ্রন্থে বলেছেন যে, অনুন্নত অনেক দেশই তাদের দেশের প্রোটিন খাদ্যকে ক্রমাগত উন্নত দেশগুলিতে রপ্তানী করে চলেছে। এ কাজ যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি করছে তা তো পরোপকার করবার জন্য নয়। এর কারণ সেই সমস্ত দেশে সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ-হস্তক্ষেপ ও লুণ্ঠন।

পৃথিবী জুড়ে ক্ষুধার কারণ দেশে দেশে শোষকশ্রেণী আর বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদ।

আমেরিকা সহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশ কেবল দ্রব্যমূল্য যাতে হ্রাস না পায় তার জন্যই হাজার হাজার টন খাদ্য শস্য নষ্ট করেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে। সেই একই ধারাপথে ১৯৪৯-৫৪ সনে দ্রব্যমূল্য পড়ে না যাবার স্বার্থে আমেরিকাতে একটি সংস্থা ১৪ কোটি ডিম নষ্ট করে, কৃষি মন্ত্রণালয় ১৩·৬০ লক্ষ টন আলু নষ্ট করার সুপারিশ করে, গম ও ভুট্টার চাষ ১৭ থেকে ২০ ভাগ কমাতে বলে। ১৯৭৪-এ আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াও অনুরূপ ভাবে গমের চাষ কমিয়ে দেয়।

একদিকে বিশ্বশ্রেণীভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থা পৃথিবীর অফুরন্ত শস্য ও সম্পদকে পরিকল্পিত ভাবে মানবহিতে নিয়োগ করতে পারছে না; অপরদিকে বৃহৎ শক্তিগুলিও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশ, দরিদ্র দেশগুলির উপর চালাচ্ছে শোষণ। তাই আমেরিকাতে ১০টি কর্পোরেশনের বাৎসরিক মুনাফা যখন ৭০২০ কোটি ডলার ভারতের সমস্ত জনসাধারণের দুই বৎসরের পুরো আয় হয় সেই পরিমাণ। পশ্চিম ইয়োরোপ যে পরিমাণ সার ব্যবহার করে তা গোটা আফ্রিকায় (দুই একটি উপনিবেশ বাদ দিলে) ব্যবহৃত মোট সারের পরিমাণের ২১ গুণ। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি সারা বিশ্বের জনসংখ্যার ২৫—৩০ ভাগ হয়েও বিশ্বের মোট সারের শতকরা ৮৫ ভাগ ব্যবহার করে। হিসাব করে দেখা গিয়েছে বর্তমানে পৃথিবীর চাষযোগ্য জমির পরিমাণ অন্ততঃ দ্বিগুণ করা যায় আর তা করতে বনজ সম্পদ কাটাবার কোন প্রয়োজন নেই। আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কিছু অংশের জমি উদ্ধার করলেই বর্তমানের চাষযোগ্য ১৪০০ মিলিয়ন হেক্টর জমি থেকে পৃথিবীর চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ২১০০ মিলিয়ন হেক্টরে পরিণত করা যায়। একদিকে তাই যখন দেখা যায় প্রাচুর্যের পাহাড় অন্যদিকে তখন অতলস্পর্শী দারিদ্র্য।

এই সমস্ত কিছু লক্ষ্য করেই অনেকেই দারিদ্র্যের কারণ হিসাবে জনসংখ্যা

অথবা খাদ্যের উৎসের অভাবকে মনে করেন না। দারিদ্র্যকে শ্রেণী-সমাজ ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণাম বলে মনে করেন। 'ইকনমিকস্ এ্যাণ্ড দি ক্রাইসিস অফ্ ইকলজি' নামক গ্রন্থে নরিন্দর সিং বিস্তৃতভাবে দেখিয়েছেন কীভাবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাই মুনাফাকে একমাত্র লক্ষ্য করবার দরুন উৎপাদন কমিয়ে আনে।

আমেরিকান লেখক বি ক্রস্ ব্রিগস্ স্পানে ১৯৭৫ সনের নভেম্বরে এক প্রবন্ধে বলেন যে পৃথিবীতে কৃষি-উপযোগী যথেষ্ট জমি আছে। তাতে বর্তমান কৃষি যন্ত্রপাতী দিয়েই অন্ততঃ ৩০ বিলিয়ন লোকের আমেরিকান মানে খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব। পৃথিবীর বর্তমান লোক সংখ্যা ৪ বিলিয়নের কম।

১৯৭২ 'এ ইকনমিক্স সায়েন্টিস্ট এ্যাণ্ড এনভায়রনমেণ্টাল ক্যাটাস্ট্রপি' নামে এক লেখায় উইলফ্রেড বেকারম্যান উল্লেখ করেন যে পৃথিবীর উপরের স্তরের অর্ধ-ক্রোসের ভিতর পৃথিবীতে বর্তমানে জানা খনিজ সম্পদের ১০ লক্ষ গুণ বেশী সম্পদ রয়েছে। সুতরাং বর্তমানে ব্যবহৃত সম্পদে যদি আগামী একশত বছর চলে তবে মোট সম্পদে তার ১০ লক্ষ গুণ শতাব্দী চলতে কোন অসুবিধা নেই।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। গ্রহান্তরের মানুষ খুঁজতে গিয়ে দানিকেন দাঁড়িয়েছেন শোষণভিত্তিক সমাজকে আড়াল করে রাখার জন্য নিয়োজিত চাটুকারদের পাশে। তাই তিনি অভাবের কারণ হিসাবে দেখেছেন জনসংখ্যাকে আর সমাধানের জন্য হাতড়ে বেড়াচ্ছেন অন্তরীক্ষ।

জনসংখ্যা দিয়ে তিনি সমস্যার গভীরতা বোঝাতে বলেছেন, 'আগামী কয়েক শতাব্দীর ভেতরেই পৃথিবীর লোক সংখ্যা যাবে অসম্ভব বেড়ে। পরিসংখ্যানক বলেন, ২০৫০ সালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা দাঁড়াবে ৮৭০ কোটিতে। আর বড়-জোর দুশ বছর পরে সেই সংখ্যা উঠবে ৫০,০০০ কোটিতে। তার মানে ৩৩৫ জন মানুষকে মাথা গোঁজবার জন্য ঠাঁই করে নিতে হবে একবর্গ কিলোমিটার জমিতে। ব্যাপারটা একটু তলিয়ে বুঝুন।'

পাঠকের কাছে আমাদের কথাটিও তাই সমগ্র ব্যাপারটাই 'একটু তলিয়ে বুঝুন'—পরিবার পরিপরিকল্পনার আসল কাজ পিল খাওয়ান আর নির্বীজ করন না ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তির চেষ্টা। খাদ্যাভাবের আসল কারণ জনসংখ্যাবৃদ্ধি না শ্রেণীসমাজ ও শ্রেণীবৈষম্যের অবস্থিতি আর সমাধান জন্মনিয়ন্ত্রণে না সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনে ?

ধর্মগুরুরূপে মার্ক্স ও লেনিন :

কার্ল মার্ক্স ও লেনিন অনেকের কাছেই তিরস্কৃত হয়েছেন। নানা ভাবে আক্রান্তও হয়েছেন অনেকের হাতে। এখনও তারা সমালোচনার মুখে পৃথিবীর নানা জায়গায়। যতোদিন এই শ্রেণীসমাজ থাকবে ততোদিন তো বটেই, এমনকি সমাজতান্ত্রিক বিরাট পর্ব জুড়েও শ্রেণীচিন্তায় অবশেষ মার্ক্স-লেনিনের বিরোধিতা করার চেষ্টা করবে বারবার। কিন্তু এই সমস্ত প্রচেষ্টায় মার্ক্স ও লেনিনকে আজ পর্যন্ত কেউ ধর্মগুরু বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই যা দানিকেন করেছেন। দানিকেনের ছুঁড়ে দেওয়া এই জাতীয় কথা শেষ পর্যন্ত যে চরিত্র ধারণ করেছে তাতে মার্ক্স ও লেনিনকে ধর্মগুরু হিসাবে দেখানোর চেষ্টাকে বিচ্ছিন্ন বলে গ্রহণ করা কঠিন।

পাঠককে বিভ্রান্ত করতে দানিকেনের অসংখ্য মন্তব্যের মধ্যে মার্ক্স-লেনিনকে টেনে আনা অহেতুক ভাববার কোন কারণ নেই। তিনি ভবিষ্যতের মানুষের সমস্যার কথা বলতে গিয়েছেন, '৭০০০ খৃষ্টাব্দে অনুবাদকের কাজ খুব সহজ হবে না। নানা বই থেকে টুকরো টুকরো ভাবে বিংশ শতাব্দীর বিশ্বযুদ্ধের কথা যা পড়বে তা তাদের বিশ্বাসযোগ্য হবে না। কিন্তু যখন পড়বে মার্ক্স আর লেনিনের বক্তৃতা তখন হয়তো খুঁজে পাবে এ ধারণাতীত যুগের দুজন ধর্মগুরুকে।'১(৭৯) মার্ক্স ও লেনিন কি ধর্মগুরু? নিশ্চয়ই নন। তবে তাঁদের ধর্মগুরু বলা হ'ল কেন? দানিকেনের তত্ত্বের মধ্যেই বা কি এমন প্রয়োজন পড়ল মার্ক্স আর লেনিনকে ধরে টানাটানি করবার! এই মন্তব্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সরাসরি কিছু বলা না গেলেও দানিকেনের লেখার অসঙ্গতি এবং অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্যগুলির সাথে মার্ক্স-লেনিনকে ধর্মগুরু হিসাবে দেখানোর একটা প্রচ্ছন্ন যোগাযোগের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় বৈকি! মার্ক্স-লেনিন কী বলেছেন সেই সম্পর্কে আলোচনা করলেই পাঠকের পক্ষে বোঝা কঠিন হবে না যে বিজ্ঞানের আলোচনাতেও তাঁরা কেন এসে পড়েন এবং কেনই বা বিভিন্ন সময়ে নানা জনের দ্বারা তাঁরা যা নন তাই বলে চিহ্নিত হন।

মার্ক্সীয় তত্ত্বকে খুব সংক্ষেপে সাধারণভাবে ধারণার মধ্যে আনতে গেলে তিনটি দিক থেকে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এক : পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিশ্লেষণ, যা থেকে ধরা পড়ে প্রাচুর্যের মধ্যে দারিদ্র্যের কারণ। দুই : ইতিহাসকে অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সমন্বিত করে দেখা। যেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে সমাজবিকাশের বৈজ্ঞানিক ধারা। তিন : দার্শনিক চিন্তা ও পদ্ধতি, সঠিক চিন্তা গড়ে তুলতে যা অনুসরণীয়।

পুঁজিবাদ: যে সমাজে পুঁজিই সামাজিক সম্পর্ক গ'ড়ে তোলায় ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নেয় এবং পুঁজি সঞ্চয়নের লক্ষ্যে সমাজের সব কিছুকেই পণ্যে পরিণত করা হয় তাকে সহজ কথায় পুঁজিবাদী সমাজ বলা যায়। কার্ল মার্ক্স এই সমাজকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন তার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের স্বরূপ আর অনিবার্য পরিবর্তনের আবশ্যকতাকে। মানবসমাজের অগ্রগতির জন্য এই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করবার কথাও তিনি তুলে ধরেন। পুঁজিবাদের ধ্বংসের ভিতর দিয়েই নতুন সমাজ সৃষ্টির এক নিষ্কলঙ্ক ভবিষ্যতকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন শ্রমজীবী মানুষের জয়যাত্রার মধ্যে।

মার্ক্স আবিষ্কার করেন শ্রমের ভূমিকা, তার তাৎপর্য, চরিত্র ও শক্তিকে। মানুষ যে অন্যান্য জন্তু থেকে পৃথক তার অন্যতম কারণ হ'ল এই শ্রমের ক্ষমতা। মানুষে মানুষে বিভেদের প্রাচীর তুলে একে অন্যের ঘাড়ে পা দিয়ে চলার শ্রেণী বিভেদের মূলেও রয়েছে এই শ্রমের অপব্যবহার। আবার ভবিষ্যতে পৃথিবীতে স্বর্গ গড়ে তোলার দিনও আসবে এই শ্রমেরই পরিকল্পিত ব্যবহারের ভিতর দিয়ে। মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, ভাষার মধ্যে দিয়ে মানবীয় ভাব প্রকাশের পিছনেও রয়েছে এই শ্রমেরই প্রধান ভূমিকা।

পূর্বপরিকল্পনা মতো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে মানুষ পরিশ্রম করে—মানসিক ও কায়িক। পরিশ্রম জাত উৎপাদনের মধ্যেই রয়েছে মানুষের গতিশীল ভূমিকা। শ্রমের ফসল হিসাবে মানুষ যেদিন প্রথম হাতিয়ার ধ'রে প্রকৃতিকে বদলাতে অগ্রসর হয় সেদিনই মনুষ্যত্বের বীজ প্রোথিত হয়ে গেল, যার যাত্রাপথ নানা বৈচিত্র্যে আজো অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এই চলার পথেই মানুষ রেখে চলেছে অজস্র অবদান।

প্রচলিত সমাজে সংগ্রাম চলে তিন ধরনে—উৎপাদনের জন্য সংগ্রাম, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংগ্রাম আর শ্রেণী সংগ্রাম। প্রথমটির মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে একটি সমাজের উৎপাদন শক্তি, দ্বিতীয়টির ভিতর দিয়ে অর্জিত হয় মানুষের এগিয়ে চলার পথের নিশানা। আর তৃতীয়টির মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয় অগ্রগতির পথে বাধা অপসারণের কাজ। এই তিনটি একত্রেই হল বাঁচার সংগ্রাম। বাঁচার সংগ্রাম শুরু হবার পথেই সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন শ্রেণী। শ্রেণী সম্পর্কগুলি একত্র করলে খুঁজে পাওয়া যায় একটি সমাজকে—সামাজিক সম্পর্ককে। সামাজিক সম্পর্ক মানুষের মনোজগৎ ও কর্ম জগতে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে যা শ্রমের চরিত্রের উপর নানা প্রভাব বিস্তার করছে।

শ্রমই হ'ল সমাজের অগ্রগমনের মূল কারণ। অন্য সব কিছুর অনস্বীকার্য প্রভাব শ্রমের ভূমিকার কাছে গৌণ।

পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমদান করে কারা? পুঁজিবাদী সমাজে কীভাবেই বা শ্রম এমন বিরাট ভূমিকা পালন করে? বলা বাহুল্য শ্রমদানকারী মানুষই পুঁজিবাদী সমাজে নিষ্পেষিত, নিপীড়িত, শোষিত।

শ্রমের ফসল হ'ল পণ্য। শ্রম একসময় দ্রব্য তৈরি করত একমাত্র ভোগ করার উদ্দেশ্য নিয়ে। সমাজের সমবেত শ্রম সমবেত ভোগের সঙ্গে ছিল কার্যতঃ সমান। তাই ছিল না উদ্বৃত্ত, ছিল না শ্রেণী-বিভাগ, ছিল না শোষণ। সেই উৎপাদিত দ্রব্যের ভিতর পরিশ্রমের গুণগত প্রকাশ তখন ছিল ব্যবহারিক মূল্য হিসাবে। কিন্তু একসময় ব্যক্তিগত নৈপুণ্য, উৎপাদন কুশলতার মধ্যে দিয়ে উদ্বৃত্ত উৎপাদন দেখা দিল। উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করল গৌণভাবে উপস্থিত বিনিময় থেকে প্রধানভাবে প্রয়োজনীয় বিনিময়ের তাগাদা। পুঁজিবাদী সমাজে এসে উৎপাদনের লক্ষ্যই হয়ে দাঁড়াল বিনিময় মূল্য। পণ্যের মধ্যে এইভাবে পরিশ্রম পরিমাপের প্রকাশ হিসাবে আবির্ভূত হ'ল বিনিময় মূল্যের আকারে।

পণ্যের ব্যবহারিক মূল্যের মধ্যে শ্রমের বিশেষ ধরনের চরিত্র মূর্ত হয়ে আছে। কিন্তু বিনিময় মূল্যের মধ্যে তা হয়ে ওঠে বিমূর্ত। একটি সমাজের সমস্ত পণ্যের স্বরূপকে শেষ বিচারে খুঁজে পাওয়া যাবে বিমূর্ত মানবিক শ্রম হিসাবে। পণ্যের মধ্যে যে সাধারণ গুণ একটি অন্যটির সঙ্গে তুলনীয় করে তোলে তা হ'ল পণ্যের মধ্যে নিয়োজিত বিমূর্ত শ্রম। পণ্যের মূল্য এই শ্রমের পরিমাপের উপর নির্ভরশীল।

পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থার লক্ষ্য হ'ল পুঁজি সঞ্চয়ন। তাই পণ্য হ'ল এ সমাজে সবচেয়ে আদরণীয় বস্তু। প্রাকৃতিক বস্তুকে পণ্যে পরিণত করা, শ্রমশক্তিকে পণ্যে পরিণত করার অভিযানে পুঁজিবাদী সমাজ কোন কিছুকেই পণ্য ছাড়া ভাবতে পারে না।

ম্যাক্সিম গোর্কি একটি গল্পে বলেছেন, যে তিনি একবার এক পুঁজিপতিকে দেখতে যান। পুঁজিপতির কোটি কোটি টাকা। আগেকার দিনের অনেক রাজা জমিদারের থেকেও বেশী। গল্পের বক্তা ধনী লোকটির ঘরে বসে আছেন আর ভাবছেন, না জানি কি সাংঘাতিক সাজসজ্জা করে আসবেন সেই ধনী লোকটি। যার এত টাকা তার পোশাক তো রাজা-জমিদার থেকেও জাঁকজমক পূর্ণ হবে। কিন্তু না। ধনী লোকটি বাইরে এলেন এক পায়জামা-শার্ট গায়ে। একেবারেই সাদাসিধা। কেবল পোশাক নয় খাবারের আয়োজন দেখেও লেখক

আশ্চর্য হয়ে গেলেন। একই সঙ্গে দুজনের জন্য চা আর কিছু জলখাবার দিয়ে গেল বেয়ারা। তাতে দেখা গেল ধনী লোকটির প্লেটে তার প্লেটের থেকেও কম খাবার।

এ যুগের রাজাকে দেখে লেখক অবাক হয়ে গেলেন। এত টাকা দিয়ে তবে এঁরা করেন কী? লেখক প্রশ্নই করে বসলেন, আচ্ছা আপনি এত টাকা দিয়ে কী করেন? পুঁজিপতি উত্তর দিলেন, আমি টাকা খাটাই আরো টাকা আনার জন্য। লেখক জিজ্ঞাসা করেন, আরো টাকা দিয়েই বা আপনি কী করবেন? পুঁজিপতি স্বচ্ছন্দে বলেন, আরো টাকা ব্যয় করব আরো আরো উপার্জনের জন্য। আরোর তো শেষ নেই। আমাদের চাহিদারও শেষ নেই।

পুঁজিপতিরা সমগ্র সমাজটাকে ঐ আরো টাকার পিছনে ছুটিয়ে থাকে। পুঁজি থেকে আরো পুঁজিই হ'ল পুঁজিবাদী সমাজের লক্ষ্য। কাব্য-সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন সব কিছুই পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজি-সঞ্চয়নের লক্ষ্যে পণ্য হিসাবে বিবেচিত হয়।

পুঁজি আসে কোথা থেকে? পুঁজি আসে শ্রমজীবী মানুষকে প্রবঞ্চনা ক'রে তাদের শ্রমের ফসল আত্মসাৎ ক'রে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই এই শোষণের নিস্পেষণ চলতে থাকে।

পুঁজিপতি অর্থ ব্যায় ক'রে ক্রয় করে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও শ্রমিকের শ্রমশক্তি। তারপর উৎপাদিত পণ্য বাজারে নিয়ে যায় বিক্রয়ের জন্য। বিক্রয়-লব্ধ অর্থ ব্যয়িত অর্থ থেকে বেশী হয়। ঘরে ওঠে মুনাফা।

প্রাথমিক ভাবে নিয়োজিত পুঁজির দু'টি অংশ: স্থির পুঁজি—কাঁচামাল যন্ত্রপাতি প্রভৃতি যার মূল্যের কোন পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তনশীল পুঁজি—শ্রমশক্তি যার মূল্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পুঁজিপতির মুনাফা বা উদ্বৃত্ত মূল্য এখানেই অবস্থিত।

স্বাধীনভাবে বিচরণশীল শ্রমিক শ্রমশক্তি বিক্রয়ের পর মালিকের কাছে শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'য়ে যায়। স্বভাবতই শ্রমশক্তি ভাড়া নেবার পর শ্রমকে বিনিয়োগ ক'রে যে নতুন পণ্য উৎপন্ন হয় তার মধ্যে সঞ্চারিত উদ্বৃত্ত মূল্যের অধিকারী হয় মালিক। আগেই মিটিয়ে নেয়া মজুরী লাভ করায় উৎপাদিত পণ্যে যে মূল্য সৃষ্টি হয় তার অংশ আর শ্রমিক পায় না। উৎপাদিত পণ্যে যে মূল্য সৃষ্টি হয় তার দুটি অংশ—একটি অংশ মজুরী হিসাবে শ্রমিক পেয়ে যায় উৎপাদন শুরু হবার আগে শ্রমশক্তি বিক্রয় করার সময়ের চুক্তির মধ্যে দিয়ে। অপর

অংশটি আত্মসাৎ করে মালিক। উদ্বৃত্ত মূল্য হ'ল মজুরীবিহীন শ্রমের বাস্তবায়িত রূপ।

মুদ্রা হ'ল মূল্যের সাধারণ পরিমাপের মাপকাঠি। আবার একই সঙ্গে মুদ্রার একটি কল্পিত পরিমাণ হিসাবে পণ্যে নিয়োজিত বিমূর্ত শ্রমের পরিমাণই হ'ল তার দাম। মুদ্রা তাই হয়ে দাঁড়াল একটি পণ্য—শ্রমসাধ্য ও দুষ্প্রাপ্য বস্তু। পণ্যের মূল্য একসময় তাই মনে হ'ত মুদ্রা থেকেই অর্জিত হচ্ছে। শ্রমসময় থেকে নয়। অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় সমাজে উৎপাদন দক্ষতার গড় মান অনুযায়ী সামাজিক ভাবে প্রয়োজনীয় সময় দিয়ে একটি পণ্যে বিধৃত বিমূর্ত শ্রমের পরিমাণ অর্থাৎ মূল্য নিরূপিত হয়। এই কারণে পণ্য ও মুদ্রার পারস্পরিক সম্পর্ক ও পণ্যের মূল্য প্রাপ্তিকে মনে হয় একটি বস্তুগত সম্পর্ক হিসাবে। পণ্য আসলে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যেকার উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র হারিয়ে ফেলে এক রহস্যজনক বস্তু ব'লে প্রতীয়মান হয়। এই ব্যাপারটিও ঘটে সেই দিন থেকেই যেদিন দ্রব্য উৎপাদন ভোগের লক্ষ্য ছেড়ে বিনিময়ের লক্ষ্যে পরিবর্তিত হয় এবং উৎপাদনকারী তার ফলে হারিয়ে ফেলে, একই সঙ্গে উৎপাদিত দ্রব্য ও একে অন্যের সম্পর্কের উপরকার নিয়ন্ত্রণকে। এরই ফলে পুঁজিবাদী সমাজে মানুষ উৎপাদন প্রক্রিয়াটি আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। উল্টো উৎপাদন প্রক্রিয়াটিই মানুষের উপর কর্তৃত্ব শুরু করে। ভবিষ্যতে যখন মানুষ উৎপাদিকা শক্তির উপর নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করবে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মতো সচেতন আত্ম-ব্যক্তির পথে ভোগের লক্ষ্যে জীবনধারাকে পরিচালিত করবে সেদিন অবশ্যই উৎপাদন প্রক্রিয়াটি তার নিয়ন্ত্রণে আসবে।

পণ্য মুদ্রায় পরিবর্তিত হ'তে পারে। আবার মুদ্রা পণ্যতে। এই স্বাভাবিক পণ্যসঞ্চালন বিঘ্নিত হ'তে পারে যদি পণ্য মুদ্রাতে সঞ্চিত হবার পর সঞ্চিত রয়েই যায়। পণ্য শেষ পর্যন্ত তার ব্যবহার মূল্যেই আদৃত। সুতরাং মুদ্রাতে এসে যদি তা কেবল বিনিময় মূল্যের ধারক হয়ে আটকে থাকে তবে কোন এক জায়গায় পণ্য বিনিময়ের গতির অভাবে ব্যবহার মূল্য অর্জন করতে পারে না। ফলে পণ্য-প্রাচুর্য একই সঙ্গে ভোগহীনতায় সমাজের দারিদ্র্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকের শ্রম মালিকের পুঁজিতে পরিণত হয়। পুঁজি একদিকে মজুরী শ্রমের পূর্বশর্ত, আবার মজুরীশ্রমও পুঁজি সৃষ্টির কারণ। একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল। এই দিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পুঁজিপতি শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য যে মজুরী দেয় তা আসলে পূর্বেকার আত্মসাৎ

করা উদ্বৃত্ত মূল্যের সঞ্চয়ের অংশ অর্থাৎ মৃতশ্রম। মৃতশ্রম ব্যয় হচ্ছে জীবন্ত শ্রম ক্রয়ের জন্য যা উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করার ভিতর দিয়ে আবার ভবিষ্যতে মৃত শ্রমে পরিণত হয়ে জীবন্ত শ্রমকে ক্রয় করবে। পুঁজিপতি প্রতিবারেই উপযুক্ত মূল্য না দিয়েই পূর্বেকার আত্মসাৎ করা শ্রমের একটা অংশ দিয়ে জীবন্ত শ্রমের একটা অংশ নিয়ে নিচ্ছে।

শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করে কেবল মাত্র জীবন ধারণের কোন রকম সঙ্গতি করবার জন্য। শ্রম তার কাছে আর নিজের বস্তু হিসাবে থাকতে পারে না। শ্রম দিয়ে একজন শ্রমিক যা পায় তা হ'ল তার মজুরী। ফলে যে কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত বস্তুটি শ্রমিকের কার্যকলাপের লক্ষ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মজুরী পাওয়া ছাড়া পরবর্তী কার্যক্রম শ্রমিকের জীবনের অভিব্যক্তির থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদী সমাজে তাই উৎপাদন ও সমস্ত রকম সৃষ্টিই তার মর্মবস্তুকে হারিয়ে ফেলে। মালিকের লক্ষ্য মুনাফা, শ্রমিকের লক্ষ্য হয়ে পড়ে মজুরী। এর বাইরে এ সমাজে আর কিছুই অবস্থান করতে পারে না।

সমস্ত দ্বন্দ্ব ও পরস্পর বিরোধিতা এই মূল বিচ্ছিন্নতা থেকেই পুঁজিবাদী সমাজে অনিবার্যভাবে দেখা দেয়। শিল্প, বিজ্ঞান যখন নিয়ে আসছে প্রাচুর্যের এক অভূতপূর্ব সম্ভাবনা। তার পাশাপাশি অভাব দারিদ্র্য চিরস্থায়ী নীড় গেড়ে বসেছে। যান্ত্রিক উন্নতি যখন মানুষকে অফুরন্ত সময় হাতে এনে দিচ্ছে পরিশ্রমের হাত থেকে মুক্ত করতে তখন দেখা যাচ্ছে কঠোর পরিশ্রমের চাকার তলে শ্রমজীবী মানুষের ফাঁক ধরে যাচ্ছে। মহাকাশের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার আর ব্যাপ্তি যখন মানুষের সামনে খুলে ধরছে এক নবদিগন্ত, তখন পৃথিবীই যেন আমাদের কাছে হয়ে উঠছে সঙ্কীর্ণতার কারাগার। প্রকৃতিকে বিজয়ের রথ যতো এগিয়ে চলেছে মানুষের শৃঙ্খল ততো আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ছে মানুষেরই নিজের দুপায়ে। সম্পদ আর সম্ভাবনার ডালা যতো খুলে যাচ্ছে অনটন আর অনিশ্চয়তা ততো বেশী করে সমাজকে গ্রাস করছে। পুঁজিবাদী সমাজের এই চিত্রই নানা দিক থেকে মার্ক্স ও এঙ্গেলস আঁকবার চেষ্টা করেছেন। এর সঙ্গে এ যুগের ধর্মের কোন সামান্যতম যোগাযোগও নেই।

পুঁজিবাদী সমাজে প্রাতিনিয়তই ঘটে চলে দ্বন্দ্ব। ভোগের প্রয়োজনের পরোয়া না ক'রে উৎপাদন হয়ে চলায় উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্ব। শ্রমিককে বেশী বেশী ক'রে শোষণ ক'রে উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি করতে চায় মালিক, শ্রমিক চায় তা থেকে অব্যাহতি, সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্ব। উৎপাদন ব্যবস্থার যতো সামাজিকীকরণ

হতে থাকে উৎপাদনের ফল অন্যদিকে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের কক্ষে আবদ্ধ হতে শুরু করে—ফলে সামাজিক উৎপাদনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব গড়ে ওঠে ব্যক্তিগত মালিকানার। শ্রমকে আত্মসাৎ করে পুঁজি যতো বৃদ্ধি পেতে চায় শ্রমও ততো অধিক মজুরীর দাবিতে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে চলে। উৎপাদিকা শক্তি এইভাবে সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে নিয়ত সৃষ্টি করে চলে উৎপাদিকা শক্তির অবাধ বিকাশের সম্ভাবনার পথকেই আগলে ধরে। পুঁজিবাদ পরিণত হয় এক মুমূর্ষু দানবে।

মার্ক্স-এঙ্গেলসের ধনতন্ত্র সম্পর্কিত এই আবিষ্কারের উপর দাঁড়িয়েই লেনিন উদ্ঘাটন করেন তার পরবর্তী পুঁজির চরিত্রকে। ধনতন্ত্রের এই স্তরকে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদ।

ধনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের স্তরে দেখা যায় ব্যক্তির হাতে পুঁজির সঞ্চয়ন ক্রমশ বৃদ্ধি হতে থাকে, প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে ছোট পুঁজি হটে গিয়ে পুঁজির কেন্দ্রীভবন ঘটতে থাকে, যৌথ নানা পুঁজিসংস্থা গড়ে ওঠে, গড়ে ওঠে প্রতিযোগিতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শিল্প-সংস্থা, শিল্প সংঘ এর পাশাপাশি দেখা দিতে থাকে অর্থলগ্নিকারক। এইভাবে ধনতন্ত্র হতে চায় পরিকল্পনা সম্মত।

অসংখ্য পুঁজিপতি এইভাবে একচেটিয়া পুঁজিপতিতে পরিণত হ'তে আরম্ভ ক'রে। কিন্তু ক্ষুদে উৎপাদনকারীর অবস্থান, একচেটিয়া পুঁজির বাইরে থাকা অংশ, একচেটিয়াদের ভিতরকার প্রতিযোগিতা প্রভৃতির অবস্থান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল বিরোধগুলিকে দূর করতে পারে না। এর মধ্যে দিয়ে ধনতান্ত্রিক চরিত্রের একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে। প্রথমতঃ পুঁজির কেন্দ্রীভবন একচেটিয়া কর্তৃত্বকে এক নির্ণায়ক ভূমিকায় নিয়ে আসে। দ্বিতীয়তঃ শিল্পপুঁজি ও লগ্নিপুঁজি একত্র হয়ে মহাজনে পুঁজি সৃষ্টি করে যা স্বেচ্ছাচারী অর্থনৈতিক শাসন গড়ে তোলে। তৃতীয়তঃ ধনতান্ত্রিক পুঁজিই দেশের সীমা ছাড়িয়ে দেশান্তরে বেড়িয়ে পড়ে। চতুর্থতঃ এত বড় ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলি সমগ্র বিশ্বকে আর্থিক দিক থেকে ভাগ করে নেয়। পঞ্চমতঃ বৃহৎ পুঁজি কর্তৃক বিশ্বকে আঞ্চলিক ভাবে ভাগ করে নেয়া হয়। ষষ্ঠতঃ আঞ্চলিক ও আর্থিক পুনর্ভাগাভাগী নিয়ে আসে পৃথিবী জুড়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ।

পুঁজিবাদী অবস্থা থেকে সাম্রাজ্যবাদী অবস্থায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা একচেটিয়ার পদতলে ক্রমশঃ চাপা পড়তে থাকে; জাতীয়তাবাদ যখন এক দেশের মধ্যে ক্রমবিকাশের স্তরে থাকে তখন সাম্রাজ্যবাদ নিজ সম্মান ও উন্নতির নামে অন্য দেশের জাতীয়তাবাদকে হামলা করে; সমরতন্ত্র যা পুঁজিবাদের

বিকাশের বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে তা আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়; বর্ণতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে এসে অন্যজাতিকে পদানত করার এক যুক্তি হিসাবে দেখা দেয়; পুঁজি ও রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি পায়, ফলে সংসদীয় প্রাধান্য থেকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়; সীমিত পৃথিবী ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী দখল সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় পুনর্বণ্টন ও পুনর্দখলকে কেন্দ্র করে প্রতিনিয়তই যুদ্ধের অবস্থা বিরাজ করে।

সাম্রাজ্যবাদী অবস্থা পুঁজিকে যেমন বিশ্বব্যাপী একটি দিকে দাঁড় করিয়ে দেয় তেমনি শ্রমজীবী মানুষকেও বিশ্বব্যাপী শোষণের এক ছত্রতলে এনে জড় করে। বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধতা না করে শ্রমিক শ্রেণীর আত্মরক্ষার আর উপায় থাকে না।

মার্ক্স ও লেনিন এই তত্ত্বের আবিষ্কারের ভিতর দিয়ে কীভাবে ধর্মগুরু হয়ে উঠতে পারেন তা আমাদের মাথায় আসে না। তবে হ্যাঁ মার্ক্স ও লেনিন কেবল সমাজ ও শ্রেণী বিশ্লেষণ করেই ক্ষান্ত হন নি। মানব সমাজের আগামী দিনগুলিকে কিভাবে সামাজিক দ্বন্দ্বমুক্ত, শান্তিময় ও সমৃদ্ধ করে তোলা যায়, কোন পথে গেলে সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব তারও দিক নির্দেশ করেছেন। মার্ক্স-লেনিন নির্দেশিত সে পথ হ'ল শ্রেণী-সংগ্রামের পথ। উৎপাদন শক্তিকে মুক্ত করার পথ।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম অনিবার্য। এই শ্রেণী সংগ্রাম থেকে মুক্তি পেতে হ'লে শ্রেণীবিরোধের অবসান অবশ্য প্রয়োজন। মার্ক্স-লেনিন দেখিয়েছেন সেই শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক শ্রেণীশোষণহীন সমাজ গড়তে গেলে শোষিত শ্রেণীর সশস্ত্র সংগ্রাম অপরিহার্য। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে অপরাপর শোষিত শ্রেণীকে একত্রিত করে কীভাবে লড়াই চালালে সেই লক্ষ্য পূরণ করা যায় তারও বস্তব পথনির্দেশ করে দিয়েছেন মার্ক্স—বিভিন্ন আন্দোলন ও প্যারী কমিউনের লড়াই এর বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে আর লেনিন দেখিয়েছেন রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার মধ্যে দিয়ে। শোষিত মানুষের বাঁচার সংগ্রামের গুরু—সশস্ত্র বিপ্লবের পথ প্রদর্শক এই মার্ক্স লেনিনকে দানিকেন বলেছেন 'এ যুগের দুই ধর্মগুরু'।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ: সমাজ বিকাশের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এখানেও বস্তুবাদী তত্ত্বপ্রযুক্ত এবং তার ঐতিহাসিক বিকাশ ঘটে চলেছে দ্বন্দ্বমূলক পথ ধরে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিষয় সুতরাং, সমাজ বিশ্লেষণ ও তার বিকাশের ধারা অনুসরণ।

একটি সমাজ বলতে প্রধানতঃ বোঝায় কয়েকটি উৎপাদন সম্পর্কের সমষ্টিগত অস্তিত্ব। ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি, ব্যক্তিচিন্তার প্রভাব, ধর্মীয় আচার আচরণ প্রভৃতি কোন কিছু দিয়েই একটি সমাজের মূল ও মৌলিক স্বরূপকে বোঝা সম্ভব নয়। সমাজের বৈশিষ্ট্য ও তার বিকাশের পিছনে সর্বপ্রধান ভিত্তি হ'ল উৎপাদন সম্পর্ক; সামগ্রিকভাবে উৎপাদন সম্পর্কগুলোকে নিয়েই দাঁড়ায় সামাজিক সম্পর্ক।

সামাজিক সম্পর্কের স্বরূপ নির্ভর করে উৎপাদন পদ্ধতির উপর। উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্ক চিহ্নিত করে সমাজের উৎপাদন ক্ষমতাকে। উৎপাদন ব্যবস্থা ও পদ্ধতির দুটো দিক—উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক। সমগ্রভাবে উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য হল: (১) উৎপাদনের পরিবর্তন ও বিকাশ আরম্ভ হয় উৎপাদিকা শক্তির পরিবর্তন ও বিকাশের সাথে সাথে। (২) সমাজের চিন্তা, ধ্যান, ধারণারও পরিবর্তন ঘটে উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রমাগত পরিবর্তনের সাথে সাথে। (৩) নতুন উৎপাদন শক্তি ও সম্পর্ক মানুষের ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে পুরাতন ব্যবস্থার গর্ভ থেকেই উদ্ভূত হয়।

ঐতিহাসিক বিকাশের ধারা বিষয়ীগত, ব্যক্তি মানুষের ইচ্ছানিরপেক্ষ ভাবে এগিয়ে চলে। অনেকটা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর মতো। তবে প্রাকৃতিক নিয়মাবলী চলে স্বাভাবিক গতির নিয়মে আর মানব সমাজ চলে মানুষের সচেতন, সক্রিয় কার্যাবলীর প্রভাবে। প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর মতো সামাজিক গতিপ্রকৃতিও সাধারণভাবে জানা সম্ভব। এই জানার মধ্যে দিয়েই সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করা সম্ভব এবং সম্ভব সমাজ বদলের ক্ষেত্রে যোগ্য ভূমিকা পালন করা। কার্যতঃ ঐতিহাসিক বস্তুবাদী চিন্তার জন্যই মানব-জগতের কাছে সমাজকে জানা ও তার পরিবর্তনে সচেতন পরিকল্পিত প্রয়াস প্রয়োগের সুযোগ এনে দেয়।

সমাজের উৎপাদন শক্তি হ'ল উৎপাদনের উপকরণ, শ্রমের উপকরণ এবং উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত মানুষ। এই শক্তিই নির্ধারণ ক'রে প্রকৃতিকে কর্ষণ করে সেই সমাজ কতটা আহরণ করতে পারে তার পরিমাণকে। উৎপাদনের উপকরণ, পদ্ধতি ও তার মালিকানা সমাজের বিভিন্ন মানুষকে যে সম্পর্ক বেঁধে রাখে তাই হ'ল উৎপাদন সম্পর্ক। এটিই হ'ল শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি। এই উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠে একটি অবস্থার পরিপক্কতার ভিতর দিয়ে এবং কারো ইচ্ছানিরপেক্ষ ভাবে। সমাজের প্রয়োজনীয়তার উপর দাঁড়িয়ে উৎপাদন শক্তির এক এক সময় পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু অভ্যাসের ভিতর

দিকে এক সময়ের বাড়তি প্রয়োজন অন্য সময়ে স্বাভাবিক প্রয়োজনে পরিণত হয়, আরো নতুনতর প্রয়োজনের তাগাদা সৃষ্টি হয়—আবশ্যকও হয়, সুতরাং চাহিদা এবং প্রয়োজনেরও শেষ থাকে না। উৎপাদনের প্রয়োজনও তাই অফুরন্ত। উৎপাদন শক্তি সে প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম হয়ে পড়লে তার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দেয়। উৎপাদন শক্তির বিকাশে উৎপাদন সম্পর্ক যখন বাধা হয়ে দাঁড়ায় পুরনো উৎপাদন সম্পর্কেরও বদল তখন হয়ে দাঁড়ায় অবধারিত।

এই সমাজ কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়েই সংস্কৃতির অভিব্যক্তি। সংস্কৃতি অর্থাৎ উপরি কাঠামের যা কিছু সকলই গড়ে ওঠে এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে। যাবতীয় দার্শনিক, ধর্মীয়, নৈতিক, আইনগত, রাজনৈতিক চিন্তার উদ্ভব ঘটে মূলতঃ এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে। উপরি কাঠামো আবার পর্যায়ক্রমে মূল কাঠামোর উপর প্রভাব বিস্তার করে—সমাজের এক অবয়বে দুইএর সমন্বয় ঘটে।

আদিম সাম্যবাদী শ্রেণীহীন সমাজ থেকে শ্রেণী সমাজ শুরু হয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজের ধারাপথেই মানব সমাজের বিকাশ ঘটে চলেছে। উৎপাদনের উপকরণগুলো আদিম সমাজে ছিল সমাজের অধিকারে। তখন ছিল না শোষণ ছিল না শ্রেণী। দাস সমাজ যে শোষণ ও শ্রেণী বিরোধের সূত্রপাত ঘটাল তা আজো অব্যাহত গতিকে বয়ে নিয়ে চলেছে সাম্যবাদী সমাজের সুদূর ভবিষ্যতের দিনগুলির পূর্ব পর্যন্ত। সাম্যবাদে উত্তরণের পূর্বে শ্রেণীহীন অবস্থাকে ভাবা কেবল অবাস্তব নয়, ক্ষতিকারকও। কারণ সে ভাবনা শ্রেণী বিলোপের লক্ষ্যকেই দূর করে দেয়।

শ্রেণীসমাজ যখন আছে তখন শ্রেণীবিরোধ ও তা থেকে সংঘর্ষ অবধারিত। শ্রেণী সংগ্রামের ধারাপথেই গড়ে উঠেছে ইতিহাস। আজকে সমগ্র মানবসমাজ সেই পথেই সমগ্র শোষণ ব্যবস্থাটাকেই উৎখাত করার দিকে ধাবিত হয়ে চলেছে। আর তাছাড়া মানব সমাজের অন্য কোন পরিণতি ও মানুষের মুক্তি নাই। ইতিহাসের বিধান হ'ল শ্রেণীসংগ্রাম আর সেই সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই শ্রেণীসংগ্রামের চির অবসান ঘটান।

মানুষের জ্ঞান ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে সৃষ্টি হয়েছে শ্রেণীসংগ্রাম, উৎপাদনের জন্য সংগ্রাম আর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসাবে। নানা স্তরের ও ধরনের জ্ঞান এরই ভিতর দিয়েই এত বিচিত্রতার রূপে প্রকাশিত। এই সমস্ত সংগ্রামে ব্যক্তির ভূমিকা সামগ্রিক চাহিদার পরিণাম

হিসাবেই দেখা দিয়েছে। যদিও সমগ্র জনসাধারণের কার্যকলাপই হ'ল মূল। শ্রেণী সংগ্রামে ও উৎপাদনের জন্য সংগ্রামে তো তাদের ভূমিকার উপরই সব কিছু নির্ভর করে।

উৎপাদন ও তার উপর দাঁড়িয়ে উপরি কাঠামো ছাড়াও মানব সমাজের ইতিহাসে কতকগুলি স্বাভাবিক বিষয় দেখতে পাওয়া যায় : যেমন সম্প্রদায় হিসাবে গোষ্ঠী, উপজাতি, জাতি ; জীবনযাপনের ধরন হিসাবে ভাষা, বিবাহ, পরিবার ; অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে খেলাধূলা, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জ্ঞানান্বেষণ প্রভৃতি। কাঠামো ও উপরি কাঠামোর কোনটির সাথেই এগুলি জড়িত না থাকলেও যে কোন সামাজিক অর্থনৈতিক বিকাশেরই এগুলি হ'ল ফল। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিও সমাজ বিকাশের সাথে সাথে পরিবর্তিত আকার ধারণ করে চলেছে। বিবাহের আদিম রূপ, ভাষার পুরাতন চেহারা, জাতি উপজাতির অতীত গঠন স্বভাবতই আর সে ভাবে নেই। সমাজ বৃক্ষের এরা সব ডালপালা।

মানব সমাজকে মার্কস-লেনিনীয় বস্তুবাদী দৃষ্টিকোন দিয়ে দেখলে অর্থনৈতিক অবস্থার বিচারে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বিকাশের ধারাকে খুব সাধারণ ভাবে পাঁচটি স্তরে ভাগ করা যায়—আদিম সাম্যবাদী, দাস, সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ। এরই সর্বোচ্চ পরিণতি হ'ল সাম্যবাদী সমাজ। অবশ্য বিভিন্ন দেশের সামাজিক বৈশিষ্ট্য-অনুসারে এই স্তর বিভাগের রকমফেরও লক্ষ্য করা যায়।

আদিম যৌথ সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ ছিল সমাজের অধিকারে। ফলে উৎপাদিত দ্রব্যের উপর অধিকারও ছিল সার্বজনীন। অস্ত্র ছিল সকলের নিয়ন্ত্রণে। স্বল্প প্রয়োজনবোধ আর স্বল্প উৎপাদনের মধ্যে ছিল সামঞ্জস্য। ছিল না শ্রেণী, ছিল না শোষণ। ছিল না রাষ্ট্র।

দাস ব্যবস্থায় দাসের মালিকানাই উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা হয়ে দাঁড়ায়। উৎপাদনের উপকরণও স্বল্পলোকের হাতে পুঞ্জীভূত হতে থাকে। যুদ্ধ-বিগ্রহে যখন গোষ্ঠী সমাজ ভাঙছে তখন শ্রেণীসমাজ গড়ে তুলছে রাষ্ট্র। অস্ত্র চলে যাচ্ছে স্বল্পলোকের নিয়ন্ত্রণে। উদ্বৃত্ত জমা হচ্ছে এক শ্রেণীর হাতে, নিঃস্ব হচ্ছে অন্য অংশ।

সামন্তব্যবস্থায় উৎপাদনরত শ্রমিকদের উপর পূর্ণ মালিকানা হারিয়ে যায়। সমগ্র সমাজটি প্রভু থেকে ভূমিদাস পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে ভাগ হয়ে যায়। উৎপাদন উপকরণগুলো অবশ্য প্রধানতঃ সামন্তপ্রভুর হাতেই থাকে। উৎপাদনে দাসের উদ্যোগহীনতা থেকে ভূমিদাসদের উদ্যোগে বৃদ্ধি পেল। মূলতঃ ভোগের জন্য

উৎপাদন এ সমাজের বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রব্যবস্থা অনেক পাকাপোক্ত হয়ে উঠল। ধর্মীয় চিন্তা সুসংবদ্ধ হয়ে সমাজ-ব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে উঠল। শ্রেণীদ্বন্দ্ব ক্রমাগত তীব্র হতে লাগল। দাসসমাজে যা ছিল বিদ্রোহ, সামন্ত সমাজে তা হয়ে উঠল বিপ্লব।

ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক ভূমি সম্পর্ক থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হলেও উৎপাদনের উপকরণ সম্পূর্ণভাবে পুঁজিপতির হাতে থাকায় শ্রমিকশ্রেণীকে শ্রমশক্তি বিক্রয়ের জন্য হাজির হতে হয় পুঁজিপতির কাছে। এ হ'ল নতুন ধরনের শ্রমদাসত্ব। যন্ত্রের আবির্ভাব শ্রমিকের দক্ষতার চাহিদা সৃষ্টি করে। উৎপাদিকা শক্তি বিপুলভাবে বিকাশিত হ'তে থাকে। কিন্তু উৎপাদন পরিচালিত হয় মুনাফার স্বার্থে। উৎপাদন সম্পর্ক তখন আর পুরনো অবস্থায় থেকে উৎপাদনের সামাজিকীকরণের যাবতীয় পূর্ব শর্তকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। সচেতন চিন্তাধারার ফলশ্রুতি হিসাবে বিপ্লব পরিণতি লাভ করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায়। অস্ত্রের অধিকার চলে আসে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণের মালিক হয় গোটা সমাজ। ব্যক্তিগত সম্পত্তির হয় ক্রমাবলুপ্তি। সুপরিকল্পিত ভাবে উৎপাদন শক্তির বিকাশ হ'তে থাকে। উৎপাদনের লক্ষ্য মুনাফার স্থানে দেখা দেয় ভোগ। শোষণভিত্তিক শোষকশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিস্থাপিত হয় শ্রমিকশ্রেণীর শোষণহীন রাষ্ট্রের দ্বারা।

এই সমাজেই প্রথম ইতিহাসের পাতায় শোষকশ্রেণী অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অভূতপূর্ব এই সমাজে প্রথম শুরু হয় শোষকশ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা পুনর্দখলের লড়াই। দীর্ঘ হাজার হাজার বছরের শোষণভিত্তিক রাষ্ট্রশক্তি ও তার চিন্তাধারা এই প্রথম পর্যুদস্ত হয়।

রাষ্ট্র: ইতিহাসকে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক বিভিন্ন স্তরগুলি দেখতে পাওয়া যাবে তেমনি পরিচয় পাওয়া যাবে রাষ্ট্রের স্বরূপ। রাষ্ট্র সমাজ বহির্ভূত কোন ধারণা থেকে দেখা দেয়নি। সমাজের অভ্যান্তরীণ বিকাশেরই ফল হ'ল রাষ্ট্র। শ্রেণীসমাজের অনিবার্য ফল হ'ল রাষ্ট্র। উৎপাদনের প্রকৃতির পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই রাষ্ট্রের স্বরূপের পরিবর্তন ঘটেছে। স্বভাবতই রাষ্ট্র চিরকাল ছিল না—চিরকাল থাকবেও না।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই তার রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন দেখা দেয়। একদিকে সম্পত্তির স্তূপ, অন্যদিকে হাহাকার। এই সমাধানের অযোগ্য বৈপরীত্যের সহ অবস্থানের জন্য একের রোষ থেকে অন্যকে রক্ষা করার তাগাদা

এল। একের আধিপত্য অন্যের উপর জবরদস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন দেখা দিল সশস্ত্র বাহিনীর। শোষণের স্বপক্ষে তার বিহিত ব্যবস্থাকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রচারের জন্য দরকার হ'ল আইনের। এই সব ব্যবস্থাপনার জন্য তৈরি হ'ল শাসন যন্ত্র—আমলাতন্ত্র। রাষ্ট্রের উদ্ভব সুবিধাভোগী শ্রেণীর স্বার্থকেই রক্ষা করা কর্তব্য বলে গ্রহণ করল।

শ্রেণীসমাজে শ্রেণীসংঘাত অনিবার্য। শোষকশ্রেণী চালাবে শোষিত শ্রেণীর উপর অত্যাচার। আর শোষিত শ্রেণী চালাবে শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই। এটা যদি রাষ্ট্রনিরপেক্ষভাবে চলতে থাকে তবে মুষ্টিমেয় শোষকশ্রেণী অনতি-বিলম্বে ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য। অথচ ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে শোষক-শোষিত শ্রেণী দীর্ঘদিন ধরেই পাশাপাশি অবস্থান করে আসছে। এটি সম্ভব হচ্ছে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ফলেই। সেই বিচারে রাষ্ট্র হ'ল, দুই বিপরীত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব যাতে ফেটে না পড়ে, তারই প্রহরী। রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনী হ'ল শোষিত শ্রেণীর উপর দমন-পীড়ন চালনা আর শোষক শ্রেণীকে রক্ষা করার প্রহরী। বিচার ব্যবস্থা হ'ল, নির্ধারিত পথের সীমা অতিক্রম না করার গণ্ডী। শাসনব্যবস্থা হ'ল শোষণভিত্তিক সমাজকে দেখাশোনার কর্তৃত্ব।

আদিম সমাজে সমস্ত মানুষের হাতে ছিল অস্ত্র। সুতরাং ক্ষমতা কারো হাতে সীমাবদ্ধ হওয়া সম্ভব ছিল না। শ্রেণীব্যবস্থায় শোষক শ্রেণী হ'ল অস্ত্রের একমাত্র অধিকারী। রাজনৈতিক ক্ষমতার এই মূল উৎসের উপর দখলের মাধ্যমে শোষকশ্রেণী তার রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখে। রাষ্ট্র তাই প্রকৃতপক্ষে একশ্রেণীর উপর অন্যশ্রেণীর জবরদস্ত শাসনের যন্ত্র।

দাসসমাজ থেকে সামন্তসমাজ হয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজ পর্যন্ত নানারকম রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দেখা যায়। প্রথম দুই পর্বে রাজতন্ত্র ছিল রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। অবশ্য তার সঙ্গে অভিজাততন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসনও দেখা যায়। পুঁজিবাদী সমাজে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই দেখা যায় বেশী। একনায়কতন্ত্রী ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাও সময়ে সময়ে দেখা যায়। বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার রকমফের যাই থাক এই সমস্ত পদ্ধতি ও গণতান্ত্রিক স্বরূপ আসলে শোষকশ্রেণীর একচেটিয়া শাসনেরই নামান্তর।

শোষকশ্রেণীর রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করে নতুন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা অধুনাবিশ্বে দেখা গিয়েছে সচেতন জনগণের বিপ্লবী প্রয়াসের ফলে। উপর থেকে শাসক-শ্রেণীকে হটিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল নয় সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক ভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থা বদলের মধ্যে দিয়েই এযুগের সবচেয়ে অগ্রসর, প্রগতিশীল সম্ভাবনাময় রাষ্ট্র

স্থাপিত হয়েছে অনেক দেশে। সেখানেও রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্র একই রকম—একশ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর উপর আধিপত্য। স্বভাবতই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ততোকালই থাকবে যতদিন ইতিহাস শ্রেণীমুক্ত না হচ্ছে।

সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের পথ ধরে সঞ্চিত সমস্ত ধারণা, তত্ত্ব ও মতবাদ, অভ্যাস, রীতিনীতি, মানসিক মননশীলতা দ্বারাই গড়ে উঠেছে সামাজিক সচেতনতা। সামাজিক সচেতনতা আসলে সামাজিক প্রাণী হিসাবেই মানুষের প্রাপ্তি। শ্রেণীসমাজে ইতিহাস প্রমাণ করেছে এই সামাজিক সচেতনাতাই শ্রেণীসচেতনতাকে গড়ে তুলেছে। কোন অবাস্তব সার্বজনীন মানবিক ভাবমূর্তি বস্তুবাদী প্রত্যয়ের পরিপন্থী।

সমাজের মধ্যে থেকেই সমাজের অগ্রগতির যে চিন্তা তা বাস্তব সম্মত হ'তে পারে শ্রেণীবোধের স্বীকৃতির মধ্যে দিয়েই। এই শ্রেণীচিন্তার সত্যতাকে উপলব্ধি করতে পারলেই তার অবলুপ্তির পথ অনুসন্ধানের প্রয়োজন উপলব্ধি হ'তে পারে। নচেৎ ভিত্তিহীন মানবিক সার্বজনীনতার ধারণা মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে প্রকৃত সত্যের উন্মোচন কোনদিনই করতে পারবে না। নীতিবোধ, শিল্পচেতনাও এই শ্রেণীবোধের ঐতিহাসিক বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে আছে।

ইতিহাসকে কোন ধর্মগুরু এভাবে কখনও দেখেছেন বলে আমাদের জানা নেই, আর ইতিহাসকে এইভাবে দেখার জন্য, যে কেউ ধর্মগুরু হতে পারে তাও আমাদের জানা নেই। তবু দানিকেনের কাছে মার্ক্স-লেনিন হলেন, 'এযুগের দুই মহান্ ধর্মগুরু'।

দার্শনিক মতবাদ: মানুষের চিন্তাভাবনা যে পথে পরিচালিত হয়, প্রকৃতিকে মানুষ যে ভাবে আবিষ্কার করে সে সম্পর্কে এক সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন মার্ক্স তার দার্শনিক চিন্তার ভিতর দিয়ে। মার্ক্স-এর তত্ত্ব কেবল দার্শনিক তত্ত্বই নয় এ একই সঙ্গে দার্শনিক সমাধানও বটে। মানব সমাজের স্তূপীকৃত সমস্যা, অজস্র প্রশ্নের আজ পর্যন্ত সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ সমাধান মেলে মার্ক্সীয় তত্ত্বে।

মার্ক্সীয় মতানুসারে প্রাকৃতিক ও সামাজিক সমস্ত কিছুকেই বিপরীতের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে সবচেয়ে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বিপরীতের দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়া কেবল একটি মানসিক ব্যাখ্যাই নয় এটি বস্তুগত সত্যও বটে। মানসিক জগতের সমস্ত কিছুও বস্তুজগতেরই প্রতিফলন। মার্ক্সীয় দার্শনিক চিন্তা তাই একদিকে বস্তুবাদী অন্যদিকে দ্বন্দ্বমূলক।

মার্ক্সীয় জ্ঞানতত্ত্ব অনুসারে সবকিছুর মূলে রয়েছে সংঘাত বা দ্বন্দ্ব এবং তার পরিণামেই দেখা দেয় গতি বা বিকাশ। যে কোন বস্তুর পরিবর্তন বা বিকাশের

মূলে রয়েছে বিরোধের অস্তিত্ব। যে কোন ঘটনার বিবর্তনের পিছনে রয়েছে পরস্পর-বিরোধী কার্যকলাপ বা গুণের অস্তিত্ব। গতি হ'ল জগৎ ও সমাজের সর্বাপেক্ষা মৌলিক বিষয়। গতি বা বিকাশকে বুঝতে হ'লে তার প্রকৃতিকে বুঝতে হবে। এই প্রকৃতি বোঝা যাবে তিনটি সূত্রের আলোকে।

এক॥ ঐক্যের মধ্যে বৈপরীত্য বা বিপরীতের অন্তর্ভেদ।

দুই॥ পরিমাণাত্মক পরিবর্তন থেকে গুণাত্মক উত্তোরণ।

তিন॥ আকার বাতিলের পুনর্বাতিল।

বিপরীতের অন্তর্ভেদ : পার্থিব বা জাগতিক পদার্থ এবং ঘটনাবলী পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। প্রত্যেকে একে অন্যের সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত। প্রত্যেকে একটি অন্যটির সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে একটি বাদ দিয়ে অপরটির সম্পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি যেমন সমগ্রের অংশ আবার সমগ্র তেমনি প্রত্যেকটির সূত্রবদ্ধতা। নতুনের জন্ম পুরাতনের গর্ভে। নতুনকে বুঝতে হ'লে পুরাতনের সঙ্গে তার সম্পর্ককে বুঝতে হবে।

বিবর্তন, পরিবর্তন বা আকস্মিক রূপান্তরের অর্থ নতুনকে পুরাতনের মধ্যে থেকে কীভাবে সৃষ্টি হ'ল তা জানতে পারা। নতুন সৃষ্টির পিছনে তাকালে দেখা যাবে কোন বৈপরীত্যের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব থেকে পরিস্ফুট হয়েই নতুনের জন্মলাভ সম্ভব হয়েছে। এই বিরোধী শক্তি, বৈপরীত্যকে পরস্পর একই বস্তু বা ঘটনার মধ্যে খুঁজে পাওয়ার মধ্যেই এই সূত্রের মূল অর্থ। প্রতিটি বস্তু, ঘটনা বা প্রক্রিয়ার মধ্যেই এই বিরোধী শক্তির অবস্থান। বিরোধের অস্তিত্বই বস্তুর অস্তিত্ব, ঘটনার অস্তিত্ব। বিরোধহীনতা মানেই বস্তুর মৃত্যু, ঘটনার অবশেষ গতির ছেদ।

এই বিরোধ শক্তি কোথাও সংঘাতে লিপ্ত, কোথাও বা মিলের ছন্দে বাঁধা।

বৈপরীত্য কোথাও সহ অবস্থান করে, কোথাও সমগ্রকে চিহ্নিত করে, কোথাও বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়ে নতুন উত্তরণ ঘটায়। এক অংশের প্রবল হয়ে ওঠা অন্য অংশের বিনাশের কারণ। এক অংশ অন্য অংশের সঙ্গে মিলেই সমগ্র সত্তা।

বস্তু বলতে বোঝায় ক্ষুদ্র বা বৃহতের অস্তিত্ব। বস্তু কণিকা ধনাত্মক ও ঋণাত্মক কণার সমন্বয়ে গড়া। দেশ—সসীম আর অসীমের মিল। আলোক কণিকা একই সঙ্গে বস্তু ও তরঙ্গ ধর্মের ধারক। মানব প্রজাতি—পুরুষ ও প্রকৃতির মিল। অঙ্ক শাস্ত্র যোগ আর বিয়োগের সম্মিলন। নীতিবোধ ভাল আর মন্দ সম্পর্কিত। প্রাণীর জীবন গ্রহণ ও বর্জনের উপর নির্ভরশীল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় রয়েছে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ। পুঁজিবাদী সমাজ—শোষক আর শোষিতের অবস্থান। চুম্বক উত্তর-দক্ষিণ মেরুতে গড়া।

সূর্য-গ্রহ-উপগ্রহ-উল্কা, প্রত্যেকে পৃথক আবার সকলে মিলে সৌরমণ্ডল। বরফ-জল-বাষ্প তিনটি পৃথক স্তর, সবই আবার এক রাসায়নিক বস্তু জল। মালভূমিকে বুঝতে হ'লে নিম্নভূমি ও পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা করতে হয়। নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত না করলে অর্থহীন অথচ প্রত্যেকের পার্থক্যও সুস্পষ্ট।

পরিমাণাত্মক থেকে গুণাত্মক পরিবর্তন: কোন পদার্থের নির্দিষ্ট অবস্থানে নির্দিষ্টধর্ম বা গুণ থাকে। এই গুণ বা ধর্ম ততক্ষণই বর্তমান থাকে যতক্ষণ সেই পদার্থ একা বা অন্য কোন পদার্থের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে অবস্থান করে। পদার্থের নিজের পরিমাণ, তার সঙ্গে অবস্থিত অন্য পদার্থের পরিমাণ বা যে অবস্থার মধ্যে অবস্থান করছে সেই অবস্থার পরিমাণের উপর সেই গুণগুলি নির্ভরশীল। এই জিনিসগুলির যে কোন একটি বা একাধিকের পরিমাণের পরিবর্তনে বস্তুর ধর্ম বা গুণের পরিবর্তন ঘটে।

পরিমাণের পরিবর্তনের পথে অবশ্য পরিমাণের বিভিন্ন স্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাপ বা চাপে কোন বস্তু বা বস্তু সমষ্টির গুণগত পরিবর্তন ঘটাতে হ'লে একটি নির্দিষ্ট স্তর অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। এই পরিবর্তন কখনও হয় ধীরে, কখনও হয় দ্রুত। ক্রমবিকাশের পথে প্রচ্ছন্ন গুণগুলি প্রকাশিত না হ'লেও তার অবস্থান থাকে বস্তু কাঠামোর মধ্যেই। আভ্যোৎপাদিত বিরোধী শক্তির সংঘাতে ধারাবাহিকতার পথ ধরেই একটা সময় এসে পরিবর্তনকে চিহ্নিত ক'রে প্রচ্ছন্ন গুণ তখন প্রকট হয়। পরিমাণাত্মক পরিবর্তন গুণাত্মক পরিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গুণ বা ধর্ম হ'ল সেই জিনিস যা দিয়ে একটি জিনিসকে বাকি অসংখ্য জিনিস থেকে পৃথক করা যায়। এই গুণও একটি জিনিষের পরিমাণগত উপস্থিতির উপর নির্ভরশীল। একটি আধা ঔপনিবেশিক সমাজে নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটিয়ে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটানো যায়। কিন্তু উৎপাদন শক্তিকে একটা পরিমাণে উত্তরণ না ঘটাতে পারলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা যায় না।

কোন কিছুর পরিমাণগত পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত ধীর এবং ধারাবাহিক। কিন্তু কোন গুণগত পরিবর্তন হ'ল উল্লম্ফন—একটি ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ও নতুন আরেকটি ধারার সূত্রপাত। পরিমাণগত পরিবর্তনকে গভীরভাবে লক্ষ্য না করলে বোঝা যায় না, গুণগত পরিবর্তন সহজেই প্রত্যয়ের মধ্যে আনা যায়।

জলের উপরকার চাপ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিয়ে নিলেই জল বাষ্পে

পরিণত হ'তে থাকে। আবার জলের তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বাড়ালেও জল বাষ্পে পরিণত হয়। অর্থাৎ পরিমাণগত পরিবর্তন যে কোন দিকে ক্রমাগত বাড়ার ভিতর দিয়ে একটি স্তর অতিক্রম করার ফলেই গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়। অক্সিজেন পরমাণু দুটি একত্রে থাকলে তা হয় অক্সিজেন—তিনটি একত্রে হ'লে হয় নতুন জিনিস—ওজন। ইউরেনিয়াম থেকে তেজস্ক্রিয়তা বের হয়ে ক্রমশঃ তার আণবিক গঠনের পরিবর্তন হতে থাকলে একটা পর্যায়ে এসে সীসাতে পরিণত হয়। যৌগিক পদার্থের আণবিক ওজন অনুসারে পর্যায় সারণীতে ভাগ করলে পরমাণুর আভ্যন্তরীণ পদার্থিক কণায় পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তিত পদার্থ দেখতে পাওয়া যায়। সামন্ত সমাজে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন ক্রিয়ার পরিমাণগত বৃদ্ধিই সামাজিক প্রকৃতিকে পাল্টিয়ে ধনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যে নিয়ে আসে। প্রাণীজগতে বিবর্তনের ধারায় সামান্য সামান্য করে পরিবর্তন বিশেষ বিশেষ অবস্থায় গুণগত চরিত্র পাল্টিয়ে নতুন প্রজাতির আবির্ভাব ঘটায়। মানুষের শরীরে অবস্থিত বীজাণুই পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে রোগের প্রাদুর্ভাব সৃষ্টি করে।

আকার বাতিলের পুনর্বাতিল: ক্রমবিকাশের পথ ধরে অগ্রসর হ'লে দেখা যাবে যে একটি পরিবর্তন আরেকটি পরিবর্তনের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। একটি পরিবর্তন ক্রমাগত আরেকটিকে বাতিল ক'রে অপরটিতে আবর্তিত হচ্ছে। সমুদ্রের ঢেউএর মতো একটি এগিয়ে এসে নিঃশেষ হয়ে অপরটির পথ করে দিচ্ছে। এটি অবশ্য অপর দুটি প্রক্রিয়ার অনিবার্য পরিণাম।

চলার পথেই পরিবর্তনের পথ রচনা ক'রে বিরোধী শক্তি সৃষ্টি হয়, বর্ধিত হয়, পরস্পর দ্বন্দ্ব অবতীর্ণ হয়—পুরাতনকে বাতিল করে নতুনের জন্ম দেয়। বর্তমানের মধ্যেই এইভাবে লুক্কায়িত রয়েছে সুপ্ত ভবিষ্যৎ। সুপ্তকে বিকশিত করতে বিভিন্ন ঘটনা ও আচরণ প্রভাব বিস্তার ক'রে চলে।

বাতিল অর্থ তাই ধ্বংস সাধন নয়। বাতিল অর্থ নির্মাণাত্মক। নতুন অবস্থা পুরাতন অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও পৃথক ব্যাপার নয়। প্রথম থেকে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় এইভাবে ক্রমবিকশিত স্তর ক্রমাগত এগিয়ে চলে। গতির ছন্দই বাতিলের প্রেরণা।

কোন বিকাশই একটি বাতিল না করে অপরটির পথ করে দিতে পারে না। পুরাতনের প্রয়োজনীয় অংশের উপরই বিকশিত সৌধ দিয়ে নতুন জন্মলাভ করে। পুরাতন নতুনের সেবায় এইভাবে কাজে লাগে। ধনতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন শক্তির উপরে দাঁড়িয়েই উৎপাদন সম্পর্ককে বাতিল করে সমাজতান্ত্রিক

সমাজ গড়ে ওঠে। এককোষী প্রাণীর বিভাজনের মধ্যে দিয়েই বহুকোষী প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে। পুরাতন মস্তিষ্ক বল্কল বাতিল হ'য়ে নতুন মস্তিষ্ক বল্কল মানুষের মস্তিষ্ককে করেছে উন্নত। এই ভাবে একটি বাতিল হয়ে আসে নতুন আরেকটি, আবার তাও বাতিল হয়ে গড়ে ওঠে নতুনতর—চলার এই পথ অসীম বিস্তৃত।

পূর্বে উৎপাদকই ছিল উৎপাদন যন্ত্রের মালিক। তারপর উৎপাদকের মালিকানা বাতিল হয়ে গিয়ে সৃষ্টি হ'ল শ্রমিক আর উৎপাদন যন্ত্রের মালিক হল নিরুৎপাদক পৃথক ব্যক্তি। এল ব্যক্তিগত পুঁজিতন্ত্র। আবার ব্যক্তিগত মালিকানা বাতিল হয়ে দেখা দিল সমাজতান্ত্রিক সমাজ। পৃথিবীর শিলাস্তর একের পর এক পুরাতনকে বাতিল করে নতুন নতুন স্তরভাগ গড়ে তুলেছে। অর্থ ব্যয় করে দ্রব্য কিনলে অর্থ বাতিল হয়ে আসে দ্রব্য। তাকে আবার বিক্রি করলে সংগৃহীত হয় অর্থ। প্রথম বাতিল থেকে দ্বিতীয় বাতিলের ফলে গৃহীত অর্থ যদি বেশী হয় তবে তার মধ্যে দিয়ে অর্জিত হয় লভ্যাংশ।

মার্ক্সীয় জ্ঞানতত্ত্ব অনুসারে দ্বন্দ্ব যেমন গতির মূল, তেমনি বস্তু হ'ল চিন্তা ও ধারণার মূল। মানুষের জ্ঞান প্রাথমিক ভাবে বস্তু জগতের উপর নির্ভরশীল। নানা অভিজ্ঞতার সার সঙ্কলন ক'রে জ্ঞানতত্ত্বের নানা বৈশিষ্ট্যকে আয়ত্তে আনা সম্ভব। এই সবই পরিশ্রম ও মানসিক চিন্তার ফল। তত্ত্ব ও প্রয়োগের ফল। এ সমস্তই হ'ল, বাস্তবভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বস্তুগত সত্যকে মানসিক চিন্তায় সংকলিত করা। মানুষের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বস্তুধর্ম ও ঘটনার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা—পরস্পর যুক্ত—ক্রমপরিবর্তনশীল এবং গতি সম্পন্ন।

জ্ঞানতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য সমূহ বোঝা সম্ভব কারণ ও প্রতিক্রিয়া, পরম ও আপেক্ষিক, প্রয়োজনীয়তা ও স্বাধীনতা, নির্দেশ্য ও অনির্দেশ্য, মর্মবস্তু ও প্রক্রিয়া, তত্ত্ব ও প্রয়োগ, বিশেষ ও নির্বিশেষ, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু প্রভৃতি উপকরণের পরস্পর সম্পর্ককে অনুধাবন করার মধ্যে দিয়ে।

মার্ক্সীয় অর্থনীতি, ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও জ্ঞানতত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে লেনিনই প্রথম ইতিহাসে এক অভিনব রাষ্ট্রের পত্তন করলেন। রাশিয়ার সেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই পৃথিবীতে নিয়ে এল আজ পর্যন্ত জানা মানব ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত।

মার্ক্স ও লেনিনের উত্থাপিত তত্ত্বে ও প্রয়োগে কোথাও ধর্মীয় কোন চিন্তার লেশমাত্র অস্তিত্ব নেই। বরং তাঁরা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নানা ধর্মের অসারত্বের কথাই তুলে ধরেছেন। মানুষের যাত্রাপথে ধর্মের প্রতিবন্ধকতা এবং ভাবস্তুৎ

মানুষের কাছে ধর্মের নিষ্প্রয়োজনীয়তার কথাই তাঁরা বহুভাবে প্রচার করেছেন।

অথচ দানিকেন তাদের চিত্রিত করেছেন, 'এ যুগের দুজন ধর্মগুরু' হিসাবে। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে বলেছেন, 'এ যুগের বিশেষ একটা ধর্ম'। বলেছেন, 'যখন পড়বে মার্ক্স ও লেনিনের বক্তৃতা তখন হয়ত খুঁজে পাবে এ ধারণাতীত যুগের দুজন ধর্মগুরুকে খুঁজে পাবে এ যুগের বিশেষ একটা ধর্মকে। কী সৌভাগ্য বলুন তো আমাদের।'১(৭৯)

আমরা জানি না সেদিনের মানুষের অর্থাৎ দানিকেনের অনুম্মিত ৭০০০ খৃষ্টাব্দের মানুষের পক্ষে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে আর পাঁচটা ধর্মের মতো একটা ধর্মীয় চিন্তা বলে জানতে পারা তাদের সৌভাগ্যের কারণ হবে কিনা, কিন্তু তা হ'লে আমাদের পক্ষে যে নিরতিশয় দুর্ভাগ্যের কারণ হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

'ধর্ম' কথাটি এখানে বিশেষ একটি চিন্তাধারা বলতে বোঝান হয়েছে কিনা আমাদের পক্ষে তা বলা সম্ভব নয়। তবে মার্ক্স-লেনিনের কথাকে 'ধর্মগুরুর কথা' হিসাবে দেখান নিতান্তই একটা মন্তব্য বলে মনে করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যখন দেখা যায় মার্ক্স ও লেনিনের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মাও-সে-তুং সম্পর্কেও দানিকেন কটাক্ষ করেছেন।

ফ্যাসীবাদী আর বিপ্লবী কাজের একীকরণ: পৃথিবীর ইতিহাসে বহুবার ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ সংগঠিত হয়েছে—তাতে গ্রন্থাগারও আক্রমণের মুখে পড়েছে। বলা বাহুল্য যে তার ফলে বহু প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

তেমনি ধ্বংসের বর্ণনা দিতে গিয়ে দানিকেন চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। হিটলারের ফ্যাসীবাদী আক্রোশের মুখে পড়ে বই পুড়িয়ে ফেলার ঘটনার মতোই ঘটনা ঘটেছে মাও-সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে চীনে—দানিকেনের এমন ধারণা সৃষ্টির চেষ্টাকে বিচ্ছিন্ন ভাবা শক্ত।

লেখক দানিকেন বলেছেন, 'এসব তো শত শত হাজার হাজার বছর আগেকার ঘটনা। কিন্তু মানুষ কি কোন শিক্ষা গ্রহণ করেছে তা থেকে? এই তো সেদিন হিটলারও রাস্তার মাঝখানে বই পুড়িয়েছে। তা ছাড়া ১৯৬৬ সালে মাও-সে-তুঙ কিণ্ডারগার্টেন বিপ্লবেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তবে আজ আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ ছাপাখানার দৌলতে বই আর মাত্র একখানিই নয়।'১(৭৬) এখানে ১৯৬৬ সনের কিণ্ডারগার্টেন বিপ্লব বলতে আসলে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে বোঝান হয়েছে।

স্বেচ্ছাচারী রাজারা অতীতে নানাসময় বই পুড়িয়েছে। এযুগে হিটলারও

এমন দুষ্কর্ম করেছে। তবে কমিউনিস্ট চীনেও এমন ঘটনা ঘটেছে এবং মাও-সে-তুঙ এর নেতৃত্বেই তা ঘটেছে এমন অভিযোগ কখনও শোনা যায় নি। সাধারণ পাঠকের কাছে, দুটি ভিন্নধর্মী সমাজব্যবস্থায় একই ধরনের কার্যক্রমকে তুলে ধরার এই চেষ্টাকে স্বাভাবিক উদ্দেশ্যহীন বলে মনে করা দুষ্কর। প্রথমতঃ ঘটনা হিসাবে ১৯৬৬ সনের চীনে এমন বই পোড়ানোর ঘটনাকে তুলে ধরা সত্যের অপলাপ। দ্বিতীয়তঃ হিটলারের কার্যকলাপের সাথে তার তুলনা নিশ্চিতভাবে কোন অভিসন্ধির পরিচায়ক।

হিটলার এবং স্তালিনকে একই ধরনের দুই স্বেচ্ছাচারী সমর নায়ক হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা হয়ে এসেছে এতকাল। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করেছে স্তালিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াই হিটলারের ফ্যাসীবাদকে ধ্বংস করেছে—ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ পরাজিত হয়েছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কেঁচোর মতো কুঁকড়ে গিয়েছে আর আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ নতুন রণাঙ্গন না খোলার পলায়নী মনোভাব নিয়েছে। নতুন কথার ঝুলি থেকে দানিকেন আজ হিটলারের সঙ্গে মাও-সে-তুঙকে একাসনে দাঁড় করানোর কথা শোনালেন।

ফ্যাসীবাদ আর চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লব লক্ষ্যে, গুণে চরিত্রে যে কেবল পৃথকই নয়, সম্পূর্ণ বিপরীতে তাদের অবস্থান, এ সম্পর্কে দুই একটি কথা তুলে ধরলে পাঠকের কাছে এই মন্তব্যের পিছনের অভিসন্ধি সম্পর্কে অনুধাবন করা সহজ হবে।

ফ্যাসীবাদ হ'ল, বুর্জোয়া একনায়কত্বেরই একটি চরম পর্যায়। পুঁজিপতি শ্রেণী যখন প্রচলিত পথে শোষণ ব্যবস্থা কায়েম রাখতে পারে না তখন পৈশাচিক আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করে। কেন্দ্রীভূত পুঁজি আক্রমণের মাধ্যম হিসাবে রাষ্ট্রশক্তিকে উৎশীড়নের চরম পর্যায়ে নিয়ে আসে। ইটালী, জার্মানী, জাপান স্পেন সেই পর্যায়ে পৌছেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কলঙ্কময় অধ্যায় রচনা করেছে।

চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লব হ'ল শোষণব্যবস্থার বিরুদ্ধে আরব্ধ লড়াই এর একটা উচ্চতর পর্যায়। প্যারী কমিউনে ঘটেছিল শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রস্থাপনের প্রথম দৃষ্টান্ত। তা ছিল ব্যর্থ প্রচেষ্টা। অক্টোবর বিপ্লব হ'ল, শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র স্থাপনের সর্বপ্রথম সফল প্রচেষ্টা। সাংস্কৃতিক বিপ্লব হল, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বাধীন ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য লড়াই। শ্রমিক শ্রেণীর আজ পর্যন্ত এই তিন ধরনের লড়াই এর উদাহরণ রয়েছে। বলা বাহুল্য এই লড়াইগুলির লক্ষ্য বুর্জোয়া চিন্তা, বুর্জোয়া ক্ষমতার উৎস ও দখলদারী ধ্বংস করা। এই ধ্বংস হ'ল, অতীতের সুমহান অগ্রগতির উপর দাঁড়িয়ে আগামী অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করার জন্য।

হিটলার ১৯৩৯ ঘোষণা করেছিলেন ফ্যাসীবাদী যুদ্ধের কারণ। তাতে বলা হয়েছিল, '...আমার এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য একমাত্র ভূমি দখল করা নয়, শত্রুকেও দৈহিকভাবে নির্মূল করা। অতএব যারা এই নীতির বিরুদ্ধে একটিমাত্র শব্দও উচ্চারণ করবে তাদেরকে গুলি করে মারার জন্য নির্দেশ দিচ্ছি। আপাততঃ কেবলমাত্র পূবদিকে পোলিশ বংশজাত এবং পোলিশ ভাষাভাষী সমস্ত নরনারী ও শিশুকে কিছুমাত্র মমতা ও করুণা না দেখিয়ে হত্যা করার জন্য আমি আদেশ দিয়েছি। কারণ একমাত্র এভাবেই আমরা আমাদের বাসভূমির জন্য জায়গা পেতে পারি।'

হিটলারের দোসর, ফ্যাসীবাদের প্রথম উদ্গাতা মুসোলিনী এই যুদ্ধকে দেখেছিলেন জাতির স্বার্থে নয় ব্যক্তির কর্তৃত্বের ফল হিসাবে—যা স্বৈরাচারীর পক্ষে ভাবা খুব স্বাভাবিক ছিল। যাঁর মতে 'যুদ্ধ সর্বদাই একটি পার্টির যুদ্ধ যে পার্টি যুদ্ধ চায় তার যুদ্ধ এবং এটা সর্বদাই কোন একক মানুষের যুদ্ধ—যে মানুষ যুদ্ধ ঘোষণা করেন তার যুদ্ধ।' ফ্যাসীবাদের দুই নায়ক গোটা মানবজাতির উপর যে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় এই ছিল সেই ফ্যাসীবাদী যুদ্ধের মর্মার্থ। যা বই পোড়ানোকে কোন ঘটনার হিসাবের মধ্যেই আনত না।

চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নির্দেশনামা ঘোষিত হয় ১৯৬৬ সনের আগস্ট মাসে। তাতে ষোলটি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এক। পুরানো ধ্যান-ধারণা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অভ্যাসদ্বারা পরিচালিত চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত বুর্জোয়া পথের অনুসারীদের সমালোচনা করা, সংশোধন করা ও প্রয়োজনে পদচ্যুত করা।

দুই। সর্বত্র ও পার্টির ভিতর বুর্জোয়া চিন্তার অনুসারীদের বিরুদ্ধতা করতে জনগণের ভিতরকার বিপ্লবী শ্রেণীগুলির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

তিন। নেতৃত্বের চরিত্রে চাররকম বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব রয়েছে—বিপ্লবী ধারা অনুসরণকারী, সাহসের অভাবে উপযুক্ত নেতৃত্বের চরিত্রের অভাব অনিচ্ছাকৃত ও অজ্ঞতার কারণে ভ্রান্তপথ অনুসরণকারী, ইচ্ছাকৃত বুর্জোয়া ধারণা অনুসরণকারী। এই সমস্ত অবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে মোকাবিলা করা।

চার। জনসাধারণের ব্যাপক অংশকে বিপ্লবী চিন্তা ও দর্শনে শিক্ষিত করা।

পাঁচ। শতকরা ৯৫ জন সৎ ও একনিষ্ঠ কর্মীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

ছয়। জনসাধারণের ভিতকার বিরোধমূলক ও অবিরোধমূলক চিন্তাধারার দ্বন্দ্ব সঠিকভাবে প্রয়োগ ও পরিচালনা করা।

সাত। যারা বিপ্লবী জনগণকে প্রতিবিপ্লবী আখ্যা দেয় তাদের বিরুদ্ধতা করা।

আট। ক্যাডার ও সাধারণকর্মীদের ভিতরও চাররকম বৈশিষ্ট্য অনুসারে, ভাল, তুলনামূলক ভাল, বিপ্লব-বিরোধী নয় এবং বিপ্লব-বিরোধী বা পার্টি-বিরোধী এই চাররকমের বিভাগ সম্পর্কে সঠিক নজর রাখতে হবে।

নয়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবী গ্রুপ, কমিটি ও কংগ্রেস হ'ল জনগণের সংস্থা। এগুলিকে না ভেঙে স্থায়ী রূপদান করা।

দশ। শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা। শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে শিল্পশ্রম, কৃষিকার্য সামরিক জ্ঞান ও বুর্জোয়া চিন্তার সমালোচনাকে অন্তর্ভুক্ত করা।

এগার। পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তার পরামর্শ ও নির্দেশ মতো বিশেষ বিশেষ সংবাদপত্রের নাম ধরে সমালোচনা করা।

বার। বৈজ্ঞানিক-কারিগরি ও সাধারণ কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভাবে ঐক্য, তারপর সমালোচনা ও অবশেষে ঐক্যবদ্ধ হবার নীতি প্রয়োগ করা।

তের। শহর ও গ্রামাঞ্চলের আন্দোলনের মধ্যে যোগসূত্র সাধন।

চোদ্দ। শ্রেণীসংগ্রামকে আঁকড়ে ধরে উৎপাদন বাড়িয়ে যাওয়া।

পনের। সামরিক লাল বাহিনীর ভিতরও সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে নিয়ে যাওয়া।

ষোল। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাও সে তুঙ চিন্তাধারাকে সর্বস্তরে, সমস্ত ক্ষেত্রে অনুসরণ করে এগিয়ে যাওয়া।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এই কার্যক্রম ছিল পার্টি, গণফৌজ এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় বুর্জোয়া পথের অনুসরণকারীদের সমালোচনা করা, সংশোধন করা নয়তো পদচ্যুত করার জন্য এর লক্ষ্যও ছিল মতাদর্শগত ভাবে দুই লাইনের চিন্তাকে জনসাধারণের স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত করা। হিটলারের পরিকল্পিত বই পোড়ানোর ঘটনা এই কার্যক্রমের সঙ্গে যেমন সম্পর্কযুক্ত নয়, আর তেমন ঘটনার কোন ঐতিহাসিক নজিরও নেই এই বিপ্লবী কার্যক্রমে।

হিটলারের ফ্যাসীবাদী কার্যক্রম হ'ল, এ পর্যন্ত মানব ইতিহাসের জঘন্যতম নারকীয় ঘটনার চরম রূপ। কেবল হত্যাকাণ্ড আর অত্যাচার চালানোর জন্যই হিটলারের ছিল বিরাট বিরাট পরিকল্পনা।

কেবল অসামরিক লোককে হত্যা ও তাদের উপর অত্যাচার চালানোর জন্য হিটলারের জার্মানীতে ছিল ১০০০ বন্দী নিবাস। হত্যার পূর্বে বন্দীদের গা থেকে গয়না জামা কাপড়, মাথার চুল এমন কি গায়ের চামড়া পর্যন্ত খুলে নেওয়া হ'ত। কখনও কখনও গায়ের রক্তও বের করে নেওয়া হ'ত। গিনি-পিগের বদলে মানুষকে গবেষণার জন্য ব্যবহার করা হত।

বন্দী হত্যার একটা অসম্পূর্ণ হিসাব দেওয়া যেতে পারে তা থেকে ফ্যাসী-বাদের অমানবিক চেহারার স্বরূপ ধরা যেতে পারে।

চেলমনে মৃত্যু শিবির—গ্যাসে বা পুড়িয়ে মারা হয়—	৩ লক্ষ ৬০ হাজার	বন্দী
ট্রেবালক্কা „ „ „	৭ লক্ষ ৫০ হাজার	„
পোলাণ্ডে সমাধিকৃত মৃতদেহ পাওয়া যায়	৭ লক্ষ	„
জার্মানীতে হত্যা করা হয় এমন মৃতদেহের সংখ্যা	১ কোটি ২০ লক্ষ	„
পোল ও ইহুদী বলে হত্যা করা হয়	৬০ লক্ষ ২৮ হাজার	„
আউসভিৎস মৃত্যু শিবিরে চুল্লতে হত্যা করা হয়	৪০ লক্ষ	„
জাউথাইসান বন্দীশিবিরে রাজবন্দী হত্যা করা হয়	৪০ লক্ষ	„

অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে নিহত লোকের থেকে বেশী লোককে ফ্যাসিস্টরা কেবল খুন করেছে। ইংলণ্ড জয় করলে সমস্ত বৃদ্ধ ও শিশুদের হত্যা করা হবে বলে হিটলারের সিদ্ধান্ত ছিল। প্রথমে হত্যাকাণ্ড শুরু করা হবে যাদের নিয়ে তার এক লিস্টে ২০০০ জনের নাম ছিল। তার মধ্যে এলডুস হাক্সলি, উইনস্টন চার্চিল, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি ব্যক্তির নাম ছিল প্রথমের দিকে।

এই ফ্যাসীবাদী শক্তির পক্ষে বই পোড়ানো ছিল একটি সাধারণ ঘটনা মাত্র। কার্যতঃ হিটলারের নির্দেশে প্রায় ২০ হাজার বই পোড়ান হয়। এই কাজ করা হয়েছিল লিস্ট তৈরি করে বিভিন্ন লাইব্রেরী থেকে বইগুলি সংগ্রহ ক'রে। মানব সভ্যতার এই জঘন্য শত্রুকে যখন কোন শক্তিই প্রতিহত করতে পারছিল না এবং ইংলণ্ড, আমেরিকা পরোক্ষভাবে এমনকি জার্মান কর্তৃক রাশিয়ারও পরাজয় আশা করেছিল তখন শোষণভিত্তিক সমাজের গোটা দুনিয়ার বিরুদ্ধে একা লড়েছিল স্তালিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া। বিজয় অর্জনের মধ্যে দিয়ে মানব সমাজকে এক বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্রই।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব হ'ল, সমাজতান্ত্রিক দেশে মানবজাতির ভিতরকার দুই মতাদর্শের লড়াই। শোষণকে সর্বস্তরে ফিরিয়ে আনার বুর্জোয়া মতাদর্শ আর শোষণ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার সর্বহারা-মতাদর্শের লড়াই। সুতরাং 'মাও

সে তুঙ-এর বই পোড়ানো'র ঘটনা কী করে সেখানে দানিকেন আবিষ্কার করলেন আর হিটলারের কাজের সঙ্গে তাকে তুলনীয় করে দেখালেন, তা বোঝা দুষ্কর।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবে মাও সে তুঙ-এর কয়েকটি আহ্বান ছিল যা অভূতপূর্ব—ইতিহাসকালে যা কোনদিন শোনা যায় নি। গতানুগতিক চিন্তা দিয়ে তাকে বোঝাও কঠিন। এই অভূতপূর্ব চিন্তাধারাই দুনিয়াব্যাপী বুর্জোয়াদের সমস্ত ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে। তার ফলকে নস্যাৎ করতে তাই চীন দেশের ভিতরে ও বাইরে অজস্র প্রচেষ্টা চলবেই। দানিকেনের এ মন্তব্য সেই সমস্ত চেষ্টারই অঙ্গ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মাও সে তুং চীনের সর্ব্বোচ্চ নেতৃত্ব থেকে আহ্বান জানিয়েছিলেন বিদ্রোহ করা যুক্তিসঙ্গত, বিশৃঙ্খলা যতো বাড়বে দ্বন্দ্ব ততোই পরিস্ফুট হবে এবং আরো সহজভাবে সমস্যার সমাধান করা যাবে। তিনি একটা দেশের কর্ণধার হয়েও আহ্বান জানান, সদর দপ্তরে কামান দাগো; শ্রেণী সংগ্রাম আঁকড়ে ধরে উৎপাদন বাড়িয়ে যাও। পৃথিবী ইতিপূর্বে এই ধরনের ঘটনাবলী কখনো প্রত্যক্ষ করে নি। আর প্রকৃতই এই নতুন চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছিল প্রতিটি কার্যকলাপে। যেমন:

(১) শ্রেণী অর্থ জন্মগত বা উৎপাদনে হাতিয়ারের মালিকানাগত ব্যাপার থেকে সাংস্কৃতিক বিপ্লবে নতুন অর্থ নিয়ে দেখা দিল। বুর্জোয়া চিন্তা, আচরণ, কার্যকলাপ দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থের অনুসারীদের খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে বুর্জোয়া সাংস্কৃতিক বোধের অস্তিত্বকে মোকাবিলা করা প্রয়োজন। শ্রেণীসংগ্রাম এই অর্থে আগের থেকে অনেক সম্প্রসারিত অর্থ পেল।

(২) সেনাবাহিনীতেও শ্রেণীসংগ্রাম নিয়ে যেতে হবে। কেবল হুকুম তালিমের জড় বৈশিষ্ট্য থেকে সেনাবাহিনীকে সুস্থ চিন্তার আশ্রয় সহজ হিসাবে গড়ে তোলার ব্যাপক চেষ্টা হল, সেনাবাহিনী ব্যাপকভাবে রাজনীতি করতে অভ্যস্ত হ'ল।

(৩) পার্টি ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদ থেকে ভ্রান্তচিন্তার অনুসরণকারীদের অপসারণই যথেষ্ট নয়, প্রত্যেকের মাথায় যে অতীতের থেকে চলে আসা ভ্রান্ত চিন্তা রয়ে গিয়েছে সেখানেও দ্বন্দ্ব তুলতে হবে। সাংস্কৃতিক বিপ্লব এই অর্থে সমস্ত পুরনো চিন্তার সঙ্গে বিপ্লবী চিন্তার দ্বন্দ্ব হয়ে দাঁড়াল।

(৪) শিক্ষার গতানুগতিক সীমা ভেঙে দিয়ে সেখানে শিল্পগত, কৃষি

সম্পর্কীয় এবং সামরিক শিক্ষার সূচী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ছাত্রদের ভিতর থেকেই দুই লাইনের মতাদর্শগত আলোচনা শুরু করতে হবে। মানসিক শিক্ষাকে কায়িক শিক্ষাকর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত করার শিক্ষাকে শ্রেণীবোধ সম্পন্ন দ্বান্দ্বিক মতাদর্শের অনুসারী করার পথ গৃহীত হ'ল সাংস্কৃতিক বিপ্লবে।

(৫) উৎপাদন ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সংগ্রাম সমস্ত স্তরে শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে সমন্বিত করার দিকে অগ্রসর হ'ল সাংস্কৃতিক বিপ্লবে।

(৬) রাজনীতি স্থান পেল সবকিছুর উর্ধ্বে।

এই অভিনব সাংস্কৃতিক বিপ্লবে বই পোড়ানোর কোন অবকাশ ছিল না। দানিকেন অতীতের কলঙ্কময় গ্রন্থাগার পোড়ানোর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এবং আক্ষেপ করেছেন, 'এ সব তো হাজার হাজার বছর আগেকার ঘটনা কিন্তু মানুষ কি কোন শিক্ষা গ্রহণ করেছে তা থেকে?' এর মধ্যে দিয়ে তিনি বলতে চেয়েছেন, মাও সে তুঙও কোন শিক্ষাগ্রহণ না করে ১৯৬৬তে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন।

চীনে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বক্সারের বিদ্রোহের পর বিজয়ী ইংরাজ মিং সম্রাট ইয়াং লোর বিখ্যাত গ্রন্থাগার ভস্মীভূত করে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বহু কলঙ্কময় কার্যকলাপের মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দানিকেন চীনের এ ঘটনার উল্লেখ না করে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কার্যকলাপে বই পোড়ানো খুঁজে বের করেছেন।

লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হবার পর বলশেভিকদের অনেকে জারের সঙ্গে অভিন্ন অত্যাচারী বলে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। ফ্যাসীবাদের গ্রাস থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার লড়াই-এ নেতৃত্বদানকারী স্তালিনকে স্বদেশে ও বাইরে অনেকে হিটলারের সঙ্গে অভিন্ন রূপে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এ সবই হ'ল, পৃথিবীতে দুই লাইনের চিন্তাকে একাকার করে দেবার প্রচেষ্টা। আজ বৈজ্ঞানিক আলোচনায় হিটলার ও মাও সে তুঙ-কে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে দানিকেন সেই একই মনোভাবের পরিচয় দিলেন।

হিটলার ও মাও সে তুঙ যখন বই পোড়াচ্ছেন বলে দানিকেনের চোখে পড়েছে, তখন তিনি দেখিয়েছেন কী ভাবে আমেরিকাতে জ্ঞানালোককে সুরক্ষিত করার চেষ্টা হচ্ছে। '১৯৬৫ সালে আমেরিকানরা দুটি 'মহাকাল কোষ' পুঁতে-ছিলেন নিউইয়র্কের মাটিতে...। সে দুটো কোষ মারফৎ আমাদের অতিদূর উত্তর পুরুষের কাছে পৌঁছে যাবে এ কালের সব খবর।'১(৭৭) দানিকেন আনন্দ

প্রকাশ করেছেন 'এ কথা ভাবতেও ভাল লাগে যে পাঁচহাজার বছর পরের মানুষের কথা ভাববার মতো মানুষ আমাদের ভেতরেই রয়েছেন।'

দানিকেন অতীত আর ভবিষ্যৎ নিয়ে বিস্তর ভেবেছেন। আর ভেবেই ১৯৬৫ সনের আমেরিকা আর ১৯৬৬ সনের চীন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। হয়ত অতীত আর ভবিষ্যৎ নিয়ে একটু বেশী ভাবতে গিয়েই বর্তমান সম্পর্কে একটু গোলমাল করে ফেলেছেন।

ধর্মের সেবায় বিজ্ঞানের নিয়োগ

ধর্মের দেবতা অসীম ক্ষমতার অধিকারী। বিভিন্ন পুরাণে, আদিবাসীর প্রচলিত গল্পে, ধর্মীয় গ্রন্থে দেবতার সম্পর্কে নানান কাহিনী প্রচলিত। দানিকেন সেই সমস্ত আদিম কল্পনা, পুরাকাহিনীকে প্রাচীন ঘটনা বলে দেখতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আজ পৃথিবীর সর্বত্র খনন কার্য চালিয়ে দেখা যাচ্ছে কিংবদন্তী আর ঘটনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পেরুতে খোঁড়াখুঁড়ি করার পরে কি একজন খৃস্টানও মানবেন, প্রাক্ ইঙ্কা সংস্কৃতির ঈশ্বর আর অনাদি অনন্ত ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন।'১(৬২) খৃস্টানরা না মানলেও দানিকেন একথা যারা মেনে নিয়েছেন যে প্রাক্ ইঙ্কারা বা দেশে দেশে প্রাচীন কাহিনীকারেরা যে দেবতার কথা বলে এসেছেন সেই দেবতার অস্তিত্ব ছিল। আর এই দেবতারা হ'ল সেই মহাকাশ থেকে আসা আগন্তুকেরা। সুতরাং ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব আছে ঐ মহাকাশচারীদের মধ্যে অনন্ত-আদি ঈশ্বরের কোন বাস্তব পৃথক অস্তিত্ব নেই।

লেখক দানিকেন বলেছেন, 'হাজার হাজার বছর আগে দূর আকাশের কোন গ্রহ থেকে এসেছিল নভশ্চরের দল পৃথিবী পর্যটনে এ তত্ত্বকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকি। আমরা জানি সেদিন আমাদের সরল আদিম প্রপিতামহেরা বুঝতে পারে নি, নভশ্চরদের প্রগাঢ় প্রযুক্তি জ্ঞান নিয়ে তারা কী করবে। 'স্বর্গ' থেকে নেবে আসা নভশ্চরদের তারা দেবতা মেনে পূজো করেছে।'১(৪০)। দানিকেনের সমগ্র তত্ত্বের মূল সুর এইটি। সেই দেবতারা আছে পুরাণে, ধর্মে, প্রাচীন অঙ্কনে, প্রাগৈতিহাসিক স্থাপত্যেও। তারই ধারাপথে ধর্মের দেবতারা আজো বিদ্যমান। এই বক্তব্যের বস্তুবাদী একটি দিক রয়েছে। এতে রহস্যময় দেবতার একটা বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। ধর্মীয় চিন্তার ভাববাদী খোলসকে ভেদ করে বস্তুবাদী অবস্থান জানা গেল। এই অর্থেই তিনি ধর্মকে কুহেলিকা থেকে মুক্ত করে কার্যকারণ সম্পর্কের উপর দাঁড় করাতে

গিয়েছেন। বলেছেন, 'অযৌক্তিক ধর্মমত দিয়ে অতীতে পাড়ি দেবার পথ আটকানো আর সম্ভব নয়।'১(৬২)

ধর্মমতগুলি যে অযৌক্তিক, এই কথা প্রমাণের জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে ইতিহাসকে দেখার চেষ্টা বহু হয়েছে। দানিকেনের মহাকাশের আগন্তুকেরা যদি সেই চেষ্টায় আরেকটা আলোর নিশানা হ'তে পারত তবে নিঃসন্দেহে তাতে মানব জাতির উপকার হ'ত। কারণ ধর্মমতগুলি এখনও মিথ্যা কতকগুলি ধারণার উপর দাঁড়িয়ে মানুষের আত্মমর্যাদাকে খাটো করে রেখেছে।

অথচ দানিকেন কি করলেন? অজস্র যুক্তি, তথ্য সন্নিবেশ করে যাকে দাঁড় করাতে চাইলেন তা যখন ধর্মের সৌধকে ভেঙে ফেলার উপক্রম করেছে তখন দানিকেন এগিয়ে এসেছেন 'অযৌক্তিক ধর্মের' রক্ষাকল্পে। তিনিই আক্ষেপ করে বলেছেন, 'যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী হ'তে আমাদের আত্মসম্মানে বাধে।'১(১৬) অথচ ধর্মকে যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী নিরিখে দাঁড় করাতে গিয়ে নিজেই ইতস্ততঃ করেছেন। অবশেষে যুক্তিবাদী, বস্তুবাদী, বৈজ্ঞানিক দানিকেন ধর্মের রক্ষাকর্তা হয়ে এগিয়ে এসেছেন, 'তা হ'লে কী আমাদের করণীয়? মন্দির, মসজিদ কি সব গুঁড়িয়ে ফেলব? নিশ্চয়ই না।'৩(১৭৩) দেবতা অর্থই যখন হয়ে দাঁড়াল গ্রহান্তরের নভশ্চর তখনও মন্দির, মসজিদ, চার্চ, প্যাগোডার মনগড়া পূজার্চনার পক্ষেই তিনি এসে দাঁড়ালেন। অথচ এ দায়িত্বটুকু কিন্তু তিনি না নিলেও পারতেন। তাঁর আবিষ্কার জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় কী প্রভাব বিস্তার করবে সেটা দেখা তো তাঁর কাজ নয়। তথাপি ধর্মের মহিমার স্বপক্ষে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন।

ধর্মচিন্তা মানুষকে যতো সঙ্কীর্ণ ও খর্ব করে রেখেছে অন্য কোন কিছু মানুষকে তেমন করতে পারে নি। চিন্তাভাবনা, উদ্যম ও আত্মবিশ্বাসকে সবচেয়ে বেশী পঙ্গু করেছে দেশে দেশে নানান ধর্মচিন্তা। বিজ্ঞান এসে যখন মানুষকে আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হ'তে শক্তি জোগাচ্ছে তখন আবার ধর্মকে বিজ্ঞানের নাম করে রহস্যজালে প্রহেলিকাময় করে তুলে ধরার চেষ্টা নানাভাবে হচ্ছে, দানিকেনও সেই চেষ্টার শরিক হয়েছেন।

ধর্মভাবের মূল উদ্দেশ্য হ'ল আত্মসমর্পণ করা। অসীম ক্ষমতার অধিকারী মানুষ অসীম ক্ষমতার অধিকারী কারো কল্পনা করে নিয়ে তাঁর পায়ে নিজেকে সঁপে দিয়ে, তার বলে বলীয়ান হবার আকাঙ্ক্ষা করে ধর্ম। ধর্মের আবশ্যক শর্ত হ'ল অজ্ঞানতা, অসহায়তা আর ভয়। ধর্মবোধই মানুষকে নিমিত্ত ক'রে

তোলে। অতিমানবীয় শক্তির ক্রীড়নক হিসাবে মানুষকে চিহ্নিত করে। মহাকাশ বিজ্ঞানী দানিকেন প্রকারান্তরে তো বটেই সরাসরিও সেই রকমই বলতে চেয়েছেন, 'এ কথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে মানুষের জগতে এই স্বর্গীয় আবির্ভাব অলীক নয়। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মপ্রচারক আপন মতবাদ প্রচার কালে বলেছেন, যে বাণী তিনি প্রচার করছেন সে বাণী, ধর্মের সে অনুশাসন তাঁর নয়। তার মস্তিষ্কে হঠাৎ-জাগা কোন চেতনা, না হয় তার অন্তর্লীন কোন স্বর্গীয় শক্তি—দেবতা, ঈশ্বর, মহাপ্রভু—তাঁকে দিয়ে একাজ করিয়ে নিচ্ছেন। প্রচারক নিমিত্ত মাত্র। মনুষ্য সমাজকে তাঁরা বার বার বোঝাতে চেয়েছেন। জড়বিজ্ঞান এবং পার্থিব কৃতিত্ব অনেক উর্ধ্ব স্তরের কালাতীত এক মহান শাশ্বত বাণীই তাদের উপলব্ধি। কিন্তু প্রচারকদের সবাই কিন্তু ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেন নি, বরং কারুর অতিমানস চেতনায় যোগাযোগ ঘটেছে ঈশ্বরের সঙ্গে।'৫(৩০৭) বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের মধ্যে ধর্মের পক্ষে এমন সরাসরি ওকালতি বিস্ময়কর।

পৃথিবীতে যে কয়টি প্রধান ধর্ম দেখতে পাওয়া যায় তার বর্তমান স্বরূপে কিছু কিছু মৌলিক মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও অতীতে ধর্মের উৎপত্তির প্রাথমিক স্তরে তা ছিল না। আজকে সব ধর্মের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যাবে এক ধরনের অতি প্রাকৃত শক্তির প্রতি বিশ্বাস। এই অতি প্রাকৃত শক্তিই বিশ্বকে চালনা করে। সেই শক্তির কাছে প্রার্থনা করলে আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ ঘটে। ভগবানের অস্তিত্ব, তার কাছে প্রার্থনা বা পূজা, পাপুণ্যের কথা, মৃত্যুর পর ভগবানের দরবারে উপস্থিতি এগুলি সব ধর্মের কথাতেই পাওয়া যাবে।

ধর্মকে দুইভাগে দেখা যেতে পারে। প্রথমতঃ সামাজিক ঘটনাবলী অনুষ্ঠানাদি হিসাবে ধর্মকে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। ধর্ম পারিপার্শ্বিকতার ফল, মৌলিক মানসিকতা বা একাধিক মানসিকতার ফল কিংবা সামাজিক অবস্থার অনিবার্য ফল হিসাবে ধর্মকে দেখা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ বিচারবুদ্ধি দিয়ে ধর্মকে দার্শনিক ভাবে দেখা যেতে পারে। জগতের চরম সত্তা ও তার সঙ্গে মানবমনের সম্পর্ক, আত্মার অবিনশ্বরতা ও মুক্তি, পাপপুণ্যবোধ প্রভৃতি সম্পর্কে যুক্তি, বুদ্ধি বিচারের মধ্যে দিয়ে ধর্মকে অনুধাবন করা যেতে পারে।

বর্তমানে ধর্মীয় চিন্তা প্রধানতঃ দ্বিতীয় ভাবেই করা হয়ে থাকে। অতীতে ধর্মচিন্তা যে এমন ছিল না তার অজস্র ঐতিহাসিক নজির রয়েছে। প্রাচীন সমাজে এবং বর্তমানেও যে সব সমাজ এখনও পিছিয়ে পড়ে আছে সেখানে ধর্মের স্বরূপ কখনই বিচারবুদ্ধিমূলক ছিল না, তা ছিল প্রত্যাদিষ্টমূলক।

যাকে ইন্দ্রজাল বলা হয় তার প্রচলন যে প্রাচীন সমস্ত সমাজেই ছিল তার প্রমাণ মেলে বিস্তর। শিকার করতে যাবার আগে বা শস্য বপন করবার প্রাক্কালে আকারে অনুষ্ঠানে মনের ইচ্ছাকে ব্যক্ত করা হ'ত। ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ ঘটাতে এই জাতীয় অনুষ্ঠান করা হতো।

ইন্দ্রজাল দু'ভাগে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন সমাজে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির স্বল্পমানের জন্য তারা ঘটনাবলীর মিলকেই শুধু অনুসরণ করত। তার পিছনের কারণকে ধরতে পারত না। হাঁচি দিলে কোন কাজ পণ্ড হ'তে দেখলে কাজ পণ্ড হবার পেছনে হাঁচিকে কারণ হিসাবে গ্রহণ করা হ'ত। এইভাবে দেখা যায় ইন্দ্রজালের দুটি উৎস ছিল। এক, একইরকম জিনিস একই ফল বয়ে আনে বলে ভাবা। দুই, একসঙ্গে থাকার সময় যে কার্যকলাপ ঘটে পরস্পর ছাড়াছাড়ি হলেও তেমন ঘটনাই ঘটতে পারে বলে মনে করা। যেমন তর্পণ করা।

উভয় ধরনের ইন্দ্রজালই প্রাকৃতিক নিয়মের অনুকরণ, ঘটনার যোগাযোগ ও বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে সৃষ্টি হয়েছিল। এই অর্থে বিজ্ঞানের ব্যর্থ প্রকাশ বলা যেতে পারে ইন্দ্রজালকে। অনুকরণ বা ঘটনার যোগাযোগ সম্পর্কীয় সমস্ত ইন্দ্রজালই কার্যক্ষেত্রে কিছু করা ও ফললাভ সাধারণভাবে 'জাদুবিদ্যা' এবং কিছু না করার পরিণামে কোন ফললাভ সাধারণভাবে 'নিষিদ্ধ' বা ট্যাবু—এই দু'ভাবে প্রচলিত হয়ে আছে সমস্ত সমাজে। কয়েকটি উদাহরণ মনে করা যেতে পারে :

(১) ভালবাসা পাবার জন্য পুরুষেরা কাদার নারীমূর্তি তৈরি ক'রে তার বুকে রেশমের সুতা দিয়ে বাঁধা পালকের তীর দিয়ে বিদ্ধ করত। নারীর হৃদয়ে এই আঘাত তার ভালবাসার আঘাত হিসাবে ভাববার ইচ্ছা এর মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হ'ত।

(২) নারী-পুরুষের দৈহিক মিলন প্রাক্ উৎপাদনী ঘটনা হিসাবে মনে করার ফলে ক্ষেতে বীজ রোপণের পর অনেক সমাজেই নব বিবাহিত দম্পতিকে রাত্রে ক্ষেতের মাঝখানে যৌনকার্যে লিপ্ত হ'তে আদেশ করা হত। প্রত্যাশা, যে তাদের সন্তান সৃষ্টির মতোই যেন ফসল উৎপন্ন হয়।

(৩) ইঁদুরের মতো সুন্দর দাঁত হবার মানসে পড়ে যাওয়া দাঁত ইঁদুরের গর্তে ফেলার প্রথা।

(৪) বন্ধ্যানারীর ব্যবহৃত সমস্ত দ্রব্যাদি দূরে পাথুরে জমিতে ফেলে আসা। পাছে সেই দ্রব্যের স্পর্শে মাটির উর্বরা শক্তি কমে যায় এই আশঙ্কা।

(৫) দূরে ভ্রমণরত স্বামী যাতে অভুক্ত না থাকে তার জন্য প্রতিদিনের আহারের এক চতুর্থাংশ স্ত্রীর পাত থেকে ফেলে দেওয়ার প্রচলন।

ঐন্দ্রজালিক এই সমস্ত প্রথাগুলিই সংস্কৃত হয়ে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে স্থান পেয়েছে। কয়েকটি উদাহরণের মধ্যে এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে কীভাবে ঐন্দ্রজালিক উপাদানকে প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় উপাদানে পরিণত করা হয়।

প্রথম: আদিম সমাজে বহুদেশই উদ্ভিদ-গাছকে প্রাণধারণকারী বলে মনে করা হ'ত। গাছের লিঙ্গভেদও কল্পনা করা হত। গাছের প্রয়োজনীয় ভূমিকা থেকে গাছ-পূজাও প্রচলিত ছিল। বর্তমানে প্রচলিত তুলসী গাছের পূজা সেই আদিম ধারণারই বয়ে নিয়ে আসা অভ্যেস। তাকে আধুনিক ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে সমন্বিত করা হয়েছে এই ভাবে যে তুলসীর মূল হ'ল পবিত্র তীর্থ-স্থানের মতো, কাণ্ডতে অবস্থান করেন দেবতারা আর ডালপালাগুলি হ'ল এক এক একটি বেদ। এটি একটি ভারতীয় প্রথা।

দ্বিতীয়: বহুদেশেই বিশেষ করে মধ্য আফ্রিকায় জমিতে বীজ বপনের চারদিন পূর্ব থেকে স্বামীরা স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করত না। সেই বিরহ যন্ত্রণা কাতর উন্মাদনা নিয়ে বীজবপনের দিন তারা জমিতে স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হ'ত। এই আশায় যে ফসল উৎপাদন বেশী হবে। ক্রমশঃ এই প্রথায় দেখা গেছে কিছু লোককে এই আচরণে নিয়োজিত করা হ'ত। তারো পরে ঘটে পুরোহিতদের হস্তক্ষেপ। তারা নিয়ম করে দেয় যে, যার জমিতে বীজ বপন হবে তার স্ত্রীকে নিয়ে পুরোহিত জমিতে গিয়ে সহবাস করবে। এটি না করলে তার উৎপাদন আইনসম্মত হবে না। প্রথমাংশ হল ইন্দ্রজালের ধর্মীয় আচারে পরিবর্তন, দ্বিতীয় অংশ হ'ল ধর্মীয় প্রথাকে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার।

তৃতীয়: দেবতার সঙ্গে মেয়েদের বৌ সাজিয়ে বিয়ে দেওয়া হ'ত অনেক প্রাচীন সমাজেই। রাশিয়ার প্রাচীন সমাজে দেখা গেছে পর পর কয়েক বছর খারাপ ফসলের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কখনও কখনও তারা মনে করেছে দেবতাদের সঙ্গে সময়মতো কনের বিয়ে না দেওয়া। তখন খুব ঘটা করে কনে যোগাড় করে বিয়ের অনুষ্ঠান হ'ত। ধর্মীয় ঠাকুর দেবতার ধারণা যে মানুষী আচার আচরণেরই প্রতিফলন এ থেকে তা অনুমান করা যেতে পারে। রাসযাত্রা অনেকটা তেমনি ব্যাপার।

ধর্মচিন্তা যে ইন্দ্রজালেরই পরিণতি তা বলা না গেলেও ধর্মীয় চিন্তার উৎপত্তির সঙ্গে যে ইন্দ্রজালের সম্পর্ক ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইন্দ্রজালের মধ্যে দিয়েও মানুষের অক্ষমতাকে পূরণ করবার চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে, ধর্মের মধ্যে দিয়েও তাই প্রথমটির ভিত্তি বাস্তব, দ্বিতীয়টির ভিত্তি মনগড়া কল্পনা।

এ ছাড়া ধর্মের উৎপত্তির পূর্বে এবং সঙ্গেও কোন অজ্ঞাত কারণে সমস্ত আদিম সমাজে টোটেম বিশ্বাসের প্রচলন ছিল। প্রতিটি গোষ্ঠী তাদের পূর্বপুরুষের সঙ্গে কোন জন্তুজানোয়ার পাখী গাছপালার সম্পর্ক রচনা করত। এমনি ভাবে কোন নির্দিষ্ট পশুর প্রতি তাদের নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর দুর্বলতা থাকত। সারা পৃথিবীর আদিম সমাজের সর্বত্র এ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাবে। ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে এমনি নাম দেখতে পাওয়া যায়—মৎস্য, প্যাঁচা, কাক, শিগ্রু বা সজনে, আখ, শূনক বা কুকুর, কচ্ছপ বা কাশ্যপ ইত্যাদি।

টোটেম বিশ্বাস ও ঐন্দ্রজালিক প্রাকৃতিক জন্তু ও উদ্ভিদকে সন্তুষ্ট করার প্রথা থেকেই বলিদান, পূজা ও অন্যান্যরকম তুষ্টিবিধায়ক অনুষ্ঠানের প্রচলন দেখা যায়।

ইন্দ্রজাল যেন ধর্মচিন্তার প্রথমভাগ। পৃথিবীতে ইন্দ্রজাল ধর্মচিন্তার থেকে প্রাচীন। এবং ইন্দ্রজালের অস্তিত্ব প্রমাণ করে ধর্ম সমাজের অত্যাবশ্যক কোন বৈশিষ্ট্য নয়। এখনও পৃথিবীতে এমন সমাজ আছে যেখানে কোন ধর্মবোধ নেই কিন্তু ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা সবাই ইন্দ্রজাল অনুসরণ করে এবং মনে করে তারা তাদের বন্ধুদের সেই ভাবে প্রভাবিত করতে পারবে, প্রাকৃতিক বিষয়াবলীকে প্রভাবিত করতে পারবে। কিন্তু ঈশ্বরকে পূজা, বলি দিয়ে সন্তুষ্ট করে কিছু করা যায় বলে তারা বিশ্বাস করে না।

ধর্ম আসলে মানুষের পরবর্তী চিন্তার ফল। বিশেষ ক'রে সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হবার পর অভাব বা বৈষম্যের কারণ হিসাবে ধর্মকে টেনে আনা হয় উদ্দেশ্যমূলক ভাবে। এমন ঘটনা নয় যে অজ্ঞ মানুষের কাছে যেমন আণবিক শক্তি অনাবিষ্কৃত ছিল, পরে তা আবিষ্কৃত হয়েছে; তেমনি ঐশ্বরিক শক্তিও মানসিক বিকাশের পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। আসলে ঈশ্বর মানুষেরই সৃষ্টি। একশ্রেণীর প্রয়োজনে আর অজ্ঞাতমানুষের সান্ত্বনার জন্য ঈশ্বরকে মানুষ নিজের স্বার্থে সৃষ্টি করেছে। ধর্ম ঈশ্বর চিন্তাকে মানুষের মননশীলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ জটিলতায় নিয়ে গিয়েছে।

ধর্মবোধ বলতে বা ধার্মিক জীবন বলতে কোন বিশিষ্ট চিন্তার স্থান নেই। দুটি লোক একইভাবে জীবনযাপন করতে পারে। কিন্তু যে ঈশ্বর ভক্তিতে বা ভয়ে নীতিবোধ পালন করবে সে হবে ধার্মিক আর অন্য কোন মূল্যবোধ থেকে যে পালন করবে সে ধার্মিক হবে না।

বহুক্ষেত্রেই ইন্দ্রজাল ধর্মীয়বোধের মধ্যে মিশে গিয়েছে। ধর্মীয় বোধ

যেহেতু পরবর্তী সময়ের ঘটনা, সেই জন্যই এই মিশ্রণ সম্ভব হয়েছে। সম্ভবতঃ ইন্দ্রজালের ব্যর্থতার উপলব্ধি এবং অতিপ্রাকৃতের ধারণা সৃষ্টির প্রাক্কালে।

মিশরে দেখা যায় দেবতারা মানুষের মতো আত্মার স্বার্থে তাবিজ পড়ত। আইসিস জাদু জানত এবং সেই জন্যই প্রসিদ্ধ দেবতা ছিল। তার ছেলে মারডুক পিতার কাছ থেকে সেই জ্ঞান লাভ করে। মারডুক ওঝার কাজও জানত।

বলতে গেলে সব দেশের দেবতাদেরই অপরিসীম ক্ষমতার চিন্তা সম্ভবতঃ ঐন্দ্রজালিক শক্তিরই বিকশিত ধারণা থেকে আসা সম্ভব। বৃষ্টি, বন্যা, সূর্য কিরণ প্রভৃতি সৃষ্টি করতে যখন মানবীয় ইন্দ্রজাল ব্যর্থ হয়েছে তখন অধিক ক্ষমতার অধিকারী কারো প্রতি ইন্দ্রজালের ক্ষমতা অর্পণের চিন্তা মাথায় আসা খুব স্বাভাবিক। অতিপ্রাকৃত দেবতাদের এভাবে জন্ম হওয়াও সম্ভব।

প্রতিটি দেশেই ধর্মীয় চিন্তায় দেবতাদের গড়ে তোলা হয়েছে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে সংযুক্ত করে। পরে সামাজিক নানা প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে। যেমন জলের দেবতা, আগুনের দেবতা, পাতালের দেবতা, মর্তের দেবতা, সমুদ্রের দেবতা, কর্মের দেবতা প্রভৃতি। হিন্দুদের সম্পদের দেবী, বিদ্যার দেবী, সুন্দরের দেবী প্রভৃতি হ'ল মানুষের প্রয়োজনকে মেটাবার জন্য সৃষ্ট দেবতা।

বৈদিক প্রার্থনা মানুষের সেই মনোভাবকেই প্রতিফলিত করে। একটি, প্রার্থনা, বাতাস সব ঋতু'তেই মধু বহন করে, নদীসমূহ মধুক্ষরণ করে। আমাদের ওষধি সমূহ মধুময় হোক, রাত্রি মধুময় হোক, উষা মধুময় হোক। পৃথিবীর ধূলি মধুময় হোক, আমাদের বনস্পতি মধুময় হোক, সূর্য মধুময় আমাদের নাভিগুলি মধুময় হোক। এখানে প্রতিফলিত হয়েছে ইচ্ছা। অনেকটা ইন্দ্রজালের কাছাকাছি। সরাসরি আবেদন নেই।

আরেকটি প্রার্থনায় বলা হয়েছে, নক্ষত্রপূর্ণ বিশাল অন্তরীক্ষ আমাদের শ্রবণ করুন। মরুদগণ ও নিশ্চল পর্বতগণ হব্যদ্বারা হৃষ্ট হয়ে আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন। আদিত্যগণের সঙ্গে অদিতি আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন। মরুদগণ আমাদের কল্যাণকর সুখদান করেন। এই প্রার্থনায় প্রতিফলিত হয়েছে প্রকৃতিতে দেবত্ব আরোপণ।

দেবতা ও পৃথিবীর ঘটনাবলীকে যুক্ত করার একটি কাহিনী আছে গ্রীক পুরাণে। সেরেজ পৃথিবীর শস্য গাছপালার দেবী। তার মেয়ে পারসেফন। একদিন পাতাল রাজ প্লুটো পারসেফনকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পারসেপনের

দুঃখে সেরেজ ভেঙে পড়েন। তার এমন দুঃখে ভেঙে পড়ায় পৃথিবী গেল শুকিয়ে। কে দেখাশোনা করবে শস্য, গাছপালায় পৃথিবীকে ভরে তুলবে কে? পৃথিবীর মানুষ জুপিটারের কাছে আবেদন করল। জুপিটার আবেদনে সারা দিয়ে বললেন, পারসেপন ফিরে আসবে যদি সেখানে কিছু না খেয়ে থাকে। কিন্তু পারসেপন ডালিম খেয়ে ফেলেছিল। সুতরাং শেষ পর্যন্ত ঠিক হ'ল এই জন্য সে ছমাস পাতালে এবং ছমাস মায়ের কাছে থাকবে। সেই থেকেই পৃথিবীতে ছয়মাস ফুলে ফলে ভরা, আর ছয়মাস শীতে কুজ্ঝটিকায় পৃথিবী নিষ্ফলা।

এ সমস্ত কিছু থেকে দেখা যায় যে ধর্ম ক্রমশঃ যুক্তির উপর ভিত্তি গড়তে শুরু করেছে। আর তা মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত ক'রে। মানুষ যেখানে অক্ষম সেখানেই ঘটছে দেবতার প্রতিষ্ঠা। সেই অক্ষমতা দূর করার জন্যই দেবতারা হয়ে ওঠে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। দেবতা, ঈশ্বরের দার্শনিক ব্যাখ্যা অনেক পরের ব্যাপার। এখনও পর্যন্ত ধর্মবোধের সঙ্গে অলৌকিকের সম্পর্ক টেনেই পৃথিবীর সর্বত্র ধর্ম টিকে রয়েছে। দানিকেন বহু অলৌকিক ব্যাপার নিয়ে কারবার করেছেন। রোগ নিরাময়, মৃতের কণ্ঠস্বর, আত্মার দেহত্যাগ, মৃতের মর্তে আগমন ইত্যাদি বহু বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালিয়েছেন এবং সে গবেষণায় এক পাও অগ্রসর হ'তে না পেরেও অনায়াসে মন্তব্য করেছেন, 'তবু খাঁটি অলৌকিকের দেখা আমি পাই নি। কারুর কাটা হাত-পায়ের জায়গায় নতুন হাত পা গজাবার কথা আজ পর্যন্ত শুনিনি। কিন্তু যেহেতু অঘটন-ঘটন-পটীয়সীদের সবাই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অংশ তাই অমন খাঁটি অলৌকিক ঘটনার সংগঠন তো অসম্ভব হওয়ার কথা নয়, ভেল্কিবাজী হওয়ার কথা নয়।'৫(১৬৪) এখানে দানিকেন যা দেখেন নি তারও সম্ভাব্যতার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন।

ধর্মের সঙ্গে অলৌকিকের যোগাযোগ সাধন না করতে পারলে, ধর্মের তত্ত্বকে গুহার গভীরে না নিয়ে গেলে, ধর্মকে প্রহেলিকাময় করতে না পারলে, ধর্মের ভিত্তিই যায় ঢিলে হয়ে। বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান ক্রমশঃ বিকশিত হবার পথে ধর্মের ভিত্তিকেই নড়বড়ে করে দিচ্ছে। দানিকেন বিজ্ঞানী সেজে—আবার অলৌকিকের প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে এসেছেন। অন্ধকারকে আলোকিত করা যখন বিজ্ঞানের কাজ দানিকেন তখন বিজ্ঞানকে অন্ধকারময় করে তুলতে চাইছেন। আর তা করলেই ধর্মের রাজত্ব আরো কিছুদিন নিশ্চিন্ত হ'তে পারে।

মানুষ ধর্মীয় চিন্তার দিক কবে, কোথায় প্রথম গিয়েছিল, তা জানা আজ

সম্ভব নয়। তবে ধর্ম যে আবশ্যক হিসাবে মানব কাজে দেখা দেয়নি একথা অনায়াসে বলা যায়। ঐন্দ্রজালিক পর্যায়ের পর মানব মনের ক্রমশঃ বিকাশ ও সমাজে শ্রেণীবিভাগ আসার ফলে ধর্মীয় চিন্তা দেখা দেয় এবং একশ্রেণীর প্রয়োজনে তার প্রসার ঘটে।

মানুষের নিজ অস্তিত্ব অনির্দিষ্ট ঘটনাবলী মৃত্যুর পরের সংযোগ সূত্র, মনুষ্য ও প্রাকৃতিক অন্যান্য ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ভাবতে গিয়ে মানুষ দ্বন্দ্বের ভিতর পড়েছে। নিজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা এবং সেই সীমাবদ্ধতা সম্পর্ক সচেতনতা মানুষকে ধর্মচিন্তার কাছাকাছি নিয়ে আসে। এই সময় ইন্দ্রজালের উপর পুরোহিতের হস্তক্ষেপ এবং তাকে ঐশ্বরিক শক্তির সঙ্গে যুক্ত করে ভাবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

বিদ্যুৎতরঙ্গ, সূর্য ওঠা, উল্কাপাত, বন্যা, গ্রহণ, যৌনজীবন ও সন্তান উৎপাদন, মৃত্যু, জরা, ঝড়, রক্তপাত, হৃদরোগে মৃত্যু প্রভৃতি সমস্ত ঘটনাকে কোন সচেতন ক্রিয়ার ফল হিসাবে ভাবা আজও মানুষের পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু আদিম একেশ্বরবাদী এই চিন্তা মানসিক বিকাশের নিচু স্তরে ঐ সমস্ত ঘটনাকে পৃথক পৃথক করে জীবন্ত ভাবার দিকেই নিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। ঐতিহাসিকভাবেও তাই ঘটেছে। অজ্ঞতা, ভয় আর অক্ষমতা থেকেই ঈশ্বর চিন্তার সূত্রপাত। রহস্যের ব্যাখ্যা মেলাতে ভয়ের অবসান ঘটাতে আর অক্ষমতা দূর করতেই ঈশ্বরের জন্ম।

ঈশ্বরকে সৃষ্টি করার পর মানুষের পক্ষে তাকে নিজের মত ভাবাই ছিল স্বাভাবিক। আর সমস্ত দেশের ঈশ্বরেরা তাই মনুষ্য সদৃশ। পরবর্তী সময় মনুষ্য ও ঈশ্বরের অবস্থান কেবল ক্ষমতার কম বেশীর উপর পার্থক্য রচনা করেছে। বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য তাই অসামান্য মানুষ হবার ফলে দেবতায় পরিণত হয়েছে।

ধর্মের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে এসেছে পূজার্চনা-বলিদান। ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা এবং তার মাধ্যমে নিজের অক্ষমতা ও অসহায়তার পূরণের জন্য পূজার্চনা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। দেবতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য প্রচলিত হয়, আচার অনুষ্ঠান। পুরোহিত ও শোষকশ্রেণী এই পর্বেই ধর্মচিন্তাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। ধর্মের পরবর্তী সমস্ত বিকাশই হ'ল উদ্দেশ্য মূলকভাবে শোষন ব্যবস্থার পক্ষে গড়ে তোলা।

ঐন্দ্রজালিক আচার অনুষ্ঠান ধর্মের মধ্যে দিয়ে পূজার্চনার আচার অনুষ্ঠানে পরিণত হয় আর ঐন্দ্রজালিক নিষেধ বা ট্যাবু-ধর্মীয় প্রথানুষ্ঠানে পরিণত হয়।

প্রার্থনা অনুষ্ঠান, মৃতকে পিণ্ডদান, বলিদান, মূর্তির সামনে আরতি প্রভৃতি প্রথম ধরনের উদাহরণ, অপরা, যথা, সরস্বতী পূজার দিনে অনধ্যায় দিবস প্রভৃতি দ্বিতীয় ধরনের উদাহরণ।

মানুষের সামনে সবসময় দুটি অবস্থা বিরাজ করছে—কিছু সমস্যার সমাধান নিজ প্রচেষ্টায় করতে পারা আর কিছু সমস্যার সমাধানের কোন পথ খুঁজে না পাওয়া। প্রথম ধরনের সমস্যায় মানুষ হয় কর্মোদ্যোগী, দ্বিতীয় ধরনের সমস্যায় মানুষ হয় পূজারী। আর সেই কারণেই ধর্ম প্রধান সমস্ত সম্প্রদায়েই এই দুই ধরনের কাজের জন্যই ব্যবস্থা ছিল। তবে যেহেতু কর্মই মানুষকে অগ্রগতির দিকে সফলভাবে নিয়ে যেতে পারে সেই হেতু পূজামূলক বা ধর্মমূলক কাজ ক্রমশঃ মানুষের জীবন থেকে কমে এসেছে। মিশরে সারা বৎসরের এক পঞ্চমাংশ নির্দিষ্ট ছিল কাজ না করে দেবানুষ্ঠানের জন্য। রোমে এই জন্য ধার্য ছিল দিনের এক তৃতীয়াংশ, ভারতে বারোমাসে তের পার্বণ, মুসলমানদের নমাজ, রোজা সারা বৎসরের অনেকটা সময় জুড়ে। কিন্তু আদিম মানুষের কাছে যে সমস্ত মূল সমস্যা ছিল যেমনে পশুকে পোষ মানান, খাদ্য সংরক্ষণ, শিশু মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া, নারীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি যখন ক্রমশঃ সমাধান হ'তে আরম্ভ করল ধর্মীয় চিন্তাতেও তার প্রভাব পড়তে লাগল। যে সমস্ত অক্ষমতা পূরণ হ'তে লাগল—দেবতার প্রতি সেই সমস্ত ক্ষেত্রে নির্ভরতা কাজে আসতে লাগল।

মানুষের সমাজে অভাব আছে। অভাব পূরণের চেষ্টাও আছে। এই অভাবের পিছনে যে প্রাকৃতিক কারণ রয়েছে যার উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ নেই, সেই প্রাকৃতিক কারণকেই ঈশ্বরেচ্ছায় নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতাই ধর্মবোধের মূল। সেই শক্তির অতি কাল্পনিক প্রতিফলন মানুষের মনে ধর্মচিন্তার সূত্রপাত ঘটায়। সুতরাং একটি একটি করে অভাব পূরণের পথে মানুষের জয়যাত্রা ধর্মের স্তম্ভ থেকে একটি একটি করে পাথরকে আলগা করে দেবে। এই পথে যাত্রার এক এক স্তরে এক এক দেশে ধর্মীয় আদর্শ এক এক রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন গ্রীসে প্লেটোর সময় আদর্শ বলা হ'ত সৎলোককে, এ্যারিস্টটলের সময় বলা হ'ত উচ্চমনা মানুষকে; স্টোইকদের মতে আত্মসংযমী ব্যক্তি হ'ল আদর্শ, প্রাচীন চীনে আদর্শ ব্যক্তি ছিল রাজানুরক্ত ব্যক্তি; জাপানে নিয়মানুবর্তী যোদ্ধা; রোমে বীর; হিব্রুদের সাচ্চা ব্যক্তি; জার্মানীতে আত্মসম্মান সম্পন্ন ব্যক্তি; মুসলমানদের ঈশ্বরে সমর্পিত প্রাণ; ভারতে সাধুসজ্জন।

এই ভাবে ধর্মবোধ স্বভাবতই দেশে দেশে পৃথক হয়ে গিয়েছে। লক্ষ্যে এক

থাকলেও আচারে অনুষ্ঠানে পৃথক হয়েছে নানা ধর্ম। দানিকেন তাই সব ধর্মকেই তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন, 'আমাকে যখন লোকে বলে ধর্মের প্রতি আর একটু শ্রদ্ধাবান হ'তে আর একটু ভক্তি করতে আমি তখন বলি, প্রাণ থেকেই বলি, সব ধর্মকেই আমি শ্রদ্ধা করি।'৫(২২১) দানিকেন সবধর্মকে শ্রদ্ধা করুন। করতেই পারেন যে কোন ব্যক্তি। কিন্তু হঠাৎ সে কথা কেন? পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মপুস্তকের দেবতার ধারণা যদি গ্রহান্তরের জীব দেখেই জন্মে থাকে তা হলেও তো ধর্মীয় দেবতার বিদায় নেবার পালা। আর সে বিদায়ের বাঁশী বাজিয়েছেন দানিকেন স্বয়ং। ধর্মের মিথ্যা ইমারত ভেঙে দিয়ে দানিকেন সে দিক থেকে মানবসমাজের অন্ধকারকেই খানিকটা দূর করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাও করতে রাজি নন। তার দেবতার তত্ত্বও থাকবে আবার ধর্মের দেবতাও থাকবে। সেই কথাই তিনি কবুল করেছেন এই বলে, 'এ সব প্রশ্ন তুলেছি বলে ভাববেন না, পৃথিবীর মহান ধর্মসমূহকে আমি তাচ্ছিল্য করছি বা তাদের মহত্ত্বে আমি সন্দেহ করছি। না, তা আমি করিনি। আমি বলতে চাইছি যে ঈশ্বর আমাদের কাহিনী কিংবদন্তীতে, ধর্মপুস্তকে বিরাজ করছেন যে ঈশ্বর বাঁদর থেকে মানুষ গড়েছেন সে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কল্পনা মহান মঙ্গলময় বিশ্বেশ্বরের কোন সম্পর্ক নেই। একথা আমি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি।'২(১৩৪) বিশ্বাস তিনি অনেক কিছুই করতে পারেন। কিন্তু ধর্মের ঈশ্বর আর তাঁর কল্পনার ঈশ্বরের পার্থক্য তিনি কীভাবে করেছেন? সে কি বহু ঈশ্বর আর একেশ্বরের ধারণার তফাতের কথা। কিন্তু ঈশ্বর বহুই হোক আর একজনই হোক ধর্মীয় বোধ অনুসারে তার মধ্যে পার্থক্য নেই—দার্শনিক চিন্তায় কিছু থাকলেও, বিশ্বকর্মা শিল্পবিভাগ দেখুক, সরস্বতী বিদ্যার দায়িত্ব নিক, কিংবা ঈশ্বর একাই সব দপ্তর দেখুক তাতে মানুষের ধর্মবোধের খুব বেশী পার্থক ঘটে না। একেশ্বরের চিন্তা আধুনিক হওয়াতে তাকে অনেক জটিল করে তোলার মতো মানুষিক শক্তি বর্তমান মানুষের রয়েছে। যুক্তি, তর্ক, বিজ্ঞানের সঙ্গে সাদৃশ্য স্থাপন করে এ কাজে সাফল্য লাভ করা যায়। কিন্তু তা বাস্তবে একই ফল আনয়ন করে অর্থাৎ মানুষের অক্ষমতায় অতিপ্রাকৃত শক্তির হস্তক্ষেপ কল্পনা করা।

ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের একটি কথা প্রসঙ্গক্রমে স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, 'যে সমস্ত বহিঃশক্তি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের উপর তার যে অতি কাল্পনিক প্রতিফলন পড়ে ধর্মচিন্তা তা ছাড়া আর কিছু নয়। এই প্রতিফলনে পার্থিব শক্তিসমূহ অপার্থিব রূপ পরিগ্রহ করে।···যখন সমাজ উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ করায়ত্ত করবে ও পরিকল্পনা মাফিক তা ব্যবহার

করবে…যে সময়ে মানুষ যা চাইবে সেই অনুযায়ী তা পাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে তখনই মাত্র শেষ যে বাহ্যশক্তি যা রূপ গ্রহণ করেছে ধর্মের মধ্যে তার অবসান হবে।—তার সাথে সাথে মানব চেতনার ধর্মীয় রূপের অবসান হবে। এর কারণ হচ্ছে সেদিন প্রতিফলিত হবার মতো আর কিছু থাকবে না।'

মানুষ যখন ক্রমশঃ প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে চলেছে, নিজের অসহায়তাকে কাটানোর মতো বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভ করে চলেছে, রহস্যময় ঘটনাবলী যখন মানুষের কাছে ক্রমশঃ ব্যাখাত হয়ে উঠছে তখন ধর্মের পক্ষে পুরনো অবস্থান রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ধর্মতে আর আকৃষ্ট হতে পারছে না।

ধর্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্য যখন ঈশ্বরকে অর্জন, ঈশ্বরের সেবা, ঈশ্বরের অনুসরণ, ঈশ্বরকে জানা, ঈশ্বর প্রাপ্তি, ঈশ্বরে ভক্তি, প্রেম তখন আধুনিক মানব মন ক্রমশঃ ধর্মকে সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, স্থাপত্য প্রভৃতি আলোচনার মতো একটি বিষয় হিসাবে মনে করতে শুরু করেছে। অন্য কোন সার্বজনীন সত্য এর মধ্যে আর আরোপ করা যাচ্ছে না। ফলে ধর্মীয় প্রবক্তা বা মহাপুরুষেরা শিক্ষক, সমাজ সংস্কারক, দার্শনিক, সৎ দৃষ্টান্ত মানবপ্রেমিক প্রভৃতি পরিচয়ে স্মরণীয় হচ্ছেন। সেই দৃষ্টিতে দেখে বিভিন্ন ধর্মকেও সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে দেখা যেতে পারে। যেমন যোগদর্শন—একজাতীয় শারীরিক ও মানসিক প্রক্রিয়া; জৈন ও বৌদ্ধ—মনস্তাত্বিক শাস্ত্র; খৃষ্টান—আত্ম-উন্মোচন; কনফুসীয় গ্রীক সমাজের ধর্ম—ভালোর উদ্বোধন; বৈষ্ণব—মননের প্রক্রিয়া; ইসলাম—সমাজ-গঠন; শিখ—আত্মরক্ষার্থে বীরত্ব ইত্যাদি। এইভাবে দেখা যায় ধর্ম সার্বজনীন আবেদনের স্থান থেকে তার সঙ্কীর্ণ আত্মস্বরূপে প্রকাশমান। দানিকেনের তত্ত্ব সঠিক হ'লে ধর্মের অর্থশূন্যতা আরেক ধাপ প্রকাশিত হয়ে পড়ার কথা। তখন মন্দিরের দেবতা, গির্জায় ঈশ্বর পুত্রের জনক বা মসজিদের নিরাকার প্রভু সকলেরই প্রস্থান করবার পালা।

বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক দানিকেন ধর্মকে এভাবে বিদায় দিতে রাজী নন। তাই সমস্ত খোলস ছেড়ে সরাসরি ধর্ম সংস্থাপনে এগিয়ে এসেছেন; ভগবানের নাম গান করার উদ্দেশ্যে যখন মানুষ এক জায়গায় সমবেত হয়, তখন তার অনুভূতিতে জাগে এক পবিত্র ঐক্যশক্তি। শঙ্খঘণ্টা ধ্বনিতে তখন সে যেন জ্ঞানাতীত কোন সত্তার নিঃশব্দ উপস্থিতির অনুরণন শুনতে পায় আপন অন্তরের অন্তস্তলে। মন্দির, মসজিদ, গীর্জা ভগবানের আরাধনার স্থান, সমবেত ভাবে

সেই অনির্বচনীয় মহিমা কীর্তনের স্থান। তাই নাট-মন্দিরের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, আর সবই কিন্তু অনাবশ্যক।'৩(১৭৩)

পুরাণের দেবতা প্রাচীন স্থাপত্যের ভাস্কর আর মানবের স্রষ্টাকে খুঁজতে গিয়ে দানিকেন অন্ততঃ চারটি জিনিস উপহার দিয়েছেন তাঁর মতামতের মধ্যে দিয়ে। জন্ম-নিয়ন্ত্রণকে মানুষের আগামী দিনের চলার ক্ষেত্রে 'একটিমাত্র সমাধান' হিসাবে দেখতে পেয়েছেন; মার্ক্স-লেনিনকে 'এ যুগের নূতন ধর্মগুরু' রূপে আবিষ্কার করেছেন, 'মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা' মহাকাশ গবেষণায় নিযুক্ত হওয়ায় আবশ্যকতা উপলব্ধি করেছেন এবং ধর্ম ছাড়া 'আর সবই কিন্তু অনাবশ্যক' বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। গ্রহান্তরের দেবতা এর মধ্যে দিয়ে কতটা আবিষ্কৃত হয়েছে বলা না গেলেও দানিকেন যে এই সব মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে পাঠকের কাছে বিশেষভাবে আবিষ্কৃত হতে পারবেন সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ

ভবিষ্যতকে নিয়ে মানুষের ভাবনাই সবচেয়ে বেশী। অথচ ভবিষ্যতের অনেকটাই যে বর্তমানের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে তা ভাববার অবসর হয় না অনেকেরই। পৃথিবী গ্রহ হিসাবে ভবিষ্যতে কি চেহারা নিয়ে দাঁড়াবে তাও যেমন একদিকে ভাববার বিষয়, তেমনি ভাবনার কারণ রয়েছে মানুষকে নিয়ে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়েও। তবে বলা বাহুল্য, নিরবধি কালের বিচারে দেখলে সুদূর ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জীবনে ধ্বংসকেই নিশ্চিত করে রেখেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে জাগতিক ইতিহাসে সৃষ্টি ও ধ্বংস পর্যায়ক্রমে অনিবার্যভাবে দেখা দিয়ে চলেছে। এর কোন বিরাম নেই! কিন্তু সে হল মহাকালের বিচারে। মানুষের সমাজ জীবনের দিন-ক্ষণ-তারিখের হিসাবে কবে সেই ধ্বংসকে অনিবার্য করে তুলবে সে ভাবনা আজ অবান্তর।

সেই অবান্তর প্রশ্ন তুলেই দানিকেন আতঙ্ক সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। এই বলে, 'একদিন না একদিন সমস্ত কাঁচামালের সব উৎস শুকিয়ে যাবে, জীর্ণ হয়ে যাবে এ গ্রহ। যে বুদ্ধিমান জীবের হাতে রয়েছে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নত জ্ঞান এবং কৌশল, সে কখনও এমন অবস্থাকে নীরবে মাথা পেতে নেবে না। তার সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে বাঁচবার একটা উপায় সে বের করবেই, তার জন্ত তার সমস্ত অর্থব্যয় করতে, হাতের সবরকম শক্তি প্রয়োগ করতেও সে কুণ্ঠিত হবে না। এদিক থেকে দেখলে সেই ভবিষ্যৎ দিনে আকাশে পাড়ি জমানো

একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেবে। সব সূর্যই একদিন মরে যায়, পুড়ে শেষ হয়ে যায় লক্ষ লক্ষ বছর পরে…।'৪(৮৪) একদিকে কাঁচামাল ফুরিয়ে যাবার ভয়, অন্যদিকে সূর্যই ধ্বংস হওয়ার আতঙ্ক।

সূর্য ধ্বংস হবে নিশ্চিত, তবে কয়েক লক্ষ বছর পরে নয় কয়েক কোটি বছর পরে। তাপমাত্রার তারতম্য অনুসারে তারাদের দশটি ভাগে ভাগ করা যায়। তারা হ'ল এস. এন. আর. এম. কে জি. এফ. এ. বি. ও। এর মধ্যে সূর্য জি শ্রেণীভুক্ত। সূর্যকে জি পর্যায় থেকে এফ. এ. বি হয়ে ও অবস্থায় উপনীত হয়েই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হতে হবে। সূর্যের বর্তমান তাপমাত্রা ৬০০০ ডিগ্রি কেলভিন। 'ও' পর্যায়ে উপনীত হ'লে তার তাপমাত্রা হবে ৩০,৪০০ ডিগ্রি কেলভিন। তারপর সূর্য পরিণত হবে নোভা তারাতে এবং বিরাট বিস্ফোরণের অবস্থায় পৌঁছে সূর্যের শিখা কোটি কোটি মাইল ছড়িয়ে পড়ে গ্রহমণ্ডলকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। কিন্তু সে হল বহুদূর ভবিষ্যতের কথা।

সূর্য নিজের ছায়াপথের কেন্দ্র ঘুরে আসতে সময় নেয় ২৫ কোটি বৎসর। বিজ্ঞানী জর্জ গ্যাসে হিসাব করে দেখিয়েছেন সূর্য যেভাবে জ্বলছে তাতে আরো ৫০০০ কোটি বছর এমনি জ্বলতে থাকবে। এই পটভূমিকায় দানিকেন দুশ্চিন্তায় পড়েছেন, 'লক্ষ লক্ষ বছর হলেও একদিন আমাদের সূর্য জ্বলে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যাবে।'১(১১৮) তিনি কেবল সূর্যের মৃত্যুর কথাই বলেন নি। পৃথিবীর মৃত্যুর কথাও শুনিয়েছেন, 'বৈজ্ঞানিকেরা সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন পৃথিবীর মৃত্যু ঘটবে ২১০০ সালের আগেই।'৩(১৭২) এ মৃত্যু গ্রহ পৃথিবীর নয় জনসংখ্যা ও খাদ্যাভাবের ফলে মানব পৃথিবীর মৃত্যু।

পৃথিবীর মৃত্যুর সমস্যা থেকে সমাধান হিসাবে দানিকেন গ্রহান্তরে উপনিবেশ স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছেন। এই গ্রহ মঙ্গল বা অন্য কোন সৌরগ্রহ হ'তে পারে। আবার সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে কোন অজ্ঞাত তারার গ্রহেও হ'তে পারে; মানুষের নতুন বসতি। অন্য আরেক সমাধান তাঁর মতে গোটা পৃথিবীটাকেই সূর্যের আকর্ষণের বাইরে নিয়ে যাওয়া। মার্কিন বৈজ্ঞানিকদের কোন এক প্রসঙ্গের মন্তব্যকে স্মরণ করে দানিকেন বলেছেন, 'উপযুক্ত প্রাযুক্তিক জ্ঞান না থাকায় আমার মাথায় খেলে নি যে গোটা পৃথিবীটাকেই নিয়ে যাওয়া যেতে পারে অন্য কোন সৌরমণ্ডলে।'৪(৫৭)

এ সমস্ত সমাধানই বলা বাহুল্য ভৌগোলিক পৃথিবীটাকে বাঁচানোর জন্য নয়। এই সব পরিকল্পনা হ'ল, পার্থিব মানবজাতিকে বাঁচানোর জন্য। তাঁর মতে, 'আমাদের সন্তান-সন্ততিদের বাঁচবার সুযোগ করে দিতেই হবে। পুরুষ-

পরম্পরায় একাজ করে যেতে হবে। এ আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য সবচেয়ে বড় পুণ্যকর্ম।'১(১১৫) বাঁচবার সুযোগ কেবল দারিদ্র্যক্লিষ্ট অনশনরত সমাজটাকে নয়, পার্থিব জগতটাকেও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করতে হবে। 'সেই বাঁচবার কামনাতেই নিহিত রয়েছে মহাকাশ যাত্রার উদ্দেশ্য এবং বিধেয়।'৪(৮৬)

এ সবই খুব বলা হয়েছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ, অন্য কথায় মানব জাতির ভবিষ্যতের কথা ভেবে। ভবিষ্যতের কথা নিয়ে এত ভাবনা করতে গিয়ে লেখক কিন্তু বর্তমানের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছেন। পৃথিবীতে মানব সমাজকে যেমন একদিকে তিনি সঠিকভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারেন নি, অন্যদিকে এই মানব সমাজের ভবিষ্যৎকেও দেখতে পান নি।

বর্তমান মানব সমাজের চেহারাটা কি? এর গতিই বা কোন দিকে? প্রাচুর্যের মাঝে অন্তহীন দারিদ্র্যকে বক্ষে নিয়ে একশ্রেণীর বিলাসিতার চাপে অন্যশ্রেণীর নাভিশ্বাসে প্রকম্পিত এই মানব সমাজ কি লক্ষ বছর কোটি বছর তার আয়ুকে টিকিয়ে রাখতে পারবে? পৃথিবীর ভবিষ্যতের চিন্তায় এ প্রশ্নগুলি অনিবার্যভাবে এসে পড়ে।

মানবসমাজে বর্তমানে সংগ্রাম চলেছে দু'জনার বিরুদ্ধে—মানুষের সাথে মানুষের সংগ্রাম অর্থাৎ শ্রেণী সংগ্রাম আর প্রকৃতির সাথে মানুষের সংগ্রাম। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মানুষ একদিকে পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত অন্যদিকে বাঁচার উপকরণ আহরণের জন্য প্রকৃতিকে দোহন করার সংগ্রামে নিয়োজিত।

শ্রেণীসংগ্রাম সৃষ্টি হয়েছে শোষকশ্রেণীর সশস্ত্র আধিপত্য ও উপাদান যন্ত্রের উপর ব্যক্তিগত কর্তৃত্বের পরিণামে। শোষকশ্রেণীই সৃষ্টি করেছে শ্রেণীবিভেদ—জাতিভেদ অত্যাচার—অত্যাচারের যন্ত্র রাষ্ট্র। শোষকশ্রেণীর লুণ্ঠন ও শোষণের ফলেই মানবসমাজে দেখা দিয়েছে আভ্যান্তরীণ পরস্পর বিরোধ। মানবজাতির একই চলার পথে সৃষ্টি হয়েছে প্রতিবন্ধকতা। চলার গতিতে দেখা দিয়েছে মন্থরতা। পৃথিবী জুড়ে বৃহত্তরভাবে চলছে প্রাকৃতিক সম্পদের বেহিসেবী ব্যবহার; নতুন নতুন সম্পদকে করা হচ্ছে বিশেষ বিশেষ শক্তির দানবিকতার সেবায় নিযুক্ত। ফলে সমগ্র মানুষী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে নিযুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। বিচ্ছিন্নভাবে যেটুকু সম্ভব হচ্ছে তাও মানব কল্যাণের বদলে শোষক শ্রেণী-স্বার্থেই ব্যয়িত হচ্ছে।

বর্তমানের এই রূপকে সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীকে অন্য ছায়াপথ কেন, স্বর্গে নিয়ে

গেলেও অপরূপ করে তোলা যাবে না। জাগতিক সমস্যা কলহকে না মিটিয়ে অদূর ও সুদূর কোন ভবিষ্যতের কথাই ভাবা যেতে পারে না।

দানিকেন অবশ্য সমস্যার সমাধানও দেখেছেন। তবে মাটি থেকে পাকে অনেক উপরে রেখে, 'পৃথিবীর সব দেশের, সব জাতের মানুষ যেদিন গ্রহান্তর গমনের এই জাতি-রাষ্ট্র সীমাতিক্রান্ত কাজকে সত্যই সম্ভব করবে, পৃথিবী সেদিন তার তুচ্ছ জাগতিক সমস্যাসমূহকে ঝেড়ে ফেলে মহাজাগতিক রাষ্ট্রে বেছে নিতে পারবে তার নিজস্ব বিশেষ স্থানটি।'১(১০১) আসলে যে 'জাতিরাষ্ট্র-শ্রেণী' সম্পর্কের অবলুপ্তির কাজই প্রধান তা যে কখনই তুচ্ছ নয়, এর উপরই নির্ভর করছে মানবজাতির মহাকালের পথে যাত্রার ভবিষ্যৎ; সেই কথাটিকেই উল্টে দেওয়া হয়েছে এখানে। পার্থিব সমস্যাকে কাঁধে নিয়ে মহাজাগতিক সমস্যার সমাধান হতে পারে না। শ্রেণীবিভক্ত থেকে কখনই মানব জাতির মুক্তি হতে পারে না। জীর্ণ-ক্লিষ্ট-ছন্নছাড়া পৃথিবীকে ছায়াপথে ঘুরিয়ে বাঁচিয়ে রাখার পরিকল্পনা তাই পরজীবী মানসিকতার অলস বিলাস ছাড়া কিছু নয়।

পৃথিবীতে এই মুহূর্তে আয়ত্তাধীন সম্পদের যা পরিমাণ তা যদি সুষম বণ্টন করা যায় তবে বৈষম্যকে তো দূর করা সম্ভবই, সমস্ত মানুষের খাওয়া-থাকা-পরিচ্ছদ ও শিক্ষার ন্যূনতম প্রয়োজন অবশ্যই মেটানো সম্ভব। সামগ্রিক উৎপাদন শক্তি ও বিজ্ঞানের গবেষণা যে পরিমাণ বিকশিত হবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে যে তা দিয়ে পৃথিবী থেকে অভাব কথাটিকে অনায়াসে বিদায় করে দেওয়া সম্ভব। আর এইভাবে মানুষ তার শক্তিকে যদি নিজেদের ভিতরকার লড়াই এর কক্ষ থেকে সরিয়ে এনে সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে নিযুক্ত করতে পারে তবে নতুন নতুন অসংখ্য সম্ভাবনার দ্বার খুলে যেতে পারে। অথচ পৃথিবীর বর্তমান চিত্রটা ঠিক উল্টো।

কয়লা, পেট্রোল প্রভৃতি খনিজ পদার্থের পার্থিব সঞ্চয় সীমিত। হয়ত বা আরো কিছু নতুন খনি আবিষ্কার হবে। কিন্তু প্রয়োজনের চেয়ে বিলাসিতার জন্যই আজ পৃথিবীতে এই শক্তির ব্যয় হচ্ছে বেশী। মানবহিতের পরিবর্তে শক্তিধর দেশগুলির বিশেষ শ্রেণীর দুনিয়াব্যাপী আধিপত্যের নিশ্চয়তার জন্য শক্তিকে ব্যয় করা হচ্ছে সামরিক কাজে। কেবল ভারতবর্ষেই ৮ লক্ষ যানবাহন ও ৬১ লক্ষ দ্বি-চক্রযান বছরে ২০ লক্ষ টন পেট্রোল পোড়াচ্ছে। বলা বাহুল্য যে এর অধিকাংশই ব্যয় হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে বিলাসী জীবন যাপনের স্বার্থে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেবল মহিলারা সারাবছর যে বিলাস দ্রব্য ব্যবহার করে তার জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ আফ্রিকা মহাদেশের সমস্ত রাষ্ট্রের বাৎসরিক

বাজেটের সমষ্টির চেয়ে বেশী। প্রচলিত কাগজগুলি ব্যবসাদার শিল্পপতিদের বিজ্ঞাপনের জন্য প্রচুর স্থান ব্যয় করে। এর ফলে কাগজগুলির আকার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিউইয়র্ক টাইমস্ প্রতিদিনের কাগজ ছাপাতে ছয় হেক্টর কানাডার অরণ্য ব্যবহার করে। রবিবার এই মাত্রা হয়ে দাঁড়ায় পনের থেকে কুড়ি হেক্টর পরিমাণ অরণ্য সম্পদ। অপরদিকে উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে ক্যালিফোর্নিয়ার অরণ্যের এক কোটি একর জমির অরণ্য সম্পদ প্রতিবছর অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হয়ে যায়। শিলমাছ আর তিমিমাছের বংশ বিস্তার অত্যন্ত ধীর। অথচ সমুদ্রে কোন আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ না থাকায় যথেচ্ছভাবে শিল ও তিমি শিকার হয়ে চলেছে। হিসাব করে দেখা গেছে প্রতিবছর বিভিন্ন দেশ তিমি মাছ ধরছে ১০ থেকে ২০ হাজারটি। আর শিলমাছ ও পেঙ্গুইন শিকার করছে ৪০ থেকে ৫০ লক্ষটি। এইভাবে অপরিকল্পিতভাবে শিকার করা চললে অচিরেই এই প্রাণদুটি পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে। বিষম বণ্টন আর অপরিকল্পিত সম্পদ ব্যবহারের এমন দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় ভূরি ভূরি।

বেহিসেবী ও অপরিকল্পিত মুনাফালোভী প্রতিযোগিতার ফলে প্রতি ৩ বছরে পৃথিবী থেকে ১টি করে প্রাণীর অবলুপ্তি ঘটছে। গত ৩০০ বছরের গড় হিসাবে এটি জানা যায়। প্রাকৃতিক পশুপক্ষী ও মাছই শুধু নয় উদ্ভিদজগতও একইভাবে মুনাফাখোরদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। আক্রান্ত হচ্ছে প্রাণহীণ খনিজ সম্পদও। বেহিসেবী খরচের ক্ষেত্রে যেখানে সংযত হওয়া আজ প্রয়োজন সেখানে সংযত হবার কার্যকরী ব্যবহার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল আতঙ্কের মধ্যে কালক্ষেপণের চেষ্টা হচ্ছে। দানিকেনও তেমনিই করেছেন।

পার্থিব শক্তির সম্ভাবনার ব্যাপারেও দুর্ভাবনার কিছু নেই। শক্তির উৎস হিসাবে বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হ'ল কয়লা আর পেট্রোল। কিন্তু এই উভয়শক্তির থেকে আহৃত বাৎসরিক তাপের পরিমাণের হাজারগুণ বেশী হ'ল দৈনিক পৃথিবীতে আসা সৌরশক্তি। এই সৌরশক্তি থেকে এখন পর্যন্ত খুব বেশী সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি। তবে পাঁচশর মতো আয়না ফিট করে সম্প্রতি সূর্যতাপ থেকে একটি টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা গিয়েছে। পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার তো বর্তমান পৃথিবীতে ব্যাপক ভাবেই শুরু হয়েছে। তবে সুদূর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করলে পরমাণু শক্তির উৎস প্লুটোনিয়াম আর ইউরেনিয়াম এর সঞ্চয়কেও অফুরন্ত বলা যায় না। যদিও সে শক্তি কেবলমাত্র শান্তির কাজে ব্যবহার করলে আগামী বহুদিন শক্তির সমস্যা থাকবে না।

পরমাণু থেকে তাপকেন্দ্রিক বিক্রিয়ার সাহায্যে অফুরন্ত শক্তি পাওয়া যেতে পারে। হাইড্রোজেনের মতো হাল্কা দুটি পরমাণুর কেন্দ্রকে জুড়ে এক হয়ে যাবার ফলে খানিকটা বস্তুবিনষ্ট হয়ে তৈরি হয় শক্তি। ইউরেনিয়ম পৃথিবীতে দুষ্প্রাপ্য হ'লেও সমুদ্রজলে হাইড্রোজেন অফুরন্ত। সূর্যদেহে তাপ এইভাবেই উৎপন্ন হয়। এতে কয়েক লক্ষ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপ উৎপন্ন হ'তে পারে। এরকমভাবে তাপ খুব কম সময়ের জন্য হ'লেও তৈরি হয়েছিল বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত পরমাণু বিস্ফোরণের সময়। এইভাবে শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব হ'লে সুদূর ভবিষ্যতেও শক্তির জন্য মহাকাশে পাড়ি দেওয়া প্রয়োজন হবে না।

খাদ্যের অভাব পূরণের হাজার রকম সম্ভাবনার কথা আলোচনা না করে একটি গবেষণার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গবেষণা অনুসারে লক্ষ্য করা গেছে যে পতঙ্গ শতকরা ৩০ ভাগ প্রোটিন ধারণ করে। যখন গরুর মাংস, মাছ, ডিম এবং মুরগীর মাংসতে প্রোটিনের পরিমাণ যথাক্রমে ২১'৫, ১৮'৯ ৬'৪, এবং ২০'২ ভাগ। সিল্কের পতঙ্গে ৮টি এ্যামিন এ্যাসিড আছে যার ভিতর ৪টি মানুষের শরীরের এ্যামিন এ্যাসিড।

অনেক কীটপতঙ্গ আছে যা লক্ষ বছরও বেঁচে থাকে, এমন কি বন্যা আবহাওয়ার পরিবর্তন, আণবিক বিস্ফোরণ প্রভৃতি অবস্থাতেও। পৃথিবীর প্রাণী জগতের পাঁচভাগের চারভাগ এই কীটপতঙ্গ। কীটপতঙ্গের প্রজাতির সংখ্যা দশ লক্ষেরও বেশী। কোন কোন কীটপতঙ্গের প্রজাতি মাসে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ পর্যন্ত বাচ্চা দেয়। বছরে ২৫টি বংশধর ৫৬ কোটি ৪০ লক্ষ বাচ্চা পাড়ে।

এককোষী জলজ উদ্ভিদ ক্লোরেলা থেকে খাদ্য উৎপন্ন করার কথাও ভাবা হচ্ছে। ক্লোরেলার কোন কোন জাত সমুদ্রবাসী—কোন কোন জাত সাধারণ জলেও জন্মায়। ক্লোরেলা প্রতি ১২ ঘণ্টায় নিজের আয়তন দ্বিগুণ করতে পারে। এক একর জমিতে জল প্লাবিত করে ক্লোরেলার চাষ করলে বছরে ৪০ টনের উপর ক্লোরেলা পাওয়া সম্ভব। আর সমুদ্র তো আছেই। সাধারণ উদ্ভিদের পাতা শিকার অনেক সময় খাওয়া যায় না। কিন্তু ক্লোরেলার সমস্ত অংশই খাওয়া যায়। ক্লোরেলার ভিতর শর্করা ছাড়াও প্রোটিন ও ভিটামিন আছে। বর্তমানে পশুখাদ্য ও আইসক্রিমে ক্লোরেলার ব্যবহার শুরু হয়েছে।

এই সমস্ত কীটপতঙ্গ গুলো থেকে খাদ্য উৎপাদন করতে পারলে মানুষের কাছে খাদ্য সমস্যা পৃথিবীতে সমাধান করা সম্ভব। আর সে বিষয়ে গবেষণার পথে সাফল্য মহাকাশ গবেষণার চেয়ে অনেক বেশী সম্ভাবনাপূর্ণ।

পৃথিবী পৃষ্ঠের স্থলভাগ মোট আয়তনের ২৯ ভাগ হলেও এখন পর্যন্ত

চাষবাসের জন্য ব্যবহৃত হয় মাত্র তার ৫% স্থান। বন ও তৃণভূমিতে ছেয়ে আছে শতকরা ১০ ভাগ জায়গা। বনভূমিকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে নানান ধরনের চাষের ব্যবস্থা এবং মরুভূমির ও তুন্দ্রা অঞ্চলের শতকরা ৯ ভাগ অঞ্চলে চাষ করতে পারলে বর্তমান খাদ্য সমস্যার বহুদিন মোকাবিলা করা সম্ভব। মানুষের বাসস্থান ইত্যাদিতে জমি নষ্টের কথা আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। কারণ পাহাড় পর্বত, নদী, রাস্তা ও বসতী মিলে মোট জায়গা রয়েছে মাত্র শতকরা ৩ ভাগ স্থান।

সমস্যার মূলটা সুতরাং সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে। তাই বিজ্ঞানের বিশাল চাবিকাঠি হাতে নিয়েও প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। পৃথিবীর ভাবষ্যৎকে পৃথিবীর নদী-সমুদ্র-পাহাড়-অরণ্য-মাটির উপরেই আগে রচনা করতে হবে—তারপর তাকে প্রসারিত করা সম্ভব মহাকাশের অজানা রাজ্যে। এই প্রাথমিক এবং মূল স্তরকে অস্বীকার করার অর্থ অগ্রগতিকেই অস্বীকার করা। যৌবনের সমস্যার সমাধান না করে বার্ধক্যের নিরাপত্তার কথা ভাবা সামিল।

দানিকেন পৃথিবীর কৈশোর-যৌবনের কথা চিন্তা না করে একেবারে বার্ধক্যের চিন্তায় উদ্বিগ্ন। চাকরি পাবার আগেই অবসরকালীন পরিকল্পনা করতে ব্যস্ত। সেই ব্যস্ততার ফলেই তিনি মহাকাশ গবেষণার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে অজস্র যুক্তি উপস্থিত করেছেন, 'মহাকাশ গবেষণার স্বপক্ষে একটা বড় যুক্তি হচ্ছে এর ফলে নতুন নতুন নানা শিল্প গড়ে উঠছে। হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থানও হচ্ছে।'১(১১৭) 'যে সমস্ত শুষ্ক মহাকাশ গবেষণায় বিশাল প্রকল্পে টাকা জোগাচ্ছে বহুধারায় তা ফিরে যাচ্ছে করদাতাদের কাছেই।' তাই তার মন্তব্য, 'প্রায়ই বলতে শুনি যে কোটি কোটি টাকা মহাকাশ গবেষণায় ব্যয় করা হচ্ছে তা পার্থিব উন্নয়নে ব্যয় করলে অনেক ভাল হত। ভুল কথা।'১(১১৬) পৃথিবীর ভবিষ্যতের কথা ভেবে এ তো করতেই হবে। মানব সমাজের এই লক্ষ্য পথ নাকি পূর্বনির্দিষ্ট। 'তাই বলি মহাকাশ গবেষণা মানুষের খুশ খেয়াল নয়; মহাবিশ্বে তার পরিণতির ভাবনা তার মনের গহনে গেঁথে আছে বলেই সে একাজ করে চলেছে।'১(১১৮) মনের গহনে পূর্বনির্দিষ্ট কি গেঁথে আছে তা কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়, তবে বর্তমান কালের অনেক দেশের মহাকাশ গবেষণার মধ্যে যে অনেকখানিই খুশ খেয়াল আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চাঁদে ভেলা নামান আর অজানা নক্ষত্রের উদ্দেশ্যে পাইয়োনিয়ার পাঠানোর পরিকল্পনা করার পিছনে মানুষের ভবিষ্যতের চিন্তা অথবা প্রেরণকারী দেশের বৃহৎ শক্তিসুলভ দম্ভের ভিতর কোনটি প্রধান তা কেউ হলফ করে বলতে পারে কি? বর্তমানে পৃথিবীর মহাকাশে রাশিয়ার ৪৫৬৩টি আমেরিকার

১৫৩৩টি যে কৃত্রিম উপগ্রহ ঘুরে চলেছে তা মানব সমাজের উপকারে দিকে কতটা তাকিয়ে কেউ জোড় গলায় বলতে পারেন?

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে 'মানুষ' কথাটা একটা প্রাণীবাচক ঐক্যের পরিচায়ক। সমগ্র মানব সমাজের ভাবনা এখানে অনুপস্থিত। শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব। দেশে দেশে প্রতিযোগিতা। জাতিতে জাতিতে বিরোধ। ধর্মে ধর্মে মাতামাতি। এই সংঘাতি অবস্থার মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিচালনাও হয় শ্রেণীস্বার্থের লক্ষ্যে। অবশ্য আবিষ্কৃত সত্য অনেক সময় সার্বজনীন রূপ লাভ করে।

একটি দেশ মহাকাশে অভিযানের জন্য যে জ্বালানী ও প্রাযুক্তিক কৌশল প্রয়োগ করে অন্য দেশ, স্বতন্ত্রভাবে হয়ত তার থেকে পৃথক পথে চলে। কোন দেশ যখন মঙ্গলে গবেষণা চালাচ্ছে অন্য দেশ তখন হয়ত ব্যস্ত নিউট্রন বোমা তৈরির কাজে। শুক্রগ্রহের আকরিক লৌহের আবিষ্কার যদি পৃথিবীকে ভাসিয়ে দেবার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে তখন হয়ত পৃথিবীতে লৌহের দাম পড়ে যাবে বলে দেখা যাবে গবেষণার ক্ষেত্রকেই সরিয়ে নেওয়া হ'ল। এই হ'ল বর্তমান পৃথিবীর চেহারা। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে দানিকেন যতোই শুভেচ্ছা পোষণ করুন তা দিবাস্বপ্নের চেয়ে বেশী সত্য হতে পারে না।

বহুদূর কোন গ্রহ থেকে যে অতিথি এ পৃথিবীতে এসেছিল বলে বলা হয়েছে তাদের গ্রহের পরিবেশের কথা প্রসঙ্গক্রমে একটু কল্পনা করা যাক। আমাদের পৃথিবীর বর্তমান কালের মতোই সেখানে দ্বন্দ্বমান দেশ ও শ্রেণী থেকে থাকলে যে অভিযাত্রীদল গবেষণার স্বার্থে দানিকেনের রথে চড়ে অলৌকিক সমস্ত ক্ষমতার ব'লে এখানে আসবে তারা সেখানকার একটি দেশেরই প্রতিনিধিত্ব ক'রে থাকবে। নানা উপায়ে সময় সঙ্কোচনের সাহায্যে হাজার হাজার বছর অতিক্রম করে তারা যখন ফিরবে নিজ গ্রহে, তখন দ্বন্দ্বমান সেই দেশগুলির অবস্থার পরিবর্তনের ফলে হয়ত দেখা যাবে তাদের ফিরিয়ে নেবার জন্য আর কেউ অভ্যর্থনা করে নেই। যে দেশ তাদের পাঠিয়েছিল তারাই হয়ত সব থেকে পিছিয়ে পড়েছে কিংবা যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, অথবা দূর গ্রহ থেকে এই গ্রহের আগন্তুকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল যে দেশ হঠাৎ নিজেদের শ্রেণীবিরোধের থেকে উদ্ভূত বিপ্লবী লড়াই সমস্ত পরিস্থিতিটাই হয়ত তার পাল্টে দিয়েছে। অর্থাৎ যুদ্ধ ও বিপ্লবের সমস্যাকে সামনে রেখে কোন উন্নত প্রাণীর পক্ষে হাজার হাজার বছরের পরিকল্পনা করা নিতান্তই অবাস্তব চিন্তা- -বৈজ্ঞানিক গল্প-কল্প!

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণী সংঘর্ষ অনিবার্য এবং অপ্রতিরোধ্য। সেখানে

যুদ্ধ ঘটবে শোষকের স্বার্থে, বিপ্লব ঘটবে শোষিতের স্বার্থে। এই অবস্থা কেবল পৃথিবীর সত্য নয়, সারা বিশ্বে যেখানেই শ্রেণীসমাজ থাকবে সেখানেই তা সত্য। দানিকেনও তা স্বীকার করেছেন, 'সর্বকালে মুনি ঋষিরা জানতেন ভবিষ্যৎ আনবে যুদ্ধ, আনবে বিপ্লব। তার ফলে রক্তপাত আর অগ্নিকাণ্ড অবধারিত।'১(১৭) অবধারিত এই অবস্থাকে না কাটিয়ে অযুত বৎসরের মহাকাশ গবেষণার পরিকল্পনার কথা ভাবা নিতান্তই বাতুলতা মাত্র। পৃথিবীর নিকটতম তারায় আলো পৌঁছাতে লাগে চার বৎসর। অর্থাৎ রেডিও সঙ্কেত পাঠালে তা ঐ নক্ষত্রলোকে পৌঁছাতে লাগবে চার বৎসর আর উত্তর আসতে লাগবে আরো চার বৎসর। আপনার নাম কি? জিজ্ঞাসা করলে উত্তর আসবে আটবছর পর। ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তারে এমন নক্ষত্র অসংখ্য যেখানে রেডিও তরঙ্গ পাঠিয়ে উত্তর পেতে হাজার হাজার বছর বসে থাকতে হবে। সেই হাজার বছরে যুদ্ধ বিপ্লব রক্তপাত অগ্নিকাণ্ড কি পৃথিবীর মানচিত্রকে বারবার পাল্টে দেবে না?

এই সমস্যাকে সময় ক্ষেপণের সমস্যাকে দানিকেন সমাধান করেছেন অলৌকিক ভাবে। তিনি দিব্যদর্শন আর আধ্যাত্মিকতা দিয়ে মুহূর্তে সব সমাধান করে ফেলেছেন।

আধ্যাত্মিকতার সুবিধা এই যে সমষ্টিকে নিয়ে ভাবনার এক্তিয়ার এখানে কম। কোথায় শ্রেণীবিরোধ, কোথায় হানাহানি তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ব্যক্তি একাই সকলকে পশ্চাতে রেখে এগিয়ে যেতে পারে। মহাকাশে যোগাযোগের জন্য সমগ্র মানব সমাজকে রথের রশিতে হাত লাগাতে হয় না। ব্যক্তি মস্তিষ্কে দিব্যদর্শনই নিভৃতে রচনা করতে পারে যোগাযোগের সূত্র। 'যে দিব্যপ্রেরণা ধর্মের দিক থেকে অর্থহীন অতি প্রাকৃতের কাছ থেকে আসা সেই প্রেরণা, সেই ঝলক পৌঁছায় মহামানবদের মহান মস্তিষ্কে, তারপর সেই মহাদেবের জটা থেকে নামে পতিতপাবনী প্রগতির করুণা ধারা।'৫(১১) দানিকেন আত্মসমর্পণও করেছেন, 'ওই ওদের ওপরেই তো আমার ভরসা।'

আধ্যাত্মিকতা আর দিব্যদর্শন দিয়ে ভবিষ্যতের পথ রচনা করতে গেলে প্রথমেই বস্তুবাদী ধারণাকে আক্রমণ করা প্রয়োজন। কারণ বস্তুবাদী চিন্তা সামাজিক শ্রেণী দ্বন্দ্বের অবসানকেই প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে করে। বস্তুবাদী পথ ধরে গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে বস্তুধর্মকে অস্বীকার করে দিব্যদর্শনকে আমদানি করা যায় না। বস্তুর গুণাবলী ক্রমাগত আবিষ্কার ও তার ব্যবহারের পথ ধরেই মানুষের ভবিষ্যৎ এগিয়ে চলবে। বস্তু ঊর্ধ্ব কোন সত্তা বা বস্তুধর্ম বহির্ভূত কোন শক্তি নিয়ে কল্পনা বিলাস করা যায় কিন্তু জীবনটাকে

একপাও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। ভাববাদী চিন্তা আর বস্তুবাদী চিন্তার মূল পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় কোনটি কর্মবিমুখী আত্মগত মনন আর কোনটি কর্মভিত্তিক সার্বিক সত্য।

সেই আদিকাল থেকেই ভাববাদী চিন্তার কুহেলিকায় সমস্ত মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখার চেষ্টা চলে আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে অভিজ্ঞতাবাদী প্রয়োগবাদী (Pragmatist) এবং বাস্তববাদীরা ভাববাদেরই নতুন সংস্কার আমদানি করেছে। দানিকেন সম্প্রতি আরেক হেঁয়ালি সৃষ্টি করেছেন মানবজাতির ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে।

অভিজ্ঞতাবাদীরা মনোবিজ্ঞান আর পদার্থবিজ্ঞানের সমন্বয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছেন দর্শনকে। অভিজ্ঞতাই তাদের কাছে জ্ঞানের একমাত্র উৎস। বৈজ্ঞানিক বিমূর্তকরণ, চিন্তার প্রসারতাকে তারা অবাস্তব বোধে অস্বীকার করে। তাদের মতে পদার্থ বা মানস কোনটিই পরম সত্তা নয়। পরম সত্তা হ'ল তৃতীয় অপক্ষপাতি সত্তা যার নাম মৌলিক সত্তা। যাকে বস্তুগত জ্ঞান দিয়ে ধরা যায় না। প্রকারান্তরে সেই ভাববাদী চিন্তা। ভাববাদী অভিজ্ঞতাবাদী আর বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাবাদীরা শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতার অধিবিদ্যক ধারণার মধ্যেই নিমজ্জিত হয়।

প্রয়োগবাদীদের কাছে মানুষের ভাল লাগা, না-লাগার বিচারেই সব কিছু দেখতে হবে। ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগবৃত্তির উপরেই যাথার্থ্য নির্ভর করে। এই চিন্তায় প্রয়োগবোধ এত বৃদ্ধি পেয়ে গেছে যে বিষয়ীগত প্রয়োগ ও প্রয়োজন সত্যকে বিষয় নিরপেক্ষ করে ফেলেছে। প্রয়োগসম্মত অনুভূতি শেষ বিচারে হয়ে দাঁড়িয়েছে বস্তুনিরপেক্ষ মানস অভিজ্ঞতা।

বাস্তবাদীরা বলে জ্ঞানের বিষয় হ'ল ইন্দ্রিয় উপাত্ত। এক জাতীয় সত্তা। এ সেই অভিজ্ঞতাবাদীদের মৌলিক সত্তারই নামান্তর। এই মতানুসারে আমাদের নিজেদের সত্তা—চিন্তা, অনুভূতি, ইন্দ্রিয়চেতনা এবং অভিজ্ঞতাই সত্য। বস্তু সত্য আসল সত্য নয়।

এই সব দার্শনিক চিন্তা আপাতঃদৃষ্টিতে বস্তুবাদী বৈশিষ্ট্য মনে করিয়ে দিলেও আসলে বিপরীত সত্যকেই তুলে ধরছে। দানিকেনও বৈজ্ঞানিক আচরণে শেষ পর্যন্ত ভাববাদী রাস্তাই ঘোষণা করেছেন পৃথিবীর ভবিষ্যতের জন্য। মহাকাশের সুউন্নত প্রাণীর অস্তিত্ব ও তার পৃথিবীতে আসার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কার্যতঃ বস্তুবাদী চিন্তাকে অতিক্রমণের এক পথ রচিত হয়েছে। বস্তুতে এ চিন্তার ভিত্তি, কিন্তু বস্তুকে শেষ পর্যন্ত তা নিজেই উৎপাটন করে ফেলেছে।

যে কোন চিন্তাই মানুষের কর্মের সঙ্গে—সমাজ বদলের সঙ্গে মানব সমাজকে প্রগতির পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যের সঙ্গে সমন্বিত না হ'লে শেষ পর্যন্ত ভাববাদী রহস্যময়তায় পৌঁছাতে বাধ্য। কর্ম যেখানে অপ্রধান বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা সেখানে বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য। এ হ'ল হাত পা থেকে মস্তিষ্ককে বিচ্ছিন্ন করার সামিল। বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা অলস চিন্তা জাল আর শোষণের অনুকূলতাই সৃষ্টি করতে পারে।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, অন্ততঃ মাথাকে হাত-পায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চিন্তাভাবনা পরিচালিত না করে, মাথা যদি একাই চলতে শুরু করে তবে সে চিন্তা কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য। কেবল মাথা ঘামান মানে বিশুদ্ধ চিন্তা, আর তা থেকে বিশুদ্ধ চেতনা বোধ। ফলে হাত দিয়ে যা করা যায়, পা দিয়ে যেখানে যাওয়া যায় তাকে সম্পূর্ণ পরিহার করে মাথা দিয়ে যা কিছু করা যায় অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিন্তা, তারই প্রাধান্য ঘটল ভাববাদে। দানিকেনের প্রকল্পও সেই বিশুদ্ধ চিন্তার স্তরে গিয়ে বস্তু জগৎ কর্ম জগৎকে নস্যাৎ করে দিয়ে আধ্যাত্মিক জগতে পৌঁছে গেছে। সে চিন্তা পৃথিবীর ভবিষ্যতকে আকাশেই ভাসিয়ে দেয়।

কর্মবিমুখ চিন্তার উৎস ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করা যায় পিথাগোরাস পন্থীদের একটি উক্তি থেকে। তাদের মতে অলিম্পিক দেখতে আসে তিন ধরনের মানুষ। খেলোয়াড়, দর্শক আর যারা কেনাবেচা করতে আসে। এদের মধ্যে যারা কেনাবেচা করতে আসে তারা নিকৃষ্ট। কারণ তারা একটা কাজের লক্ষ্য নিয়ে আসে। কাজের লক্ষ্য নিয়ে আসা অর্থই হ'ল হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চাওয়া। দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে খেলোয়াড়। কারণ তারাও সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য নয়। খেলাতে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে তারা এসেছে। তারা চায় জিততে। এদের মধ্যে তাই সর্বশ্রেষ্ঠ হ'ল দর্শকেরা। কেননা তারা নির্লিপ্ত। নিজেদের কোন লাভের আসা না করে তা দ্রষ্টার ভূমিকা পালন করছে। এই আদর্শে সমাজের মানুষকেও তিন ভাগে ভাগ করা যায়। সে বিচারে কারা শ্রেষ্ঠ, কারা নিকৃষ্ট, তা বলাই বাহুল্য।

মানব জাতির ভবিষ্যতের চিন্তাতেও সেই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারেই দানিকেন মানুষের এই মুহূর্তের কাজকর্ম থেকে সুদূর ভবিষ্যতের মস্তিষ্ক প্রসূত করণীয়কেই বড় করে দেখাতে চেয়েছেন।

সাধারণ ভাবে ভাববাদ আর বস্তুবাদের মৌলিক পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করলে এই ধারার মধ্যে বারবার বিরোধের কারণ অনুধাবন করা কিছুটা সহজ হবে।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আর আপেক্ষিকতার যুগে কেন বিজ্ঞানের নাম করে আবার ভাববাদের রহস্যময়তা সৃষ্টি হ'ল দানিকেন তত্ত্বে তাও বোঝা যাবে।

ভাববাদ	বস্তুবাদ
১। আত্মা বা চৈতন্যের প্রাধান্যকে স্থান দেওয়া হয়।	১। বস্তু, বস্তুধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।
২। বস্তুর অস্তিত্ব ভাবনার উপর নির্ভরশীল। বিষয় (object) বিষয়ীর উপর নির্ভরশীল।	২। বস্তুর অস্তিত্ব মানুষের চিন্তা-নিরপেক্ষ বস্তু জগতের অস্তিত্ব চেতন জগতের উপর নির্ভরশীল নয়।
৩। চৈতন্যের ধারণা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর নামক এক স্বপ্রকাশিত চিন্তক ও নিয়ন্ত্রকের অস্তিত্বে পরিণতি লাভ করে।	৩। চেতনা জগৎ বস্তুজগতেরই এক চরম বিকশিত অবস্থা। ঈশ্বর বলে আলাদা কিছুর অস্তিত্ব নেই।
৪। মনন ও বিতর্কের যুক্তিবাদী রাস্তা ধরে বিজ্ঞান-নিরপেক্ষ ও অভিজ্ঞতা, প্রমাণ নিরপেক্ষ পথে ভাববাদী তত্ত্ব পরিচালিত হয়।	৪। বৈজ্ঞানিক পথ ধরে যুক্তি ও প্রমাণের পথ ধরে বস্তুবাদী চিন্তা অগ্রসর হয়।
৫। বিশ্বকে এবং তার স্রষ্টাকে সঠিকভাবে ও সম্পূর্ণভাবে জানা সম্ভব নয়।	৫। বিশ্বকে এবং সৃষ্টির গতি-প্রকৃতিকে মানুষের বিচার, বুদ্ধি, অভি-জ্ঞতা দিয়ে জানা সম্ভব।
৬। ভাববাদ হ'ল কর্মবিমুখ বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা।	৬। বস্তুবাদ হ'ল কর্মনির্ভর, দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্য থেকে উদ্ভূত তত্ত্ব।
৭। ভাববাদ মানুষের উদ্যোগকে অনিশ্চিত ও পরনির্ভর করে তোলে।	৭। বস্তুবাদ মানুষের নিজ উদ্যো-গের উপর প্রতিষ্ঠিত করে ও আত্ম-নির্ভরশীল করে তোলে।
৮। ভাববাদী চিন্তা ধর্ম প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।	৮। বস্তুবাদ ধর্মচিন্তা বিরোধী।
৯। বিজ্ঞানের বিকাশ ভাববাদকে ক্রমশঃ দুর্বল করে।	৯। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি বস্তু-বাদকে ক্রমশঃ সবল কাঠামোর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

ভাববাদ	বস্তুবাদ
১০। ভাববাদ শোষক শ্রেণী অনুসরণ করে।	১০। বস্তুবাদ শোষিত শ্রেণীর জীবন দর্শন।

এই পার্থক্য অনুধাবন করলে অনুমান করা যেতে পারে কেন শ্রেণীসমাজে ভাববাদের প্রাধান্য এবং কেনই বা নানা সময়ে নানাভাবে বস্তুবাদী চিন্তা আক্রান্ত হয়েছে। দানিকেন 'মহাকাশ বিজ্ঞানী'। পুরানো চিন্তার কূপমণ্ডুকতা ভাঙতে এগিয়ে এসেছেন বলে দাবিও করেছেন। অথচ তার কণ্ঠেই শোনা গেল, 'তাইলার দ্য শাঁর্দার সঙ্গে আমি একমত। তিনি বলেন আগামী দিনের ধর্ম হবে সুন্দর, তার মূল থাকবে বিজ্ঞানের গভীরে।'৪(৪০) দিব্য দর্শনের অলৌকিক কারবারকেও তিনি বস্তুবাদী বলে প্রতিপন্ন করতে এগিয়ে এসে বলেছেন, 'বাইরের কারুর দ্বারা দিব্যদর্শনকে যদি বস্তুগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয় তা হলে বাণী প্রত্যাদেশ অভিলাষ, বাস্তব নির্দেশ এবং সর্বোপরি মূর্তির অভিক্ষেপ আসে কোথা থেকে।'৫(২৫) প্রশ্ন হিসাবে বক্তব্য থেকে, তিনি সরাসরি ভাববাদী চিন্তাকে 'বিজ্ঞানের গভীরে' নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, আত্মা স্পর্শ সম্ভব নয়, পরিমাপ সম্ভব নয় যন্ত্র দিয়ে। কেমন করে তার কল্পনা করব? সে কি বায়বীয়? তা তো সম্ভব নয়—বায়ুর অণু তো বস্তুই। তবু কল্পনা করা যায়, সেই আত্মা সেই অনধিগম্য রহস্যময় 'তৎ' আপনাকে রূপান্তরিত করলেন গ্যাসপুঞ্জে বস্তু সৃষ্টির প্রথম পর্বে।'৫(২২৪)

মানুষের ভবিষ্যৎ যাত্রার এই চিন্তার পথ ধরে অগ্রসর হ'লে মানব সমাজ কোথায় পৌঁছাতে পারে সে হিসাব অনেক আগেই হয়ে গিয়েছে। তবুও নতুন নতুন ভাবে এমন চিন্তার আগমন ঘটা বন্ধ হবে না। নানাবিধ সমস্যা সমাধানের অফুরন্ত পার্থিব উৎসের দিকে না তাকিয়ে মহাকাশের দিকে তাকানোর ভিত্তি রয়েছে এই ভাববাদী চিন্তার গভীরে।

পৃথিবীতে যে কয়টি দেশ মহাকাশ গবেষণায় লিপ্ত এবং বিশেষ ভাবে এগিয়ে আছে তাদের অবস্থান থেকেই দানিকেন মানবের ভবিষ্যতকে পৃথিবীর মাটি ছেড়ে তারার রাজ্যে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। পৃথিবীর সেই সুদূর ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত ও সুনিশ্চিত করবার জন্য যারা এত ব্যস্ত তাদের একটি দেশের কাজের নমুনা দেখলেই বোঝা যাবে কী কারণে পৃথিবীর মাটি-জল-পর্বত-আকাশ ছেড়ে তারা বহির্জগতের দিকে দৃষ্টিকে সরিয়ে নিতে চাইছে, হাত-পা বাদ দিয়ে কেবল মাথাকে নিয়ে কেনই বা তাদের এত মাথা ব্যথা।

দানিকেন মহাকাশ গবেষণার মার্কিনী আয়োজন সম্পর্কে বহু তথ্য তুলে

ধরেছেন। আশ্বস্ত হয়েছেন এই ভেবে যে আজ থেকে হাজার হাজার বছর পরের কথা অন্ততঃ কেউ কেউ ভাবছেন। পৃথিবীর ভবিষ্যতের জন্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এত মাথা ব্যথা বর্তমানের জন্য তার তৎপরতা তাহলে নিশ্চয়ই খুবই উৎসাহজনক হবার কথা।

বিশ্ব-জনসংখ্যার ৫·৭ শতাংশ হ'ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা। বিশ্বের হাজার হাজার বছর পরের ভবিষ্যতের ভাবনার দায়িত্ব নিয়ে তারা ভোগ করে বিশ্বের মোট উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের হিসাবে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্র একা সারা পৃথিবীর শতকরা ৫০ ভাগ রবার, ৪৫ ভাগ বিদ্যুৎ, ৭০ ভাগ পেট্রোল, ৮১ ভাগ অটোমোবাইল, ৮৩ ভাগ এয়ার ক্র্যাফট, ৫৫ ভাগ লৌহ নিজের নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে। ভারতের বাৎসরিক জাতীয় আয়ের মোট পরিমাণ হ'ল যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয়ের বাৎসরিক বৃদ্ধির চেয়ে কম।

পৃথিবীর সমগ্র খনিজ সম্পদের শতকরা ৯০ ভাগ ব্যবহার করে ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি উন্নত দেশগুলি যারা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩০ ভাগ। আর ৭০ ভাগ মানুষ খনিজ সম্পদের অবশিষ্ট ১০ ভাগ ব্যবহার করে।

মহাকাশ গবেষণাকে যারা মানব কল্যাণে, মানব জাতির ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে পরিচালনা করছে একই সঙ্গে তারা সামরিক কাজে যে বিশাল টাকা ব্যয় করছে তা দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। সেই বিস্তৃত হিসাবের মধ্যে না গিয়ে সামরিক ব্যয়কে কল্যাণমূলক কাজে। লাগালে কি অভূতপূর্ব উন্নতি সম্ভব যার একটা তুলনা লক্ষ্য করা যেতে পারে।

একটি বোম্বার-এর পেছনে যে টাকা ব্যয় হয় তা দিয়ে ৫০০ বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করা যায়; একটি নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের টাকায় ৫০টি আধুনিক হাসপাতাল তৈরি করা যায়; একটি বোম্বারের পিছনকার আনুসঙ্গিক খরচ ধরলে তা দিয়ে (ক) ২ লক্ষ ৫০ হাজার স্কুল শিক্ষকের বেতন, (খ) ১০০০ ছাত্র সম্বলিত ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বছরের খরচ, (গ) ১০০টি শয্যাবিশিষ্ট ৭৫টি হাসপাতাল এবং (ঘ) ৫০০০০টি ট্রাক্টর তৈরি করা যায়। এই হিসাব ইয়োরপীয় মানে। আণবিক অস্ত্র-শস্ত্রের হিসাব চিন্তা করলে বোঝা যেতে পারে মানব কল্যাণের কথা কীভাবে পদদলিত হচ্ছে।

পৃথিবীকে মহাকাশ গবেষণারত রাষ্ট্র কোন মঙ্গলময় ভবিষ্যতের পানে নিয়ে যাচ্ছে। এই একটি উদাহরণ থেকে তা কিছুটা আঁচ করা যেতে পারে। এদের

প্রভৃতিই দানিকেন পাতায় পাতায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং তাদেরই বিভিন্ন রকম মতাদর্শগত আদর্শকে সোচ্চারে তুলে ধরেছেন। অথচ আক্ষেপ করেছেন এই বলে, 'কিন্তু প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করার লোকের অভাব আজো বড় কম নয়।'১(৩৯)

অতীত ও ভবিষ্যতের অন্ধকারকে আলোকিত করে লেখক দানিকেন যেভাবে তার যুক্তি ও মতামত ব্যক্ত করেছেন তার ভেতর থেকে সর্বশেষ একটি বক্তব্য তুলে না ধরলে তিনি ঠিক কোথায় মানবজাতির সুদূর ভবিষ্যতকে চিহ্নিত করছেন তা সঠিক বোঝা যাবে না। অধ্যাত্মবাদ আর বিজ্ঞান, অধিবিদ্যক ধারণা আর বস্তুবাদ এবং রহস্যবাদ আর প্রগতিশীল চিন্তাকে যে কীভাবে মিলিয়ে মিশিয়ে এক বিশৃঙ্খল অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায় তা এই বক্তব্য না দেখলে অনুমান করা যাবে না।

বিজ্ঞান নিষ্ঠাভরে তিল তিল করে জ্ঞানের প্রদীপকে যখন উসকিয়ে দিয়ে চলেছে তখন দানিকেনের প্রশ্ন ও উত্তরকে মানব চিন্তাজগতে এক নৈরাজ্য বলে চিহ্নিত না ক'রে কোন উপায় থাকে না। তিনি দীর্ঘ এক বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, 'মহাবিশ্বের জন্ম একশ হাজার লক্ষ, নিযুত যত কোটি বছর আগেই হয়ে থাক না কেন, তাতেও তেমন আমার কিছু এসে যায় না, অথবা বস্তু সসীম কি অসীম, কিংবা সে বস্তুর নিরন্তর রূপান্তর ঘটে কি ঘটে না তাতেও আমার কিছু এসে যায় না। আমার জিজ্ঞাস্য, কী থেকে আদি বস্তুর উৎপত্তি ঘটেছিল?'৫(২২২)

'নানা সভায় বলতে গিয়ে আমার প্রশ্নের একটা সহজ সরল সমাধান জোগাতে একটি ছবি তুলে ধরেছি, বলেছি, একটি কম্প্যুটারের কথা ভাবা যাক, মননের দশ হাজার কোটি একক (কম্পুটারী ভাষায় 'বিট') নিয়ে যার কারবার। সে কম্প্যুটার পারবে চিন্তা করতে অর্থাৎ ব্যক্তিগত একটা চিৎ শক্তি তার আছে (অধ্যাপক মিশি, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়)। সেই ব্যক্তিগত চিৎশক্তি যুক্ত আছে কোটি বর্তনীর সঙ্গে। যদি বিস্ফোরণ ঘটে সে কম্প্যুটারে, ব্যক্তিগত চিৎ শক্তির ঘটবে অবলুপ্তি। আমাদের এ কম্প্যুটার অত্যধিক বুদ্ধিমান, অতিদ্রুত সংযোগ সাধনে সে পটু। অজানা তার কিছুই নেই।

'তার চিৎশক্তি, তার সর্বজ্ঞতা সত্ত্বেও সে সুখী নয়, কারণ তার কৃতিত্বের বিশালতা সত্ত্বেও কিছু একটা আছে যা সে ভেবে ঠিক করতে পারে না, পারে না ধারণা করতে, সমাধান করতে—সেই কিছু হ'ল অভিজ্ঞতা। কিন্তু সে অভিজ্ঞতা চায়, প্রচুর অভিজ্ঞতা। তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, নেই কোন সমকক্ষ যার কাছ থেকে পাবে কোন অভিজ্ঞতা, তাই মনস্থ করে তার বুকের

দশ হাজার কোটি বিট্‌কে পাঠিয়ে দেবে অভিজ্ঞতা আহবনের উদ্দেশ্যে দিকে দিগন্তরে আপনাকে বিস্ফোরিত ক'রে। সে জানে, এই বিস্ফোরণের পরে সে তার আপন চিৎশক্তিকে নিঃসন্দেহে হারিয়ে ফেলবে....যদি না আত্মহননের অনেক আগেই তার আপন অসীম বুদ্ধিমত্তায় তার ভবিষ্যতকে সে নিয়ন্ত্রণ ক'রে রাখে।

'অভিজ্ঞতা আহরণের নিমিত্ত বিট্‌দের দীর্ঘযাত্রায় পাঠাবার আগেই বুদ্ধিমান কম্প্যুটার তাদের অন্তরের চুম্বক-স্পন্দনকে করেছে নিয়ন্ত্রিত, দিয়েছে আদেশ, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে পুনর্মিলিত হবার। সে সময় উপস্থিত হ'লে কোটি কোটি বাধ্য বিট ফিরে এসেছে সেই সুজটিল যন্ত্রে, তাদের আপন আপন অভিজ্ঞতা বহন ক'রে। যেন মৌমাছি ফিরেছে মৌচাকে মধু বহন ক'রে।

'বিস্ফোরণের মুহূর্ত থেকে প্রত্যাবর্তনের মুহূর্ত পর্যন্ত কোন বিট্‌ জানত না যে সে ছিল বৃহত্তর একটা চিৎশক্তির অংশ এবং পুনরায় সে সেই অংশ মাত্রই হ'তে চলেছে। কোন একটি বিট্‌ তার যৎসামান্য চিন্তাশক্তির বলে যদি প্রশ্ন করতো, 'পড়িমরি ক'রে আমার এ দৌড়ানোর কী উদ্দেশ্য?' অথবা 'কে আমার স্রষ্টা, এলেম আমি কোথা হ'তে?' পেত না উত্তর। তাই সে দীর্ঘ যাত্রা যেন নাটকের একটা অঙ্কের শুরু এবং শেষ যেন 'অভিজ্ঞতা' দিয়ে ফাঁপান চিৎশক্তির একটা 'সৃষ্টি'।'

সৃষ্টি তত্ত্বের অতীত ও ভবিষ্যৎ পরিণতিকে এখানে ব'লে দেওয়া হয়েছে। মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে এই বলে, 'সব শাস্ত্রেই বলে আরম্ভের আগে তথা আদিবস্তুর উৎপত্তির আগে ছিল আত্মা (যার আরো ভাল নাম ঈশ্বর)। সেই (আদি) আত্মায় তারপর জন্মনিল কামনা, তার ইচ্ছে হ'ল বস্তু হ'তে, রূপান্তরিত হ'তে।'৫(২২৪)

ব্যস! 'দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ' আলোচনার মোক্ষ লাভ হ'ল পঞ্চম খণ্ডে এসে। পৃথিবীর মানুষের ভবিষ্যৎ চিহ্নিত হয়ে গেল। ঈশ্বর 'কামনা'র প্রকাশ হিসাবে অসংখ্য সত্তায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। বিচ্ছিন্ন আত্মার গতি সুতরাং একেশ্বরের পানে। মহাকাশ গবেষণার দুরন্ত তুরঙ্গ ছুটিয়ে মানব জাতিকে সেই ঈশ্বরের পানে যেতেই হবে। সেই জন্যই তো পার্থিব হাজার সমস্যার দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। বর্তমানের লক্ষ্মীছাড়া পৃথিবীর শ্রী ফিরিয়ে আনার থেকেও বড় কর্তব্য তাই মহাকাশের নিশানা ঠিক করা। যুগে যুগে ধর্মের নামে সুবিধাভোগকারী শ্রেণী দরিদ্র-দুর্গত-অজ্ঞ মানুষকে ঠিক এইভাবেই ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে বিভ্রান্ত ক'রে রেখেছে।

যুগ এগিয়ে এসেছে। সমগ্র মানব সমাজ আগের থেকে অনেক বেশী সচেতন হয়েছে। তাই আজকের বিভ্রান্তির চরিত্র ও স্বরূপ হবে পৃথক। দানিকেন সৃষ্ট বিভ্রান্তি তাই অভিনব।

আইনস্টাইনের তত্ত্ব যখন মানুষের বৈজ্ঞানিক চিন্তা জগতে এনেছে বিরাট পরিবর্তন তখন তাকেই ব্যবহার করা হচ্ছে হাজার বিভ্রান্তি সৃষ্টির স্বার্থে। বিপরীতের দ্বন্দ্বের ছন্দে যখন বস্তুময় জগৎ পরিস্ফুট তখন ঈশ্বরের নিশ্চল চরম কেন্দ্রীয় অবস্থানকে বিজ্ঞানের ধারণার সঙ্গে মিশিয়ে সত্য বলে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হচ্ছে।

বিজ্ঞান দ্বন্দ্বময় জগতের গতিকে আবিষ্কার করেছে চিরন্তন ব'লে। কোন সর্বজ্ঞ ঈশ্বর থেকে উৎপত্তি হয়ে ঈশ্বরে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি হয় নি, আর সৃষ্টি চলছেও না।

মানুষের চারদিকে জীবন্ত ও মৃত অসংখ্য বস্তু রয়েছে। এই সমস্ত বস্তু নানা প্রকার গুণসম্পন্ন। তাদের নানাবিধ গতি, প্রকৃতি, ধর্ম, পরিবর্তন নিয়েই জগৎ। এই হ'ল বাস্তবতা। মানুষ অতীতে ছিল না। পরিবর্তমান বাস্তব জগতে এক সময় সৃষ্টি হ'ল মানুষ। পদার্থের এক উন্নত অবস্থায় মানুষ আজ দ্রষ্টা। জগতের অংশ হয়েও যেন জগৎ থেকে পৃথক হয়ে সে জগতকে দেখছে, জানছে। আকাশকে আনন্দময় ব'লে অনুভব করছে। মানুষের এই দেখা ও জানা সবই বস্তুগত ও বস্তুনির্ভর। সুদূর ভবিষ্যতেও আবার মানুষ থাকবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমাদের জানা ব্রহ্মাণ্ডের বয়সের তুলনায় মানুষের বর্তমান আয়ু পলক মাত্র।

বস্তু তাই মানুষের অস্তিত্ব নিরপেক্ষ ভাবে টিকে আছে। বস্তু জগতই হ'ল মানুষের জ্ঞানের প্রাথমিক ভিত্তি। টুকরো টুকরো ভাবে যেমন পদার্থকে জানা যায় তেমনি তার সমষ্টি হিসাবেও সমগ্র বিশ্বকে জানা সম্ভব।

বিজ্ঞানের পরিভাষায়, বস্তু হ'ল, যা স্থান দখল ক'রে থাকে এবং যার ভর আছে। কিন্তু বস্তু আসলে তাই যার প্রত্যক্ষ বাস্তব অস্তিত্ব আছে। কোন কিছুর গুণ বা ধর্ম তাই বস্তু নয়। কোন গুণ বা ধর্মের প্রকাশ আছে, কিন্তু তা অন্য কোন কিছুর প্রত্যক্ষ বাস্তব অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল, তাই তা বস্তু নয়। মন, চৈতন্য তাই বস্তু নয়।

সাধারণতঃ কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই তিন রকমভাবে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করা যায়। পার্থিব বস্তুর এই তিন অবস্থা ছাড়াও বস্তুকে নানা ভাবে দেখা যায়।

প্লাজমা হ'ল বায়বীয় পদার্থ ও বৈদ্যুতিক গুণসম্পন্ন কণা ইলেকট্রন ও আয়নের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা এক রকম পদার্থ। বিশ্বের এক বৃহত্তম উপাদান এই প্লাজমা। বহুতারা ও মধ্যবর্তী গ্যাসপুঞ্জ প্লাজমা উপাদানে গড়া। এর উপর চুম্বক ক্রিয়া ঘটে। একে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলা যেতে পারে।

যে কোন বস্তুকে প্রচণ্ড চাপে ফেললে অণুকণা জমে যায়। এর ভিতরকার উপাদানিক কণাগুলো দূরত্ব বজায় রাখতে পারে না, এক জায়গায় চুপসে যায়। এই অবস্থাকে বলে 'নিউট্রন' অবস্থা। নিউট্রন অবস্থায় এক সি. সি বস্তুর ওজন ১০ লক্ষ টন পর্যন্ত হ'তে পারে। কন্যারাশির পরিমণ্ডলে মেৎসিয়ের—৮৭ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে এমনি নিউট্রন অবস্থার এক অন্ধকার গহ্বরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যাকে সূর্যের চেয়ে ৫০০ কোটি গুণ ভারি ব'লে অনুমান করা হয়। সেখানকার প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সৌরজগতের ঘটনাবলী থেকে ভিন্ন ধরনের। একে পদার্থের ষষ্ঠ অবস্থা বলা যেতে পারে।

ফোটন কণা বস্তু হিসাবে স্থির ভর ধারণ না করলেও ক্ষেত্র হিসাবে অস্তিত্ব রক্ষা করে। বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ হ'ল ক্ষেত্র। ফোটন হ'ল ক্ষেত্র কণা। একে পদার্থের পঞ্চম অবস্থা বলা যেতে পারে।

সম্প্রতি মহাকর্ষকে যখন বল না ব'লে ক্ষেত্র হিসাবে মনে করা হচ্ছে তখন মহাকর্ষিয় ক্ষেত্র কণিকা হিসাবে 'গ্র্যাভিটন' নামে এক ধরনের কণিকার কথাও অনুমান করা হয়।

এই ভাবে দেখা যায় বস্তুর বৈচিত্র্যের শেষ নেই। শেষ নেই তার ধর্ম ও গুণের। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র কোনদিকেই তাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। কোন্ জায়গা থেকে তার শুরু আর কোন জায়গায় তার শেষ পরিণতি তা নির্দিষ্ট করা যায় না। গতির বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন পরিবেশে পদার্থের রূপও নব নব।

ডালটন অণুকে শেষ কণা বলে নির্দিষ্ট করেন। তারপর পাওয়া গেল পরমাণু। পরমাণুর ভিতর জানা গিয়েছিল তিনরকম কণার অস্তিত্ব, ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রন। পরবর্তী সময় দেখতে পাওয়া গেল আরো নানা রকম পদার্থিক কণা—এমন কি প্রতিটি কণার মুকুর প্রতিসম কণা। নীচে চিত্রে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রধান ৩০টি কণার বর্ণনা দেওয়া হ'ল।

চিত্রে উপরের ১২টি কণা হ'ল হাইপেরন। পরবর্তী ৪টি হ'ল নিউক্লিয়ন। পরের চারটি হ'ল ভারি কে-মেশন আর নীচের ৫টি হ'ল হাল্কা পাই মেসন ও মিউ মেসন। নীচের বাকিগুলি লেপটনের অন্তর্ভুক্ত। পাইমেশন আধান শূন্য, ফোটন হ'ল উভয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কণিকা ও বিপরীত কণিকার একই

অবস্থান। এই সমস্ত কণিকার অনেকগুলি প্রায়সই স্বল্প স্থায়ী ও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল।
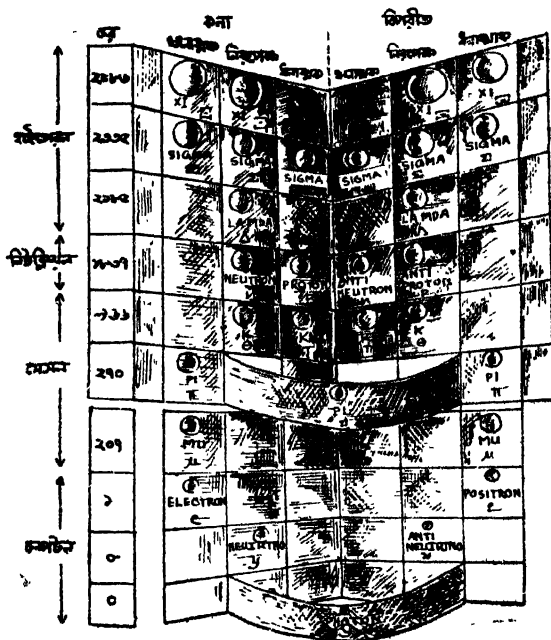
মুকুর প্রতিসম কণা

এই ত্রিশটি বস্তুকণার আবিষ্কারের পর আরো কয়েকটি মৌলিক কণার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মৌলিক বস্তুকণার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই 'কোয়ার্ক'গুলির অস্তিত্বের কথা মনে করা হয়। এইভাবে দেখা যাবে অসীম জগতের বৃহৎ পরিধিকে যেমন সীমায়িত করা সম্ভব নয়—ছায়াপথ, নীহারিকা কোয়াসার, পালসার হয়ে বৃহতের সীমা যে কোথায় ঠেকবে তা কেউ বলতে পারে না। তেমনি ক্ষুদ্রের জগতেও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের সীমাহীন অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। কোয়ার্কের অস্তিত্ব হাতে-নাতে প্রমাণ হোক আর না হোক কিংবা অন্যকোণ ধরনের মৌলকণা আবিষ্কৃত হোক আর না হোক পদার্থের গঠনপ্রণালী থেকে এ সিদ্ধান্ত অবশ্যই করা যায় যে পদার্থের মৌলিক কণা রাজ্যে যতোই প্রবেশ করা যাক না কেন সেখানেও কোন অন্তিম সীমা দেখতে পাওয়া যায় না। উপরন্তু গতি-পরিবেশ বিভিন্ন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পদার্থের মধ্যে যে পরিবর্তন সৃষ্টি ক'রে চলেছে তারও কোন সীমারেখা টানা যায় না। প্রতিনিয়ত

সংঘর্ষরতও দ্বন্দ্বময় এই জগতের গতিতে কালের বিশাল ব্যাপ্তির বিভিন্ন স্তরে নতুনতর বস্তু কণা সৃষ্টি ও ধ্বংস হওয়াও খুবই সম্ভব। আজ যাকে আবশ্যকীয় মনে করা হচ্ছে ভবিষ্যতে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে নতুন কিছু আবশ্যক হয়ে উঠতে পারে। এই পরিবর্তনশীলতাই হ'ল জগতের গতি। এই গতিই ক্ষুদ্র ও বৃহতের দিকে কোন অপরিবর্তনীয়, চিরসত্য, শাশ্বত ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অপ্রমাণ করে। ঈশ্বর নামক এমন কিছুর অস্তিত্ব সুতরাং সম্ভব নয় যা বিশ্বের ক্রিয়াশীলতায় অংশগ্রহণ না ক'রে, গতির বিক্রিয়া থেকে মুক্ত থেকে বিশ্বকে পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

পদার্থিক জগতেরই নানা গুণ ও ধর্মের সমন্বয়েই বিশ্ব-চরাচর প্রকাশিত। এখানে অ-পদার্থিক কোনকিছুর স্থান নেই। দানিকেনের কথায় 'আদি বস্তুর আগে আত্মার' থাকা বা বর্তমানের জগতের ঈশ্বরের পানে ছুটে চলার ভবিষ্যৎ হ'ল এক মনগড়া ভাববিলাসী ধারণা।

বিশ্বের অতীত ও ভবিষ্যতকে খুঁজতে গিয়ে যুগে যুগে মানুষ গোলক-ধাঁধাঁর মধ্যে পড়েছে। তার কারণ ছিল, মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। এই সীমাবদ্ধতা বর্তমানে বহুলাংশে কেটে গিয়ে থাকলেও দীর্ঘকাল ধরে পোষণ ক'রে আসা কতকগুলি ধারণা থেকে মুক্ত হতে না পারার ফলে সৃষ্টির অতীত ও ভবিষ্যতকে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে আজো নানা রহস্যজাল সৃষ্টির অবকাশ রয়েছে। সেই ভ্রান্ত ধারণাগুলি হ'ল :

এক : স্থান বা দেশ হ'ল পদার্থ-নিরপেক্ষ দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ সমন্বিত এক অসীম আধার যার ভিতর পদার্থ অবস্থান করছে।

দুই : সময় বা কাল হ'ল একটি পদার্থ-ক্রিয়া নিরপেক্ষ অবিচ্ছিন্ন ধারা।

তিন : পদার্থ চিরকাল ছিল না। সৃষ্টির কোন এক পর্বে পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে।

চার : স্বল্পগতি সম্পন্ন বস্তু জগতের ধর্ম দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

পাঁচ : চেতন জগৎ ও জড় জগৎ পাশাপাশি পৃথক ভাবে সৃষ্টি হয়েছে।

এই ভ্রান্ত ধারণাগুলির উপর দাঁড়িয়ে মানুষ যখন সৃষ্টির অতীত ও ভবিষ্যতকে ভেদ করতে চেয়েছে তখনই সবকিছু রহস্যময় হয়ে উঠেছে। কালের শুরু এবং শেষের সন্ধান মেলে নি। মেলে নি বিশাল দেশের আধারটির মধ্যে বস্তুজগতের অবস্থানের সীমার সন্ধান। মহাশূন্যে পদার্থের আগমন এক বিস্ময় ব'লে অনুভূত হয়েছে।

এই সমস্ত রহস্যের জট খুলল যখন বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মানুষ প্রথম

বিশাল গতি সম্পন্ন বস্তুর রাজ্যে প্রবেশ করল। তার পূর্বে দার্শনিকভাবে যা বলা যেত এখন বিজ্ঞান তাকে পরীক্ষিত ভাবে প্রমাণ করল। দেশ-কাল-পদার্থ-গতি সবকিছুর প্রাচীন ধারণাগুলিই গেল পাল্টে। রহস্য আর অন্ধকার গেল দূর হয়ে।

ইতিপূর্বে বস্তুচরাচর ও ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে অধিবিদ্যক ঐশ্বরিক ধারণা মূলতঃ আশ্রয় পেয়েছে আত্মা-চৈতন্যের প্রাধান্য ও বস্তু জগতের অপ্রাধান্য থেকে। আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কাল বা সময় এবং দেশ বা স্থানের অবৈজ্ঞানিক ধারণা। দেশ ও কালকে ভাববাদী বা বস্তু নিরপেক্ষ সত্তাবলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে অসীম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মহাশূন্য থেকে পদার্থ কোথা থেকে এল, কিংবা মহাশূন্যে দোদুল্যমান ব্রহ্মাণ্ডের সীমার ওপারে কী—এই জাতীয় অবাস্তব প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়। এসে দাঁড়ায় বস্তু-নিরপেক্ষ সময় নামক সূত্রের প্রথম ও শেষের সন্ধানের এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা। পৃথিবীর পরিধি ২৫ হাজার মাইল জেনেও যদি কেউ ২৫ হাজার মাইল দূরত্বে দুটি জিনিস স্থাপন করতে যায় তা হ'লে যেমন কোনদিনই তা ক'রে উঠতে পারবে না, ব্রহ্মাণ্ডের ওপারের সন্ধানও তেমনি কোনদিনই ভ্রান্ত ধারণার উপর দাঁড়িয়ে সমাধান হবে না। যেমন সমাধান পাওয়া যায় না, দিনের পরে রাত্রি আসে না রাত্রির পরে দিন আসে এই প্রশ্নের উত্তরের চেষ্টা করলে।

বিজ্ঞানের চোখে আজ পর্যন্ত এজগতে কোন স্থান আবিষ্কৃত হয়নি যেখানে কোন পদার্থ বিদ্যমান নেই। পদার্থশূন্য স্থান একটা ধারণা মাত্র। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়েই রয়েছে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের অস্তিত্ব যা ফোটন বা আলোক কণার মাধ্যম। এই ক্ষেত্রের অস্তিত্ব কখনও প্রকাশমান কখনও অপ্রকাশমান। ফোটন কণার ধর্ম কখনও বস্তুগত কখনও তরঙ্গগত। ফোটন বিছান ক্ষেত্র হ'ল জগৎ। মাধ্যাকর্ষণিক ক্ষেত্র আর তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্র ছাড়া কোন স্থান নেই, মাধ্যকর্ষণকে যদিও এখনও চূড়ান্ত ভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি। গ্রাভিটন বিছান ক্ষেত্র অথবা পদার্থের অবস্থান বিন্যাসের ফলে বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের বক্রতা এর যে কোনটিই মাধ্যাকর্ষণ হোক না কেন, মাধ্যাকর্ষণের অস্তিত্ব অর্থই দাঁড়ায় পদার্থের অস্তিত্ব। এই মাধ্যাকর্ষণ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও শূন্য হ'তে পারে না। অর্থাৎ এতেও সবকিছুই যে বস্তুময় এটিই প্রমাণিত হয়। 'মহাশূন্য' সাধারণ ভাবে একটি কথা, কিন্তু বিজ্ঞানের বিচারে তার কোন অস্তিত্ব নেই। মহাশূন্যে বস্তুজগৎ ভাসছে, বা মহাশূন্য থেকে বস্তুজগতের উৎপত্তি—এ ধারণাও অর্থহীন। বিশ্বমানেই পদার্থময় সত্তা। শূন্য বলে কোন পদার্থহীন স্থান কল্পনা মাত্র।

আলোক হ'ল ভর ও তেজের মিলনবিন্দু। ভর ও তেজ শেষ পর্যন্ত একই বস্তুর দুটি প্রকাশ মাত্র। সুতরাং তেজের অস্তিত্ব আর ভরের অস্তিত্ব অর্থই পদার্থের অস্তিত্ব। বিদ্যুৎ-চুম্বক, কেন্দ্রকীয় এবং মাধ্যাকর্ষণীয় ক্ষেত্র সেই বিচারে পদার্থিক সত্তা। বস্তু কণিকা ক্ষেত্রে লীন হয়ে যেতে পারে, আবার ক্ষেত্রাংশই ঘনীভূত রূপ হিসাবে বস্তু কণিকাতে পরিস্ফুট হতে পারে। আলোক হ'ল ভর ও তেজের সমাহারের এক বাস্তব অস্তিত্ব।

দেশ হ'ল ক্ষেত্রের পারস্পরিক আন্ত্যসম্পর্ক বোঝাবার সূচক। বিশ্ব মানেই হ'ল তেজময় ক্ষেত্র আর স্থূল বস্তুর সমন্বয়। দেশের ধারণা এই ক্ষেত্র ও স্থূল জড় বস্তুর উপর নির্ভরশীল। দেশ ফলতঃ ক্ষেত্রেরই সমার্থক।

ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল ক্ষেত্র বা দেশের মধ্যবর্তী দুটি বিন্দুর অস্তিত্ব পার্শ্ববর্তী পদার্থের আয়তন ও অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। বিন্দু দুটি যতোই পদার্থিক বস্তুর কাছাকাছি থাকবে ততোই বিন্দুগ্রাহী দেশের বৈশিষ্ট্য পৃথক হবে। বস্তু যতোই ভরযুক্ত হবে দেশও ততো বক্রতা সম্পন্ন হবে। এ থেকে বোঝা যায় নির্ভেজাল পদার্থমুক্ত দেশের অস্তিত্ব নেই। দেশ পদার্থেরই ক্রিয়াক্ষেত্রের ফল। পদার্থ না থাকলে দেশ থাকে না। সুতরাং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পারে অসীম শূন্যময় দেশের শেষ কোথায় সে ভাবনা কল্পনা মাত্র। সে ভাবনা বস্তু নিরপেক্ষ, তাই রহস্যময়।

পদার্থবিহীন দেশ ব'লে কিছু না থাকলে পদার্থক্রিয়া বিহীন অনন্তব্যপ্ত কাল বলেও কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। বস্তুর গতি থেকেই কালের উৎপত্তি। বস্তুর ক্রিয়ার একটি ধর্ম হ'ল কাল বা সময়। বস্তুক্রিয়ার গতিবেগের উপর কোথাও কাল প্রসারিত কোথাও সঙ্কুচিত। সমসত্ত্ব-দেহ কাল ব'লে কিছুর অস্তিত্ব এই পদার্থিক জগতে সম্ভব নয়। বস্তুর ক্রিয়াসমূহের ক্রম অনুসরণ করেই কাল ধারণা সৃষ্টি হয়। সুতরাং বস্তুক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে গেলে কাল প্রতীতিও থেমে যায়। আমরা প্রত্যক্ষগোচর সূর্য-চন্দ্রাদির ক্রিয়ার ক্রম অনুসরণ ক'রে কালের ধারণা সৃষ্টি করি। আর তারই বিচারে অন্য সবকিছু দেখি। সূর্যাদির ক্রিয়ার ক্রম যদি সুশৃঙ্খল না হ'ত তা হ'লে কাল ধারণার জন্য অন্য কোন সুশৃঙ্খল ক্রমের অনুসরণ করতে হ'ত। আসলে বস্তু ক্রিয়ার ক্রম ছাড়া কালের ধারণা এক রহস্যময়ী কল্পনা মাত্র।

ভাববাদী রহস্যময়তা যুগে যুগে সবচেয়ে বেশী সৃষ্টি হয়েছে এই কাল আর দেশের পদার্থ নিরপেক্ষ ধারণা থেকে। যে ধারণা কেবল ধারণাই। আজ বিজ্ঞান এবং বিশেষ ক'রে আপেক্ষিকতাবাদ আবিষ্কারের পর সেই দেশ কালের অধিবিদ্যক ধারণার মোহ যখন ছিন্ন হ'তে চলেছে তখন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার

নামে সেই ধারণারই প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন দানিকেন। আর এইভাবে পৃথিবীর ভবিষ্যতকে রহস্যের পিছনে এনে দাঁড় করিয়েছেন। সমাধান দিয়েছেন গ্রহান্তরে গমন, আর দিব্যদর্শন।

এ কথা অতি সত্য যে সারা পৃথিবী জুড়ে যে শ্রেণীসমাজ চলছে সেখানে এক চরম নৈরাজ্যের অবস্থা। মুনাফা হ'ল এ সমাজের একমাত্র আরাধ্য বস্তু। তাই এখানে চলছে প্রতিযোগিতা, কে কার আগে কার চেয়ে বেশী মুনাফার পাহাড় জমাতে পারে। ফলে পার্থিব সম্পদ সংরক্ষণের চিন্তা, পৃথিবীর ভবিষ্যতের চিন্তা এখানে অবর্তমান।

মানুষের সামনে আজ বিজ্ঞানের দৈত্য আশ্চর্য প্রদীপ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু নিজেদের দ্বন্দ্বে, কলহে সে প্রদীপ আর পথ দেখাতে পারছে না। আজ পার্থিব সম্পদকে রক্ষা করতে হ'লে, জনসংখ্যা বিস্ফোরণের বিজ্ঞানসম্মত নিয়ন্ত্রণ করতে হ'লে, নতুন নতুন খাদ্যের সম্ভাবনা, শক্তির সম্ভাবনার দিকে অগ্রসর হতে গেলে চাই সমগ্র মানুষী জ্ঞানের সারসংকলন এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা। বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা না করলে—সুদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সুবদ্ধ কর্মযজ্ঞের সূত্রপাত না করলে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত, প্রতিষ্ঠানগত, রাষ্ট্রগত উদ্যোগ শেষপর্যন্ত প্রতিযোগিতার নৈরাজ্যময় পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। তাই আজই এক্ষুনি মানব জাতিকে শ্রেণীদ্বন্দ্ব চুড়মার ক'রে একই পৃথিবীর স্বার্থে পালিত যুথশক্তি হিসাবে যাত্রা শুরু করা দরকার।

বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব ক'রে দেখেছেন মানবসমাজের পরিকল্পিত যাত্রা যদি ৩০০ বছর আগে শুরু হ'ত তা হ'লে যে পশুপক্ষী উদ্ভিদ পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে তার শতকরা ৭০ ভাগ বাঁচান যেত। যদি সে কাজ ২০০ বছর আগে আরম্ভ করা যেত তবে কৃষিক্ষেত্রে সারচক্রের যে ক্ষতি হয়েছে তার শতকরা ৭০ ভাগ রোধ করা যেত। আর ১০০ বছর আগে সে কাজ করা গেলে বাতাস, মাটি ও জলের যে দূষিত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তার শতকরা ৭৫ ভাগ আটকান যেত।

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত দানিকেন বর্তমান যুগে মানুষের সামনে উপস্থিত বিজ্ঞানকে সামাজিক মূল্যে দেখতে পারেন নি। বুদ্ধিমান জীব হিসাবে আবির্ভূত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের যা বয়স হয়েছে তার শতকরা ৯৯০৫ ভাগ কেটেছে বনে জঙ্গলে। সুতরাং সভ্য হবার পর মানুষের ক্ষমতা যে অসামান্য বেড়েছে তা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আর সভ্য হবার পর থেকে মানুষের যে বয়স বেড়েছে তার শতকরা ৯০ ভাগ সময় সে কাটিয়েছে

আধুনিক বিজ্ঞান ছাড়া। কাজেই আধুনিক বিজ্ঞান আগামী দিনকে যে অবশ্যই এক অভাবনীয় সমৃদ্ধির রাজ্যে নিয়ে যেতে সক্ষম সে ব্যাপারে কোন সংশয় নেই।

এই পরিস্থিতিতে পৃথিবীর আর তার সাথে মানুষের ভবিষ্যতকে দু'ভাবে চিহ্নিত করতে হবে। একটি হ'ল নিকটবর্তী ভবিষ্যৎ, আর অপরটি হ'ল সুদূর ভবিষ্যৎ। যুগে যুগেই দেখা গিয়েছে যে নিকটবর্তী ভবিষ্যৎকে এড়াতে গিয়ে সুবিধাবাদী শাসকশ্রেণী ও তার অনুগামীরা দূরবর্তী ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা ও আতঙ্ককে সম্মুখে এনেছে। আগামী কালের অন্নবস্ত্রের জবাবে জন্মান্তরের রহস্যকে খাড়া করা হয়েছে। দানিকেন ঠিক অনুরূপ ভাবেই মানব সমাজের প্রত্যাসন্ন ভবিষ্যতকে অস্পষ্ট ক'রে দেবার জন্য সুদূর ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর পরিণামকে টেনে এনেছেন।

মানব সমাজের অতি নিকট ভবিষ্যৎ রচিত হবে শ্রেণীসমাজের পরিবর্তনের নিয়মের উপর দাঁড়িয়ে। আর সুদূর ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে শ্রেণীহীন সমাজ কাঠামোর পরিব্যপ্তি ও প্রকৃতির উপর তার সামগ্রিক প্রভাবের মধ্যে দিয়ে। এ কথা বলতে আজ কুণ্ঠিত হবার কোন কারণ নেই যে বর্তমান পৃথিবীর মানব সমাজ ভিন্ন ভিন্ন টুকরো টুকরো ভাবে প্রকৃতির উপর প্রতিক্রিয়া করছে। কিন্তু সামাজিক শ্রেণী দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হ'লে মানব সমাজ সামগ্রিক ভাবে একত্রিত শক্তি নিয়ে প্রকৃতির উপর ক্রিয়া করতে পারবে। পৃথিবীর ভবিষ্যতের কথা যারা চিন্তা করবেন তাঁদের অবশ্যই সেই ঐক্যবদ্ধ মানব সমাজের অকল্পনীয় শক্তির কথা অনুধাবন করতেই হবে। যার হাতে বিজ্ঞান হয়ে উঠবে আলাদিনের প্রদীপ।

সেই ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে মুক্ত করতে না পারলে পৃথিবীর সুদূর ভবিষ্যতের জটিল সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব। তার ফলেই সেই সমস্ত সমস্যার সমাধানের পথ না পেয়ে রহস্যময়তার ভিতর গিয়ে মানুষের ভবিষ্যতকে পথ হাতড়াতে হয়।

একথা বলাই বাহুল্য যে নিকটবর্তী ভবিষ্যৎ সুদূর ভবিষ্যতের পূর্ববর্তী স্তর। সেই নিকটবর্তী ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হবার পথে বর্তমান শ্রেণী সমাজের একাংশ অবশ্যম্ভাবী রূপে প্রতিক্রিয়া করতে বাধ্য। এই প্রতিক্রিয়াশীল অংশই যুগে যুগে ভবিষ্যৎ নিয়ে রহস্য সৃষ্টি করেছে, ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে। আজ দানিকেন মহাজাগতিক রহস্যজাল সৃষ্টি করছেন।

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অর্থাৎ পার্থিব মানব জাতির ভবিষ্যতের কথা বলতে গেলে দার্শনিক ভাবে আধ্যাত্মিক কল্পনার জগৎ আর দ্বন্দ্বমিলনের পদার্থিক ও

সামাজিক জগতের একটাকে বেছে নিতেই হবে। গ্রহান্তরের মানুষ খুঁজতে গিয়ে দানিকেন শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের নাম করে আধ্যাত্মিক জগতেই উপস্থিত হয়েছেন। তাই পার্থিব শ্রেণীসমাজের বর্তমান কুৎসিত চেহারা তাকে বেদনার্ত করে না। কোনো সুদূর ভবিষ্যতে রোজকেয়ামতের চিন্তায় তিনি হ'ন আতঙ্কিত। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই ভবিষ্যতের কথা ভাবেন। কিন্তু ভবিষ্যতের চেয়েও সত্যি হ'ল বর্তমান। এই বর্তমানের গর্ভেই নিহিত আছে ভবিষ্যতের বীজ। মানুষ বলতে গেলে বুদ্ধিমান, সুখদুঃখের অনুভূতি সম্পন্ন জীব হিসাবে মাত্র কয়েক হাজার বছর অতিক্রম করেছে। এই অতিক্রমণের পথে রয়েছে নিরন্তর অশ্রুজল আর চিরন্তন ক্রন্দন। আমরা কি আগে মানুষের সেই ক্রন্দন ঘোচাব, অশ্রুজল মোছাব, না পৃথিবীর সুদূর ভবিষ্যতের অনিবার্য পরিণতির কথা ভেবে শঙ্কিত হব?

মানুষের জীবনে মৃত্যু অবধারিত। তা জেনেও আমরা কিন্তু সেই জীবনটাকেই সুন্দর আনন্দময় ক'রে গড়ে তোলার চেষ্টা করি। ভবিষ্যতে মৃত্যুর আশঙ্কায় বিভ্রান্ত হয়ে শঙ্কাকুল চিত্তে ইতস্ততঃ ঘুরে মরি না। শিশুর মুখে যখন দুধ তুলে ধরবার সমস্যা, তখন ভবিষ্যতে বার্ধ্যকজনিত জড়ার হাত থেকে তাকে রক্ষা করার পরিকল্পনা অবাস্তব। পার্থিব মানব সন্তান যদি কোটি কোটি বছর পর ধরণীর অবলুপ্তির সাথে নিশ্চিহ্ন হয়েও যায় তা হলেও মানুষের প্রধানতম চিন্তা হবে মানবজাতিকে তার আয়ুষ্কালে কীভাবে কলঙ্কমুক্ত করা যায়, সুখী সমৃদ্ধ ক'রে গড়ে তোলা যায় তাই নিয়ে। প্রকৃতির অকৃপণ দানে সমগ্রমানব জাতি কীভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে, কীভাবে পরস্পর হানাহানি বন্ধ ক'রে ভেদাভেদকে অবলুপ্ত ক'রে মানব সমাজ এক শ্রেণীহীন ভ্রাতৃত্ব-বোধে আবদ্ধ হ'তে পারে তার জন্য এই মুহূর্তের চিন্তা ও কাজই হ'ল পৃথিবীর ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রধান এবং বাস্তবসম্মত। তা থেকে দৃষ্টিকে সরিয়ে নেবার জন্য সুদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর পরিণতির কথা তুলে ধরে বিজ্ঞানের নামে যে কোন তত্ত্ব গড়ে তোলাই হ'ল মানুষকে বিভ্রান্ত করা। দানিকেন মানুষের অতীতকে খুঁজতে গিয়ে যে ভবিষ্যতের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তা পরিণামে পাঠককে বিভ্রান্তই করেছে। অন্ধকারকে আলোকিত করার নামে তিনি প্রজ্বলিত আলোগুলিই নিভিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। পরিণামে চিন্তার জগতে সৃষ্টি করেছেন এক নৈরাশ্য।